মীরার দুপুর

মীরার দুপুর

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

প্রকাশক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু
নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

প্রচ্ছদচিত্র খালেদ চৌধুরী কর্তৃক অঙ্কিত

প্রথম মুদ্রণ
ভাদ্র ১৩৬০, অগস্ট ১৯৫৩

দাম : তিন টাকা

মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

মীরার দুপুর

এক

চশমা চোখে মীরাকে কত ছোট্টটি দেখায়। মনে হয় স্কুলে পড়ছে। অথচ যখন চশমা থাকে না, একদিন নয় বহুদিন, বহুবার, মীরার চোখের দিকে চোখ পড়তে হীরেনের মনে হয়েছে, স্কুলে-পড়া মেয়ে কি, অনেক অভিজ্ঞতায় গড়া, পুরো তেইশটি বসন্ত নির্বিঘ্নে অতিক্রম ক'রে আসা, অনেক অভিজ্ঞতায় তনু মন জড়ানো পূর্ণাবয়বা চতুরা এক নারী।

আশ্চর্য, চশমা পরলে আর-দশটি মেয়েকে যেমন বেশ ভারিক্কি দেখায়, শিক্ষয়িত্রী মনে হয়, কারুর চেহারা নার্স কি ডাক্তারে রূপান্তরিত হয়, মীরার বেলায় তা হয় না। একেবারে অন্যরকম।

চোখের ওপর, ওর বড়ো বেশি শান্ত গম্ভীর চোখে 'ক্রুক্‌স'এর লেন্‌স দুটো ওঠবার সঙ্গে-সঙ্গে গাল দুটোর বয়স যেন দশ বছর ক'মে যায়, মনে হয় সারাক্ষণ ঐ গালে টোল প'ড়ে আছে, ঠোঁটের কিনারে এমন একটা হাসি লুকোনো আছে, যা এক্ষুনি অকারণে, বিনা দ্বিধায়, প্রচণ্ড আবেগে ফেটে পড়বে, আর ফেটে-পড়া ডালিম-খোসার ফাঁক দিয়ে যেমন লাল ডালিম-দানা ঝিকিয়ে ওঠে, তেমনি ঠোঁটের আবরণ স'রে গিয়ে ওর মুক্তার মতো শাদা সুন্দর দাঁত ও রক্তোজ্জ্বল মাড়ির ঝলক উঠবে।

কি আবার এমনও মনে হয়, বুঝি হাসিটা দপ্‌ ক'রে নিভিয়ে দিয়ে মীরা আঃ ক'রে উঠবে, একটা দাঁতে, ওর মুক্তার মতো ঝকঝকে দাঁতের গোড়ায় সাংঘাতিক ব্যথা, যন্ত্রণায় কথা কইতে পারছে না, গাল ফুলে গেছে, ঠাণ্ডা না লাগে ভেবে হীরেন ব্যস্ত হ'য়ে হাতের কাছে মাফ্‌লার খুঁজছে, 'এক্ষুনি জড়িয়ে রাখো, ভালো ক'রে গাল-গলা ঢেকে দাও।' হীরেনের কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে মীরা অসহায়, বেদনাকাতর, দু-দিক ঈষৎ চাপা একটু সরু-হ'য়ে-আসা সুঠাম থুঁত্‌নি ওপরের দিকে তুলে

ধ'রে বলবে, 'দাও, তুমি জড়িয়ে না দিলে ফোলাটা ঠিকমতন ঢাকা পড়বে কি?'

হীরেন ভাবে। অবশ্য বিয়ের পর মীরার কোনোদিন দাঁতের যন্ত্রণা হয়েছে হীরেনের মনে পড়ে না। চশমা-পরা মীরার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়, এই মুখে সেই অসহায়তা সেই কোমল নির্ভরতার মধুমর্মর জেগে আছে। পুরুষের কাছে নারীর সলজ্জ মৃদু প্রার্থনা। সেবার, স্নেহের, অভিভাবকত্বের।

বিডন স্ট্রীটে বেথুন কলেজের কাছাকাছি ভট্‌চাজের ফটোর দোকানে তোলা ডিমের আকারে বাঁধানো ফটো। সেকেণ্ড-ইয়ারে পড়ার সময় মীরা তুলিয়েছিলো ওটা। তাই ও বলে।

হীরেন চশমা-পরা মীরাকে স্তব্ধ হ'য়ে দেখে। ছবি দেখা হ'য়ে গেলে সে ঘরের অন্যদিকের দেয়ালের কাছে দাঁড়াবে ব'লে একটু-একটু পায়চারি করতে থাকে। একটা নিশ্বাস ফেলে।

অবশ্য চশমা-ছাড়া মীরার ফটোর কাছে সে তখুনি গিয়ে দাঁড়ায় না। হীরেন ঘুরে যায়। এক-পা দু-পা ক'রে সে এগিয়ে যায় টেবিলের কাছে। দুটো চাঁপাফুল রেখে গেছে মীরা একটা পেপারওয়েটের পাদমূলে। গ্লাসে গরম দুধ। প্লেটে নরম ক'রে ভাজা দু-খানা টোস্ট। গ্যাসট্রিকের ঘায়ে বিক্ষত অন্ত্রের প্রাতরাশ। হীরেন খাবে।

দুর্বল একটা নিশ্বাস ফেলে সে অন্যদিকের দেয়ালের কাছে স'রে গেল।

মীরার ফটোর দিকে চোখ পড়ার আগে বাঁ-দিকের দেয়ালে টাঙানো আয়নায় হীরেন নিজেকে দেখলো।

হাসপাতাল-প্রত্যাগত রুগীর প্রতিবিম্ব। ছোটো ক'রে ছাঁটা চুল, শুকনো গলা, অসম্ভব মোটা দেখাচ্ছে চশমার ফ্রেম দুটো। বুকের কাছে পিঠের দিকে পাঞ্জাবিটা বেমানান ঢিলে-ঢিলে। যেন অনাবশ্যক কাপড়

সেখানটায়। এতটা কাপড় লাগে না হীরেনের জামায় মীরার বোঝা উচিত ছিলো, একটা নিশ্বাস ফেলে হীরেন মনে-মনে হাসলো না ঠিক, ভাবলো।

ট্রাউজার অবশ্য এমনি ঢিলে থাকে।

শাদায়-কালোয় ডোরা-কাটা ক্যালিকো। মীরা পছন্দ ক'রে কিনেছে। হীরেনের চেয়ে মীরার পছন্দ ভালো, এটা হীরেনও স্বীকার করে। তা ছাড়া, অবশ্য এখনকার এই জামা-কাপড়ের কথা হচ্ছে না, এখন তো একরকম অচল হ'য়ে সে ঘরে বসা, যা-কিছু কেনাকাটার দরকার সব মীরা করছে। আগে, বিয়ের ঠিক এক মাস পর একদিন দু-জনে বাজারে বেরিয়ে দরজা ও জানলার পর্দার কাপড় কিনতে গিয়ে গজ-পিছু হীরেন প্রায় চার আনা ঠকতে বসেছিলো। সাহস ক'রে মীরা এক লাফে আট আনা কমিয়ে জিনিসটার দর করতে দোকানী হাসতে-হাসতে তা মীরার হাতে তুলে দেয়। লজ্জায় হীরেন দোকান থেকে বেরিয়েও কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে নি, তারপর এক-সময় মীরার কানে-কানে সে বলেছিলো, 'তুমি না থাকলে কী ভীষণ ঠকতে হ'ত আজ আমায়।' উত্তরে মীরা কিছু বলে নি। ট্র্যামের বাইরে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে ও চুপ ক'রে চেয়ে ছিলো। সেদিন, হীরেনের হুট্ ক'রে আজ আবার মনে পড়লো, মীরার চোখে চশমা ছিলো না। বিজয়িনী, দুঃসাহসিনী। মীরার উন্মুক্ত ধারালো ভুরু, চোখের পাতা, গাল ও নুয়ে-পড়া লম্বা ঘাড়ের রেখার দিকে তাকিয়ে হীরেন মনে-মনে বলেছিলো।

আয়নায় নিজেকে দেখতে-দেখতে হীরেন বুদ্ধিমতী মীরাকে দেখলো : তার জামায়, কাপড়ে, কালো স্ট্র্যাপ পরানো বার্মিজ স্যাণ্ডেলে, হাত-ঘড়িতে। এই তো সেদিন, হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে হীরেন দেখলো তার রিস্টওয়াচ সুন্দর ক'রে সারিয়ে এনে মীরা টেবিলে রেখে

দিয়েছে। অসুখের আগে হাত থেকে প'ড়ে গিয়ে ডায়েলের কাচটা ভেঙে যায়। হীরেন সাহস পাচ্ছিলো না ষোলো টাকা খরচ ক'রে ঘড়ির মুখে কাচ পরায়।

'আট টাকা নিলে। সামান্য ক-টা টাকার জন্যে ওটা অ্যাদ্দিন প'ড়ে ছিলো।' বলছিলো মীরা হাসতে-হাসতে হীরেনের কব্জিতে ঘড়ির নতুন ব্যাণ্ডটা পরিয়ে দেবার সময়।

'আমিও তো অচল হ'য়ে হাসপাতালে প'ড়ে ছিলাম।' হীরেন বলছিলো। না-হাসলেও মুখে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করেছিলো সে। এবং অবাক স্তব্ধ চোখে মীরাকে দেখছিলো। নুয়ে ব্যাণ্ডের হুক্ আঁটছিলো ও, ঠিকমতো লাগছিলো না। 'আর-একটা ছিদ্র করা দরকার।' অস্ফুটে মীরা বললো। 'আলসারে ভুগে কব্জি অসম্ভব সরু হ'য়ে গেছে তোমার।' শেষের কথাটা মীরা বলতে পারতো কিন্তু বলে নি। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নাসারন্ধ্র স্ফুরিত ক'রে অপার সংযম ও দক্ষতার সঙ্গে হীরেনের হাত থেকে বন্ধনী তুলে নিয়ে চামড়ার গায়ে পেরেক ঠুকতে ও ব্যস্ত। তখন হাতের কাছে আর-কিছু না পেয়ে পেপারওয়েট দিয়ে পেরেকের মাথায় ঠুক্‌ঠুক্ ক'রে আঘাত করছিলো। মীরার সুন্দর শরীর কাঁপছিলো, অন্যদিকের দেয়ালে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে হীরেন একটু পরে। সবে স্নান সেরে এসেছিলো মীরা, চোখে চশমা ছিলো না।

আজ আয়নায় নিজের হাতঘড়ির ওপর একটু-সময় চোখ রেখে হীরেন সেদিনের নিশ্বাসটার পুনরুক্তি করলো মাত্র।

তারপর আস্তে-আস্তে স'রে গেল সেই দেয়ালের কাছে, যেখান থেকে উন্মুক্ত কৃপাণের মতো প্রখর ভ্রূযুগল, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ কালো চক্ষু ও বুদ্ধিমার্জিত পরিচ্ছন্ন একটি চিবুক নিয়ে মীরা ঘরের মেঝের দিকে, হীরেনের টেবিলের দিকে, খাটের দিকে, কোনার টিপয়ের দিকে, উত্তর-

দিকের স্যুটকেস দুটোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। একসঙ্গে এতগুলো দেখা অদ্ভুত ক্ষমতা।

সেইজন্যেই হীরেন, হ্যাঁ, তার স্ত্রীর চোখের দিকে তাকাতে ভয় পায়।

চশমা না থাকলে মীরার চোখকে আর কারুর চোখ ব'লে মনে হয়, বেশ লক্ষ্য করে সে। বলতে কি, তখন হীরেন থেকে মীরা যেন বেশ দূরে স'রে যায়। একরকম তার নাগালের বাইরে।

অসামান্য ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, ক্ষমতা, চাতুর্য, আর হ্যাঁ, রূপ নিয়ে এক নারী।

মীরা নয়।

মীরার এমন চোখ-ঝলসানো রূপ নেই, এত বুদ্ধি থাকবার কথা নয়, একলা বেরিয়ে এমন অদ্ভুত ভালোভাবে ও বাজার করতেও যে জানে হীরেন জানতো না। এখন জানছে, দেখছে।

ভাবতে-ভাবতে হীরেন হঠাৎ কেমন দ'মে যায়। যেন কে তাকে প্রশ্ন করে, মীরাকে তুমি কদ্দিন জানো, কতটুকু দেখেছিলে ওর।

ঘাড় হেঁট ক'রে হীরেন একলা ঘরে পায়চারি করে। কদ্দিন, কতটুকু।

আর সবচেয়ে বেশি সে অবাক হয়, যখন ভাবে, বিয়ের আগে একদিন একটু-সময়ের জন্যেও কি চশমা-চোখে-নেই অবস্থায় মীরাকে সে দেখলো না।

পাঞ্জাবির পকেটের মধ্যে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ হ'য়ে যায় হীরেনের। পায়চারি থেমে যায়।

মুখ তুলে ফের সে ফটোর দিকে তাকায়। সেদিন তোলা হয়েছে ওটা। হীরেনের অসুখের অল্প কিছুদিন আগে। ধর্মতলার বিখ্যাত ও. কে. স্টুডিওর কাজ।

আশ্চর্য, কেন যে হীরেনেরই সেদিন শখ হয়েছিলো চশমা ছেড়ে মীরা ফটো তুলুক এবার। চশমা-পরা, মানে বিয়ের আগের তোলা ছবি তো রয়েছেই।

ছবি দেখতে-দেখতে হীরেনের ঘাড় আবার মেঝের দিকে নুয়ে পড়ে।

কুমারী মেয়ে নয়, স্ত্রী মীরা। পায়চারি করতে-করতে ভাবে সে, কুমারী থাকতে হীরেনের কাছে যে অনেক ফুল, একটা পার্কার পেন, সিল্কের গুটিকতক ব্লাউজ-পিস উপহার পেয়েছিলো এবং সুযোগমতো চুম্বন, সেই মীরা, চশমা চোখে ওই দেওয়ালে মিটিমিটি হাসছে।

এই দেওয়ালের মীরাকে রেশন আনতে যেতে হচ্ছে। তার স্বামীর পেটে সম্প্রতি একটা বড়োরকমের অপারেশন হয়েছে। দীর্ঘ অনুপস্থিতির দরুন চাকরি নেই এবং আরও কতকাল ঘরে পঙ্গু হ'য়ে ব'সে থাকবে তার স্থিরতা নেই। সম্প্রতি মীরা উপার্জনের চেষ্টায় বেরিয়েছে।

হীরেন ভাবলো, ওপরের পাটির দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধ'রে ভাবলো আর পায়চারি করলো।

বিয়ের আগের মীরার সঙ্গে বিবাহিতা মীরার মিল থাকতে পারে না। কিন্তু সেই অমিল যে এত বেশি হীরেন জানতো না।

বিয়ের পর থেকেই চশমাটা ও একটু-একটু সময়ের জন্যে খুলে রাখতো, তারপর কয়েক দিনের জন্যে, ক-দিন সমানেও মীরার চোখে চশমা দেখা যেতো না।

হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে হীরেন একেবারেই তা দেখলো না।

অবশ্য হীরেনের জিজ্ঞেস করা হয় নি কি ওর চোখের পাওয়ার বেড়েছে, না মাইয়োপিয়ার দোষ সেণ্টপার্সেণ্ট সেরে গেছে।

ব্যস্ত, মীরাকে রুগী ও সংসারের কাজে সারাক্ষণ এত বেশি ব্যস্ত দেখে হীরেন যেন সাহসই পাচ্ছে না জিজ্ঞেস করতে।

শুধু সে দেখলো চশমা ছাড়া মীরার চোখ অনেক বেশি সুন্দর, সংসারের কাজে ওর আশ্চর্য দক্ষতা। এদিকে হীরেনের সেবা-শুশ্রূষা থেকে আরম্ভ ক'রে ডাক্তার ডাকা ওষুধপথ্যের যোগাড় একলা মীরাই করছে। করছে সব ঘড়ির কাঁটার মতো নির্ভুল নিয়মে।

চশমা-পরা কুমারী-চোখের দিকে তাকিয়ে হীরেন একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেললো। কেন জানি, অপারেশন-থিয়েটারে উঠবার আগের দিন বিকেলে হাসপাতালের বেড-এ শুয়ে একটা রক্তাভ জানলার দিকে চোখ রেখে যতবার সে মীরার কথা ভেবেছিলো ততবার ওর ঐ ছবিটাই মনে পড়ছিলো।

সেই মীরা এই মীরা ?

টুক্ টুক্ টুক্···

'কে ?'

'আমি, আমি বুলা।'

অন্যমনস্কতার দরুন প্রথমটায় কেমন-একটু চমকে ওঠে হীরেন, তারপর মুখের ভাব স্বাভাবিক ক'রে দরজার ছিট্‌কিনি খুলে দেয়। হাওয়ায় পর্দাটা ফুলে এসে হীরেনের গায়ে ঠেকে, দরজার একপাশে সে স'রে দাঁড়ায়, পর্দা ঠেলে ভিতরে এসে ঢোকে বাইশ তেইশ বছর বয়সের একটি মেয়ে। হীরেনের খুড়তুতো বোন।

বুলার পরনে লাল হলুদ ছোপ দেওয়া পাতলা বোম্বাই। কম দামী কাপড়, দেখলেই বোঝা যায়। সাধারণ ছিটের ব্লাউজ। পায়ে সস্তা কানপুরী চটি।

'চুপ ক'রে রইলি যে ?' হীরেন কথা বললো আগে— 'বোস্।'

'না, বসবো না।' বুলা হাতের ব্যাগটা হীরেনের খাটের একপাশে রাখলো। মুক্ত হাত দুটো একবার খোঁপার গায়ে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো ঘরের ভিতরের চারদিক।

'বৌদি কাজের মানুষ।' বুলা বললো।

'ওই ব'লে-ব'লেই তো তোরা ওর দর বাড়িয়ে দিলি।' হীরেন গম্ভীর।

'কি রকম ?' বুলা হাসলো।

'এখন আর এক মিনিট সময় নেই ওর স্থির হ'য়ে দাঁড়াবার, দুটো কথা বলবার।'

বুলা চুপ।

'কি, মিথ্যে বলছি ?' হীরেন হাসলো। হাসির ফাঁক দিয়ে চোরা একটা দীর্ঘশ্বাস বেরুলো যদিও। 'একলা ঘরে ব'সে থেকে হাঁপিয়ে উঠলাম রে বুলা।'

'তা করবে কি।' বুলা অস্ফুটে বললো। হীরেনের চোরা নিশ্বাস ও টের পায়। কিন্তু বুঝতে না দিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে মীরার সাজানো টেবিল, গোছানো আল্‌না, একদিকের দেওয়াল ঠেকিয়ে কাঠের চৌপায়ার ওপর মনোরম ভঙ্গিতে রাখা চামড়ার স্যুটকেস দুটো এবং অন্যদিকের দেওয়ালের কাছে ছোট্ট একটা টিপয়, টিপয়ের ওপর মীরার হাতের বোনা ধবধবে সুন্দর ঢাক্‌না ও তার ওপর কাচের গ্লাসে জল দিয়ে জিইয়ে রাখা একমুঠো রজনীগন্ধা দেখতে-দেখতে বুলা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো। 'সত্যি বৌদি শুধু ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী পায় নি, ঘর গোছানোর ডিপ্লোমাও আছে ওর।'

'নিশ্চয়।' হীরেন যোগ করলো, 'সেই সঙ্গে বাজার করার, রুগীর সেবাযত্ন করার, টাকাপয়সার ব্যবস্থা করার, লণ্ড্রি ও ইলেকট্রিকের

বিলগুলো যত্ন ক'রে তুলে রাখার, ঝি ঝাড়ুদার দুধওয়ালীর হিসেব রাখার, —কোন্‌টার জন্যে ডিপ্লোমা মীরা পায় নি, তুই বলতে পারিস বুলা?'

যেন একসঙ্গে অনেকগুলো কথা ক'য়ে হীরেন হাঁপাতে লাগলো, হাসতে লাগলো।

বুলা হীরেনের চোখে-চোখে তাকায়।

'ঈর্ষা করছো নাকি সেজন্যে বৌকে?' খাটের প্রান্তে পা ঝুলিয়ে বসলো বুলা। 'বৌদি গেছে কোথায়?'

হীরেন এবার চট্‌ ক'রে জবাব দিলে না। আড়চোখে কব্জির ঘড়ি দেখলো এবং নিজের মনে বিড়বিড় করলো, 'ন-টা দশ, ইতিমধ্যে ওর ফিরে আসা উচিত ছিলো।'

'কোথায় গেছে?' বুলা প্রশ্ন করলো।

'মিস্টার লাহিড়ির কাছে, তপেশ লাহিড়ি, বলি নি তোকে?' বুলার চোখে-চোখে তাকালো হীরেন।

ঘাড় নাড়লো বুলা।

'কিন্তু টালিগঞ্জ থেকে এতক্ষণে ফিরে আসা উচিত।' হীরেন আস্তে-আস্তে, যেন আবার নিজের মনে কথা বললো, 'অবশ্য মিস্টার লাহিড়ি যদি খামোকা না ধ'রে রাখে।'

'কাজটা হ'য়ে যাচ্ছে আশা করা যায়, কি বলো?'

'হ্যাঁ, হ'য়ে তো যাবেই, না হ'লে···' হীরেন ঢোক গিলে চুপ ক'রে রইলো।

'খুব বড়ো ফার্ম বুঝি তপেশ লাহিড়ির?' বুলা প্রশ্ন করলো।

'জানি না, আমি কিছুই জানি না লাহিড়ি কি তার ফার্ম সম্পর্কে, বলেছি তো।' মুখভার গুরুগম্ভীর হীরেনের। 'ওর, মানে মীরার মামাবাবুর বন্ধু, তাঁর চিঠি নিয়ে দেখা করতে গেছে।'

বুলা আর প্রশ্ন করলো না।

একটুক্ষণ চুপ থেকে দেওয়াল থেকে দেওয়ালে চোখ বুললো। তাকালো পাশের জানলার দিকে। বর্ষার পরিপুষ্ট সবুজ সুঠাম দেবদারু-চারা রৌদ্রে ঝলমল করছে। লাল ডগডগে একটা ফড়িং ঘুরপাক খাচ্ছে অবিশ্রাম জানলা ও গাছের মধ্যবর্তী শূন্যে।

'তারপর তোর খবর কি?' হীরেন প্রশ্ন করলো, 'আজ স্কুল ছুটি?'

বুলা ঘাড় নাড়লো। জানলার দিক থেকে চোখ সরিয়ে হীরেনের দিকে তাকালো।

'চমৎকার ঘর হয়েছে তোমার, প্রচুর আলো হাওয়া খেলে।' যেন এতক্ষণ ও ঘরের কথাই চিন্তা করছিলো। 'কত ভাড়া বলছিলে সেদিন?'

'পঁয়তাল্লিশ।'

'রান্নাঘর তো ওপরেই রয়েছে, বাথরুম পায়খানা।'

বুলা বিড়বিড় ক'রে উঠলো, 'তা পঁয়তাল্লিশ টাকা ভাড়া ঘর হিসেবে সস্তা, পাড়াটাও পরিচ্ছন্ন, বেশ ছিমছাম। উঃ, কী ঘরেই না ছিলে আগে তোমরা!'

অল্প হেসে হীরেন ঘাড় নাড়লো। 'তোর বৌদি তো সেজন্যেই খোঁচা দেয় আমায় উঠতে-বসতে। খারাপ ঘরে থেকে-থেকে আমার অসুখের সৃষ্টি।'

'মিথ্যে কি।' বুলা হীরেনের দিকে তাকালো না। 'এই ঘরও তো তুমি পেয়ে গেছো বৌদির দৌলতে, তাই না? বলছিলে ওর এক পিসেমশাই যোগাড় ক'রে দিয়েছেন?' একটা বালিশের ওপর বুলা নোখের আঁচড় কাটতে লাগলো।

হীরেন বুলার চোখের ভিতর তাকাতে চেষ্টা করলো। 'না-হ'লে আজও আমায় পটলডাঙার পায়রা-খুপ্‌রিতে পচ্‌তে হ'ত। হাসপাতাল থেকে বেরুবো শুনে রাতারাতি ঘর যোগাড় ক'রে ফেললো মীরা।'

'একেবারে অন্যরকম জীবন আরম্ভ হ'লো তোমার, নতুন ঘর, বৌদি চাকরি করবে।' বুলা খাট ছেড়ে উঠে পায়চারি করতে লাগলো। হীরেন চুপ।

হঠাৎ পায়চারি থামিয়ে বুলা ঘাড় তুলে মীরার ফটো দেখছিলো।

'কিন্তু এমন ভালো ঘরেও আমার ভালো লাগছে না বুলা।'

'কেন?' অন্যমনস্কতার দরুন বুলা একটু চমকে ওঠে। মীরার ফটো দেখা শেষ না ক'রেই ও হীরেনের সামনে এসে দাঁড়ায়। 'অসুস্থ তুমি, একলা-একলা তাই—'

'ঠিক তা-ও না।'

'তবে?'

'ওদিকের সব ক-টা জানলা বন্ধ তুই দেখতে পাচ্ছিস?'

'হ্যাঁ।' টিপয়ের দিকের দেওয়ালের সবগুলো জানলা বন্ধ, এখন লক্ষ্য করলো বুলা। 'দুর্গন্ধ আসে?'

'ওরে বাপ্‌!' হীরেন ভুরু পাকালো। 'আর্টিস্টের সুরভি নিশ্বাস।' কথার শেষে হীরেন্ হাসলো।

বুঝলো বুলা। উল্টো দিকের ফ্ল্যাটে এক তরুণ আর্টিস্ট আছেন। মীরা বলেছিলো বুলাকে। 'সারাক্ষণ ঘরে থাকেন বুঝি?'

'হুঁ, ছবি আঁকেন। ফাঁক পেলেই বারান্দায় এসে দাঁড়ান আর চেয়ে থাকেন আমার ঘরের দিকে।'

'ভালোই তো।' হীরেনের ভ্রূভঙ্গি ও আঙুল নাড়া দেখে বুলা হাসলো। 'আর্টিস্টের চোখে ভালো লেগেছে তোমার ঘর।'

'তাই।' হীরেন মাথা নাড়লো। 'তিনি বলেন, মিসেস চক্রবর্তীর মতো সুন্দর বডি নেই কারুর এ-অঞ্চলে।'

বুলা মেঝের দিকে তাকালো।

'আর্টিস্ট বলেন, মেয়েদের শাড়ি-ব্লাউজের ফ্যাশন বদলাচ্ছে যেমন রোজ তেমনি ওদের রূপেরও ফ্যাশন অহরহ বদলাচ্ছে। কাল যে-মেয়ে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা ছিলো, আজকের পুরুষের রুচির কাছে সে ব্যাকডেটেড।' হীরেন টেনে-টেনে হাসে। 'আর্টিস্ট বলেন, যেমন এককালে নাক চোখ নিয়ে মারামারি ছিলো, এককালে শরীরের রং নিয়ে দহরম মহরম চলতো, সে-যুগ এখন বাসী। এখন পুরুষের চোখ খুঁজছে মেয়েদের শরীর, সুন্দর শরীরের মেয়ে।'

'মীরা—' বুলা কথা বলতে যাচ্ছিলো, হীরেন বাধা দিলে: 'আমায় শেষ করতে দে। আর্টিস্ট বলছে, চিবুক থেকে কাঁধের দূরত্ব থাকবে এতটা, কাঁধ থেকে কোমরের দৈর্ঘ্য হবে অত ফুট—আর, সবচেয়ে দরকার যা, কোমর থেকে পায়ের গোড়ালির দৈর্ঘ্য হবে এতখানি, এক ইঞ্চির এদিক-সেদিকে মেয়েদের সেকেলে হবার আশঙ্কা, থাক না তিল ফুলের মতো নাক, রামধনুছাঁদ ভুরু। মিসেস চক্রবর্তী লেটেস্ট মডেলের মেয়ে।'

বুলা হীরেনের মুখের দিকে তাকায়। দাদার চেহারা বদলে গেছে।

'অ্যাস্থেটিক কালচার এখন হাড় ও মাংস জরিপে এসে ঠেকেছে, বুঝলি।' হীরেন অন্যদিকে মুখ ফেরালো।

'জানলা দুটো বন্ধ রেখে ভালো করেছো তুমি।' নোখ খুঁটতে-খুঁটতে বুলা বললো।

'কিন্তু রাখলে হবে কি। স্কাউণ্ড্রেলটা নিচে গিয়ে দাঁড়াবে, মীরা কখন বাড়িতে ঢোকে, বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে, ওর দাঁড়িয়ে দেখা চাই-ই।'

'আশ্চর্য নির্লজ্জ।' বুলা বিড়বিড় ক'রে উঠলো।

হীরেন উঠে হাত দুটো পিছনে রেখে ঘরের মেঝেয় পায়চারি করতে লাগলো। পায়চারি করার সময় একবার এই-দেওয়ালের মীরার ফটো একবার ঐ-দেওয়ালের মীরার ফটো দেখতে লাগলো।

'তোমার দুধ ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ খাবো।' হীরেন মুখ ফেরালো। 'তুই চললি?'

হাতে ব্যাগ নিয়ে বুলা টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ায়।

'তুমি খেয়ে নাও এইবেলা, আমি চললাম। একটু কাজে এদিকে এসেছিলাম, ভাবলাম মীরা বৌদির চাকরি হ'লো কি না খবরটা নিয়ে যাই।'

'হবে, হ'য়ে যাবে নিশ্চয়। না-হ'লে চলবেই বা কি ক'রে।' হীরেন চৌকাঠের দিকে তাকালো, বুলা চৌকাঠের বাইরে।

'কিন্তু হ'য়ে যাওয়াটাই তো সব কথা নয়।' হীরেন বুলার মুখের দিকে তাকিয়ে গলার একটা শব্দ করলো। 'তা আসবি, সময়-সময় এসে আমার সঙ্গে দুটো গল্প করবি, বুঝলি, মনটা ভালো থাকে।'

হীরেনের চোখে কাতরতা।

ঘাড় বেঁকিয়ে বুলা বললো, 'আসবো।' সিঁড়ি বেয়ে ও নিচে নেমে গেল।

পটলডাঙায় হীরেনের প্রতিবেশী ছিলেন বুলার বাবা। হীরেনের দূরসম্পর্কীয় কাকা। একটা অফিসে কেরানী ছিলেন, সম্প্রতি ক্যানসারে মারা গেছেন। এক-দঙ্গল ছেলেমেয়ে রেখে গেছেন তিনি বিধবার জন্যে।

বুলা সকলের বড়ো সন্তান। ম্যাট্রিক পাশ ক'রে মাস্টারি করছে। তার আয়ের ওপর গোটা পরিবার দাঁড়িয়ে।

হীরেন পায়চারি করতে-করতে বুলার কথা ভাবলো। এখনো বিয়ে

হয় নি, কারণ অনেক চেষ্টা ক'রেও ও আজ পর্যন্ত ভালো একটা চাকরি যোগাড় করতে পারছে না যে অন্তত কিছুদিন চলে, এমন ক-টা টাকা মার হাতে তুলে দিয়ে ও বিয়ে করে।

বিয়ের পর মা-ভাইবোনকে টাকা দেওয়া না দেওয়া ভবিষ্যৎ পুরুষের ওপর নির্ভর করে।

একদিন বলছিলো ও গল্পচ্ছলে হীরেনের কাছে, 'অবশ্য দরকার হ'লে কি স্বামীর জন্যে মেয়েরা চাকরি করে না, করছে, কিন্তু, আমার কাছে কেন জানি হারেমই ভালো, হারেমবিলাসিনীরা সুখী।' বলতে-বলতে ওর চোখ চকচকে হ'য়ে গিয়েছিলো সেদিন, হীরেনের মনে আছে। 'আমি চাই, আমি চাইছি সারাক্ষণ একটি পুরুষ আমায় ধ'রে রাখুক, আমাকে দেখুক, আর প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি সামগ্রী আমার চারদিকে এনে জড়ো করুক। হারেম ছেড়ে কোনোদিন আমায় যেন বাইরে গিয়ে না-দাঁড়াতে হয়। বাইরের পৃথিবী কঠিন, বড়ো কঠিন হিরুদা।' —ব'লে বুলা হাই তুলেছিলো। যেন একটু সময়ের জন্য ওর ঘুম পেয়েছিলো। ঐ একদিন, একবার। মেঘ থমথমে শ্রাবণ দুপুর। শনিবারের স্কুল সেরে বাড়ি ফেরার পথে হীরেনের ঘরে ঢুকে গল্প করছিলো বুলা।

কথাটা ভাবতে হীরেনের পায়চারি থেমে গেল হঠাৎ। থমকে দাঁড়ালো সে। সেদিন বুলা যখন গল্প করছিলো পাশে দাঁড়িয়ে মীরা শুনছিলো না? হীরেনের পরিষ্কার মনে আছে। বিয়ের অল্প ক-দিন পরের ঘটনা, মীরা ছিলো ঘরে। কিন্তু আজ হীরেনের মনে পড়ছে না হারেমবিলাসিনীর স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখের দিকে তাকিয়ে মীরার চোখে কি রং ধরেছিলো, কি ভাবাবেগ।

মীরা কাজে ব্যস্ত ছিলো, জলখাবার করতে, চায়ের সরঞ্জাম সাজাতে, ঘর গোছাতে।

বুলার দিকে তাকাতে, বুলার কথা শুনে এক ঝলক দীর্ঘশ্বাস ফেলতে সময় ছিলো না মীরার।

কাজ, কাজ···

বিয়ের পর থেকেই লক্ষ্য করছে হীরেন, কাজের আবরণ প'রে নিজেকে ঢেকে রাখতেই যেন মীরা পছন্দ করছে বেশি।

যাদের কাজ নেই তারা কাচের মতো ঠুন্‌কো ওর চোখে। এক-এক সময় মীরার ভাব দেখে তা-ই মনে হয়। বুলার অলস গান, বিয়ের পর শুধু স্বামীর অঙ্কশায়িনী হ'য়ে থাকার কল্পনা মীরার মনে স্বপ্নজাল তৈরি করছিলো না, হীরেন এ-সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ।

তখন ছিলো শুধু ঘরের কাজ।

পেট কাটিয়ে হীরেন হাসপাতাল থেকে পঙ্গু হ'য়ে ফিরে এসেছে পর মীরার কাজের সীমানা কেবল ঘর নয়, ঘরের বাইরে দূর দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। কোথায় কোন্ পিসেমশাইকে ধ'রে বাড়ি ঠিক করা, মামা-মশাইর চিঠি নিয়ে টালিগঞ্জবাসী ধনাঢ্য তপেশ লাহিড়িকে ধরা চাকরির জন্যে। তা ছাড়াও হীরেনের হাসপাতালে থাকাকালীন সংসারের যাবতীয় খরচ, দুধের দাম, ফলের দাম, পটলডাঙার বাড়ির দু-মাসের বাকি ভাড়া একসঙ্গে মিটিয়ে রাতারাতি নতুন পাড়ায় এমন সুন্দর এক বাড়িতে কি ক'রে মীরা উঠে এলো, উঠে আসতে পারলো এই দুর্দিনে, হীরেন ভাবে।

প্রশ্ন করা বৃথা, বোঝে হীরেন। কেননা, তার উত্তর একরকম।

হাসপাতালে যাবার আগে থেকেই সে একটু-একটু শুনছিলো। একটি কথা এ-মাসে, ও-মাসে দুটো। 'আরো পঞ্চাশ টাকা দাদার কাছে ধার

করতে হ'লো। তোমার মাইনের টাকায় ঠিক সতেরো দিন গেছে। এখনো তেরো দিন—কয়লা, তেল, চিনি, নুন কিছুই নেই ঘরে।'

'আগামী মাসে শোধ ক'রে ফেলবো।' হীরেন বেশ জোর দিয়ে বলেছিলো। 'অন্তত বাড়িভাড়া বাকি রেখেও।'

মীরা কথা বলে নি।

পরের মাসে, দশ দিন পার হ'তেই হীরেনের বেদনা শুরু। ডাক্তার, ওষুধ, ইনজেকশন এবং পথ্য বাবদ রাজকীয় খরচের সমারোহ।

হীরেনের মাইনে তো বটেই, এক-শ' পঞ্চাশ টাকা দাদার এবং মীরার বিয়ের একটা আংটি। অবশ্য মীরার দাদা অঞ্জন মুখার্জি যে বড়োলোক তা নয়, বিয়েতে মীরাকে অনেক সোনাদানা দেওয়া হয়েছিলো তাও নয়, ভদ্রলোক আলিপুর কোর্টের উকিল। মোটামুটিরকম পসার। পঁয়ত্রিশে পা দিয়েছেন। কিন্তু বয়স ও আয়ের অনুপাতে সংসারের চাপটা একটু বেশি ব'লে এদিকে অনেকটা দ'মে গেছেন। না-হ'লে খেলাধুলো, গান-বাজনা, ক্লাব-মিটিং ক'রে কাটাতেন ভদ্রলোক।

বাবার পলিসির হাজার পনেরো টাকা হাতে এসেছিলো তাই অঞ্জনবাবু বড়ো দুটো বোনকে পার করতে পারলেন। ইরা গেছে অ্যাডভোকেটের কাছে, মীরার বিয়ে হ'লো অধ্যাপকের সঙ্গে। হীরেন চক্রবর্তী। ইউনিভার্সিটির কৃতী ছেলে তো বটেই, সাহিত্যে, সংগীতে প্রবল অনুরাগ। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি। উদারচরিত্র ও প্রাণবন্ত। মীরার ইচ্ছাক্রমেই মীরার এই বিবাহ। হীরেনকে দেখে প্রথম দিনই অঞ্জনবাবুর ভালো লেগেছিলো।

মীরার প্রখর দৃষ্টি বা বুদ্ধি ইরাতে ছিলো না। বন্ধুবান্ধব এবং নিজের চেষ্টায় অঞ্জনবাবু অ্যাডভোকেট পাত্রটি সংগ্রহ করেছিলেন। ভূপেশ নাগ। ভালো মানুষ। হীরেনের অমিত বুদ্ধি ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি না রাখলেও

ঈশ্বর ভূপেশকে সুখী করার মতন, সুখে থাকার মতন অবলম্বন দিয়েছিলেন। তার পরলোকগত পিতা বেলেঘাটায় ছোট্ট একটা গেঞ্জির ফ্যাক্টরি রেখে গেছেন।

নামেমাত্র প্র্যাক্‌টিস, তা ছাড়া সবটা শক্তি মনোযোগ ও উদ্যম মোজা-গেঞ্জিতে ঢেলে দিয়ে ভূপেশ উত্তরোত্তর ভালোই করছিলো। কয়েক কাঠা জমি কিনেছে হালে, বাড়ি করছে, নিজে বেশ মোটা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে স্ত্রী ইরাও। চার বছরে তিনটি বাচ্চা হয়েছে ওদের। সময় ও কালের বিচারে ভূপেশ ও ইরা সুখী। অবশ্য হীরেন ও মীরার বেলায় আর্থিক অসচ্ছলতা নিয়ে অঞ্জনবাবু খুব যে একটা মাথা ঘামান তা নয়। কেননা, তাঁর মোটামুটি যা ধারণা, দু-জনই ইন্‌টেলেকচুয়্যাল জীব। অর্থকে তারা প্রকাণ্ড ক'রে দেখতে পারে, আবার অর্থ ধুলোর মতো পা দিয়ে মাড়াতে পারে। যা তিনি শোনেন বার-লাইব্রেরির আড্ডায় ব'সে।

এ-বিষয়ে জুনিয়র সিনিয়র এক মত।

এক সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী দু-জনেরই উচ্চশিক্ষা ও সূক্ষ্ম শিল্পবোধ থাকলে সেই দাম্পত্যজীবনের সুখ-অসুখকে সাধারণের সুখ-অসুখের পর্যায়ে ফেলে বিচার করা চলে না। কেননা, এটা পরিষ্কার দেখা গেছে, অনেক সময় টাকা দিয়েও মানুষের রুচি ও সংস্কৃতির ভোল ফেরানো যায় না। প্রচুর টাকা পেলেই যে হীরেন চক্রবর্তী সকাল-সন্ধ্যা রবীন্দ্রনাথ এলিঅট পড়া কি তাঁদেরই কারোর ওপর প্রবন্ধ লেখা বন্ধ রাখবে আর হীরেনের পাশে ব'সে মীরা বেহালায় ছড় টানা কি নতুন কোনো গৎ-এর সন্ধানে রোজ বিলিতি জার্নাল হাতড়ানো স্থগিত রেখে শাড়িগয়নার দোকানে ছুটবে সে একটা কথা নয়, বা টাকা নেই ব'লে নিজেদের শিক্ষা সংস্কৃতি কি রুচির ওপর অভিমান ক'রে দু-জনে গালে হাত দিয়ে ব'সে পৃথিবী অন্ধকার দেখবে, অঞ্জনবাবু তা বিশ্বাস করেন না। চিরকাল মীরাকে

দেখে এবং এই মীরার মুখেই অনর্গল হীরেনের গল্প শুনে-শুনে অঞ্জনবাবুর তাই ধারণা হয়েছিলো।

তা ছাড়া হীরেন তো একটা কলেজে চাকরি করছেই। এবং মীরা,—ইরা হ'লে অঞ্জনবাবু বেশ একটু নার্ভাস হ'য়ে পড়তেন, মীরা অনেক বেশি শক্ত ধাতের মেয়ে, ধৈর্যশীলা, বুদ্ধি সম্পর্কে তো প্রশ্নই নেই। ইরার প্রায় বছর চারেকের ছোটো যদিও ও।

বিয়ের অব্যবহিত আগে ও পরে মীরা তাদের দুই বোন ও দুই জামাই সম্পর্কে দাদা কি বলেন, হীরেনকে সব শোনাতো। ইদানীং অঞ্জনবাবু সম্পর্কে মীরা একেবারে নীরব।

দু-বার টাকা ধার করার পর তৃতীয়বার আর যখন ও মনোহরপুকুর রোডে গেল না, নিজের আংটি বিক্রি ক'রে টাকা যোগাড় করলো তখনই হীরেন অনেকটা আঁচ করেছিলো। একদিন, হীরেন তখন হাসপাতালে, অঞ্জনবাবুরা (তাঁর স্ত্রী ও চারটি সন্তান) কেমন আছেন জিজ্ঞেস করায় মীরা বলেছিলো ও-বাড়িতে সে অনেকদিন যায় না। কেন যায় না হীরেন প্রশ্ন করে নি। অবশ্য অঞ্জনবাবু, তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা এক রবিবার হাসপাতালে হীরেনকে দেখতে গিয়েছিলেন। এবং মীরা কেন আর বেড়াতে যাচ্ছে না তাঁরাও সেদিন প্রশ্ন তোলেন নি।

মীরা ব্যস্ত। মীরার চোখ দেখে তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন। ঘর হাসপাতাল ক'রে মোটে সময় পাচ্ছে না বেড়াবার, কোথাও বেরুবার। দাদা, বৌদি রুগীর খাটের একপাশে দাঁড়িয়েছিলেন, এবং তাঁদের চার ছেলে-মেয়ে। মীরা ছিলো খাটের ও-পাশে। হাসপাতালের নম্বরমারা মগ্ থেকে কাচের গ্লাসে হীরেনের জন্য দুধ ঢালছিলো। ওর আনত চোখের পাতায়, স্থির ভ্রূযুগলে, আড়ষ্ট অধরোষ্ঠে, চোয়ালে, চিবুকে কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠা এবং অপার বাকসংযম দেখে কেউ বিস্মিত হয় নি।

একলা মীরাকেই 'এখন সবদিক সামলাতে হবে, হচ্ছে। হীরেনের অপারেশনের কথা শুনে মীরার নার্ভাস হ'লে চলবে না।

অঞ্জনবাবু এবং তাঁর স্ত্রীর চোখ থেকেও গাম্ভীর্য ঝরছিলো।

মেরুন রঙের শাড়ি পরনে ছিলো মীরার। ওটাই ওর সবচেয়ে সুন্দর কাপড়। বিয়েতে উপহার পেয়েছিলো, কোনো-এক বড়োলোক আত্মীয় মীরাকে আশীর্বাদ করেছেন। অনেক দাম ঐ শাড়ির।

অঞ্জনবাবু নিজে বড়োলোক না হ'লেও তাঁর বড়োলোক আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সারা কলকাতায় ছড়িয়ে।

হীরেন জানতো। মীরা বলেছে। হাসপাতালের বেড-এ শুয়ে ও শুনলো দাদার সঙ্গে নিতান্তই কাজের কথা ছাড়া আর কোনো কথা বলছিলো না মীরা। থেকে-থেকে অঞ্জনবাবু উদ্বিগ্ন ভুরু হানছিলেন, পরে মীরার এক-একটি নাম প্রস্তাবে প্রফুল্ল হ'য়ে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ছিলেন। 'হ্যাঁ।' অঞ্জনবাবু বলছিলেন, 'আমার সঙ্গে এখন কারোর আর তেমন ভালো জানাশোনা নেই, সাংসারিক ঝামেলায় বেরুতেই পারি না, তুই যা, তুই নিজে গেলে মামাবাবু চিনবেন। ভালো বাড়ি জুটিয়ে দেবেন।'

মীরা চুপ ক'রে ছিলো। প্রথমত ওই শাড়িটা পরনে, তার ওপর অত্যধিক গম্ভীর ছিলো ব'লে কেমন অন্যরকম লাগছিলো মীরাকে। যোয়ান-অব-আর্কের মতন। হীরেন সেদিন ভাবছিলো। মীরার চোখে চশমা ছিলো না।

খুব বেশি ক্লান্ত ব'লে হীরেন মীরার দিকে অনেকক্ষণ তাকাতে পারে নি।

রক্তাভ বড়ো একটা কাচের জানলার দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো। রুগীর পাশে দাঁড়িয়ে চার্ট নিয়ে নার্সরা যেমন নিচু-গলায় আলোচনা করে তেমনি অপারেশন-থিয়েটারে উঠবার ষোলো ঘণ্টা আগে

সে মীরা ও অঞ্জনবাবুকে তার সংসারখরচ ইত্যাদি ছাড়াও বাড়ি বদলানো এবং মীরার চাকরি নেওয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছিলো। ওখানেই সব ফাইন্যাল হ'য়ে যায়।

তারপর একটি-একটি ক'রে মীরা ক'রে যাচ্ছে। নতুন বাড়ি ভাড়া করা এবং আরো-কিছু টাকা ধার ক'রে ঘর সাজাবার উপযোগী দু-একটা ফার্নিচার পর্যন্ত কেনা হ'লো সেদিন। কোনোটা একদম নতুন, কোনোটা সামান্য পুরোনো। এনে আবার রং ফেরানো হয়েছে। একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ইলেকট্রিক হিটার কিনেছে মীরা, ওর অনেক দিনের শখ। খরচ একটু বেশি হচ্ছে। হবেই। এটা জানা কথা। বুলাও এইমাত্র ব'লে গেল, 'গ্র্যাজুয়েট মেয়ে, দেখতে ভালো, আড়াই-শ' পাবে বৌ।' অর্থাৎ হীরেনের রোজগারের প্রায় দ্বিগুণ। এখন ভালোয়-ভালোয় কাজটা হ'য়ে যায়, মীরাও বার-বার বলছিলো কাল রাত্রে।

তপেশ লাহিড়িকে হীরেন জানে না, দেখে নি। হীরেন পায়চারি বন্ধ রেখে ঘড়ি দেখলো। দশটা দশ। একবার সে জানলার কাছে গেল। এখনই তাকানো যায় না বাইরে। দেবদারু-পাতার সবুজ লাবণ্য রৌদ্রে পুড়ে কালো হ'তে চললো। মীরার এতো দেরি হবার কথা কি। পায়চারি করতেও হীরেন আর হাঁটুতে জোর পাচ্ছিলো না। ইজিচেয়ারে ব'সে দুই আঙুলে কপালের রগ টিপে ধরলো।

দুই

মীরা ঘরে ঢুকছে হীরেন দেখতে পেলো।

ঘুমোয় নি সে, ঘুমের ভান ক'রে ইজিচেয়ারে শুয়েছিলো, আধবোজা চোখ দরজার দিকে ফেরানো।

বুলা ঘর থেকে বেরোবার পর হীরেন আর দরজার ছিটকিনি দেয় নি। কাজেই মীরার কড়া নাড়তে কি দরজায় টোকা দিতে বা হীরেনকে ডাকতে হ'লো না। আধবোজা চোখের পাতার ভিতর দিয়ে হীরেন দেখলো মীরা জুতোর ফিতে খুলছে, হাতের ব্যাগটা খাটের শিয়রের ধারে রাখছে, রুমাল দিয়ে গাল গলা অল্প-অল্প চাপড়াতে-চাপড়াতে একটু-সময়ের জন্যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছে।

তারপর পরনের ঝকঝকে বেগ্‌নি মাদ্রাজি শাড়ি ছেড়ে ফেললো ও, ছাড়লো চকচকে কালো শাটিনের ব্লাউজ। শুধু শায়া, রক্তের মতো লাল শায়া আর জংলি ছিটের আধময়লা ব্রেসিয়ারে মীরাকে, মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে যদিও, মীরার শরীরটাকে কেমন অদ্ভুত হিংস্র, অশ্লীল মনে হয় হীরেনের।

তারপর অবশ্য আটপৌরে ঢাকাই বুটিদারে ও শরীর জড়িয়ে ফেলে। শান্তশিষ্ট ঘরোয়া মীরা।

ঘরোয়া মীরা ; হিংস্র মীরা ; সবুজ বেগ্‌নি মেরুনে ঢাকা উজ্জ্বল এঞ্জেল মীরা।

মীরা চুলের ফিতে খুললো। সাবানের বাক্স ও তোয়ালে হাতে নিলো, তারপর টেবিলের ওপর দুধের গ্লাস ও রুটির টুকরো দুটো প'ড়ে আছে দেখে আস্তে-আস্তে হীরেনের সামনে এসে দাঁড়ালো।

'ঘুমোচ্ছ ?' মীরা ডাকলো।

হীরেন চোখ খুললো।

'সকালের খাবার প'ড়ে আছে তোমার ?' মীরা প্রশ্ন করলো।

'না, ইচ্ছে হ'লো না।' হীরেন হাই তুললো। 'কখন ফিরলে ?'

'এই তো।' মীরা জানলার দিকে তাকিয়ে ছোট্ট নিশ্বাস ফেললো। 'তুমি খেলে না কেন ?'

'একটু-একটু পেন্ হচ্ছিলো পেটে যেন।' হীরেন বললো। টেবিলের দুধ ও রুটির দিকে চেয়ে সে একটু অবাক। সত্যি কি খাওয়ার কথা তার মনে ছিলো না!

'বুলা এসেছিলো।' বললো হীরেন।

'কখন ?' মীরা ঘাড় ফেরালো। তারপর যেন হঠাৎ খাটের দিকে চোখ পড়তে শয্যার এ-প্রান্তের ঈষৎ কোঁচকানো ঢাক্‌নার ওপর চোখ পড়তে চুপ ক'রে গেল। হীরেনের চোখ এড়ালো না। বুলা ঘরে ঢুকে চেয়ার টুল বেতের মোড়া অর্থাৎ ঘরে যে-আসনটি থাক-না, খাট ছাড়া, খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসা ছাড়া বসতে পারে না, হীরেন বহুদিন লক্ষ্য করেছে। নিশ্চয় মীরাও তা লক্ষ্য করে। হীরেন নিঃসন্দিগ্ধ।

'কি বললে ও ?' মীরা হীরেনের দিকে চোখ ফেরায়।

'তোমার কাজের কথা জিজ্ঞেস করছিলো, চাকরি হ'লো কি না।' হীরেন মীরার দিকে তাকাতে পারলো না।

'চাকরি তো হ'য়েই আছে, কেবল মিস্টার লাহিড়ির সঙ্গে একবার দেখা করার অপেক্ষা।' যেন নিজের মনে কথা বললো মীরা। পায়চারি করতে-করতে টিপয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো একটুক্ষণ, রজনীগন্ধার আর ক-টি কলি বাকি আছে ফুটতে নুয়ে মনোযোগ দিয়ে তাই দেখলো।

'কাল থেকেই জয়েন্ করতে হচ্ছে।' মুখ তুলে মীরা বললো।

হীরেন চমকে উঠলো।

'কাল?' হাসি-হাসি চেহারা যদিও হীরেনের, মুখের কথাটা প্রায় ফিসফিসানির মতো শোনালো। মীরা মাথা নাড়লো, তারপর আর একবার খাটের কোঁচকানো অংশের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কান খাড়া ক'রে চুপচাপ ব'সে রইলো হীরেন। স্নানের ঘরের দরজার শিকল নামানোর শব্দ, জলের শব্দ, মীরার চুড়ির রিনরিন ছাড়া আর-কোনো শব্দ তার কানে এলো না কতকক্ষণ। আশ্চর্য, হীরেন ভাবলো, ভেবে অবাক হ'লো, কোথায় সে মীরাকে প্রশ্ন করবে, ফিরতে এত দেরি কেন, তপেশ লাহিড়ি কেমন লোক, কি কথা হ'লো, জয়েনিং ডেট্ কবে, মেয়ে-কলিগ্ অফিসে আর ক-টি, মীরা কবে থেকে কাজে লাগছে, তা না, তার কিছুই হ'লো না। তার আগে প্রশ্ন হ'লো, 'বুলা? কখন এসেছিলো, কতক্ষণ ছিলো, কি বললো, বুলা বসেছিলো কোথায়?'

হীরেন উঠে আবার পায়চারি আরম্ভ করে।

বাথরুম থেকে শব্দ আসছিলো। জলের শব্দ, চুড়ির নিক্কণ, মীরার গানের গুনগুনানি!

'আশ্চর্য, সকালে তুমি খেলে না কেন?' ভাত খেতে ব'সে মীরা প্রশ্ন করলো। হীরেনের জন্যে আলাদা ঝোল। আদাবাটা আর হিঞ্চে শাক।

'একটু পেন্ হচ্ছিলো মনে হ'লো যেন।' ঝোলের বাটিতে আঙুল ডুবিয়ে হীরেন বললো, 'মাছ নেই?'

'মাগুর মাছ পেলে না, মালতী বললে তো।'

হীরেন আর কথা বললো না।

মালতী হীরেনের বাড়ির ঠিকে-ঝি। মসলা বাটে, থালাবাসন ধোয়, জল তোলে। দশ টাকা মাইনে। মীরা দু-দিন অন্তত বাজার করায়, তার

জন্যে নগদ ছু-আনা ক'রে আদায় করছে মালতী। আর বলছে যদি দিদিমণি চাকরি করতে যায় তো রান্নাবান্নারও একটা ব্যবস্থা ক'রে দেবে ও।

মীরা বললো, 'কাল থেকে কি মালু রান্না করবে ?'

'বিকেলে ও এলে কথা হবে।' হীরেন গম্ভীর। হাঁসের ডিমের ঝোল দিয়ে মীরা ভাত মাখছে। মালতী দাদাবাবুর মাছ পায় নি, দিদিমণির ডিম নিয়ে এসেছে বাজার থেকে। লঙ্কা পিঁয়াজ গরমমশলা দিয়ে আলাদা ক'রে রাঁধা। মীরা নিজের হাতে রেঁধে গেছে বেরোবার আগে। সেই ভোর পাঁচটায় আজ ওর ঘুম ভেঙেছিলো।

হীরেন সতৃষ্ণ চোখে, যেন চুরি ক'রে মীরার পাতের তেলতেলে সোনালী ঝোল দেখছিলো, তারপর চোখ ফেরালো তার আদার ঝোলের দিকে। ফ্যাকাশে সবুজ শাদাটে নির্জীব।

তেল-হলুদের জৌলসে মীরার পরিপুষ্ট আঙুল আগুনের শিখার মতো জ্বলছিলো।

শীর্ণ, বিবর্ণ, নিস্তেজ আঙুল হীরেনের।

কিন্তু তবুও তার গলা গাম্ভীর্যে থমথম করছিলো। 'মিস্টার লাহিড়ি কি বললেন ?'

'জিজ্ঞেস করলেন নাম, তোমার নাম।' মীরা মুখ তুললো।

হীরেন মুখ নামালো।

'আর ?'

'আগে কোথাও চাকরি করেছি কি না।'

হিঞ্চে শাকগুলো হীরেন আলগোছে তুলে পাতের কিনারে ফেলে দিলে।

মীরা অপাঙ্গে স্বামীর ভুরু দেখলো।

'আর ?' —নিস্তেজ আঙুলে যথাসম্ভব জোর দিয়ে হীরেন নেবুর

টুকরোটা নিংড়ে-নিংড়ে রস বা'র করছিলো। 'আর কি জিজ্ঞেস করলেন লাহিড়ি ?'

'তুমি এখন কেমন আছো, কার ট্রিটমেণ্টে আছো। বাড়িভাড়া আমাদের কত দিতে হচ্ছে, কতদিন সার্ভিস হয়েছিলো তোমার, প্রভিডেণ্ড ফণ্ড-টণ্ড কিছু ছিলো কি না।' বাঁ-হাতে কাচের গ্লাস তুলে মীরা একটু জল খেলো। 'মামাবাবুর বিশেষ বন্ধু কিনা, তাই মিস্টার লাহিড়ি আমার,— আমাদের—'

মীরার চোখে চোখ রেখে হীরেন বললো, 'ইণ্টারেস্টেড।'

'ঠিক তা না।' —যেন সঠিক শব্দটা হাতের কাছে খুঁজে না পেয়ে মীরা বিপরীত দিকের দেওয়ালে চোখ রাখলো।

'নেচার অব্ ওয়ার্ক সম্বন্ধে কিছু আভাস দিলে কি,—তোমার ?' হীরেন জলের গ্লাস মুখের কাছে তুললো। 'কি রকম পে-টে হবে ?'

'কি আর কাজ হবে, ঐ লেখাপড়ার কাজ—কেরানীগিরি, ডেস্‌প্যাচ্ কি অ্যাকাউণ্টস ডিপার্টমেণ্টে দেবে আর কি। মেয়ে-কেরানী।' কথাটা ব'লে মীরা হঠাৎ শব্দ ক'রে হাসলো। অ্যালাওয়েন্স নিয়ে শ'-আড়াই হবে বোধহয়।'

হীরেন হাসতে পারলো না।

মীরার ঘোরানো বেণীর ওপর চোখ রেখে গম্ভীর গলায় বললো, 'কেরানী নয়, কেরানীর কি আরম্ভেই অতো মাইনে হয় !'

'কাল দুপুর থেকে ভয়ানক একলা থাকতে হবে আমায়।' হীরেন হাত ধুতে উঠে পড়লো। মীরা চুপ। এঁটো থালা বাটি গ্লাস একত্র করে ও।

জানলার ভারী নীল পর্দাগুলো টেনে দিলে মীরা, পিছনের সিঁড়ির মুখের এবং সামনের দরজার প্রত্যেকটি কবাট ভেজিয়ে দিলে। সূর্য

ওঠার আগে কি সূর্যাস্তের পর নরম ছায়া-ছায়া আলোয় যেমন পৃথিবী ভ'রে যায়, তেমনি রৌদ্র-উজ্জ্বল প্রশস্ত রাসবিহারী অ্যাভিনিউর এই ছোট্ট ঘরটি নরম ফুটফুটে আলোয় ভ'রে গেল।

হীরেনের ভালো লাগলো।

আঙুল দিয়ে টেনে-টেনে মীরা বিছানার কোঁচকানো অংশ পালিশ ক'রে দিলে, বুলা যেখানটায় বসেছিলো। সমান ক'রে সাজিয়ে দিলে হীরেনের জোড়া বালিশ, পাশ-বালিশ।

হীরেনের বুকের মধ্যে টিবটিব করছিলো। সূক্ষ্ম চোখে সে তাকিয়ে দেখছিলো তারপর মীরা কি করে। নিজের বালিশ দুটো শিয়রে না রেখে এক পাশে সরিয়ে রাখলো মীরা। হীরেন অন্যদিকে মুখ ফেরালো।

'এসো শোবে।' মীরা ডাকলো।

'তুমি?' হীরেন ইজিচেয়ার থেকে উঠলো না। মীরা ঘরে না থাকলে দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ওখানেই সে বিশ্রাম করে।

'আমাকে এখুনি বেরুতে হবে।' মীরা বললো।

'আবার?' হীরেন মীরার চোখ দেখলো। 'এই তো এলে—' আস্তে-আস্তে বললো সে।

'তোমার সেই ক্যাপস্যুলের আর-একটা......ফাইল......নিয়ে আসি।'

'ও, সেজন্যে, তা বিকেলে আনলেও চলবে।' হীরেন হাসতে চেষ্টা করলো। 'এখন এই রোদে বেরুবে কি! তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কি?' মীরা স্থির চোখে হীরেনের মুখ দেখছিলো।

'ও খুব সামান্য পেন্, প্রায় না-হওয়ার মতন, হয় নি হয়তো, আমার মনে হচ্ছিলো যেন বুঝি আবার সেই পেন্—'

'অদ্ভুত তুমি।' মীরা অস্ফুটে বললো, 'আমি জানি সকালে তুমি আজ টিফিন খাবে না, খেতে পারবে না। পেন্-ফেন্ বাজে ওজর।'

ঘাড় নামিয়ে হীরেন চুপ ক'রে রইলো।

'আসলে তোমার মন খারাপ হ'য়ে আছে আমি চাকরিতে ঢুকছি ব'লে। তুমি কোনোরকমেই এটা স্বাভাবিকভাবে নিতে পারবে না, পারছো না। আমি জানতাম।'

'এই দেখ!' হীরেন প্রতিবাদ করতে চাইলো, 'আমি কি বলছি, বলেছি তোমাকে যে, তা ছাড়া, তা ছাড়া—' হীরেন থেমে গেল।

'তুমি রীতিমতো ঈর্ষা করছো।' মীরা ঠোঁটে ঠোঁট চাপলো। 'হাসপাতাল থেকে বেরোবার দিন থেকে আমি লক্ষ্য করছি—।'

'যে তুমি সুন্দরভাবে সংসার চালাচ্ছো? আমি ছাড়া, আমাকে ছাড়া সব-কিছুর শৃঙ্খলা রেখে—' হীরেন মৃদু হাসতে লাগলো। 'তোমার ভুল ধারণা, মীরা।'

মীরা কথা বললো না।

'তা ছাড়া কতদিন আমার এই অবস্থা থাকবে তার ঠিক কি। একটা-কিছু তোমাকে না করলে চলবে কেন।'

'হাতে যে-টাকা আছে বড়োজোর আর এক সপ্তাহ যাবে। পরশুদিন রেশন আনতে হবে।'

হীরেন চুপ ক'রে শুনলো।

'এখানকার দুধওলারা পনেরো দিন পর-পর টাকা নেয়, মাসের হিসেব জানে না।'

'তা ছাড়া মাসের শেষে আবার এতগুলো টাকা বাড়িভাড়া।' হীরেন যোগ করলো।

'তাই বলছিলাম, তুমি জানো, কিন্তু জানতে চাও না। বোঝো, অথচ বোঝো না।' মীরা আস্তে-আস্তে পায়চারি করে।

হীরেন নীরব।

মীরা হাত বাড়িয়ে একটা জানলার পর্দা সরিয়ে দেয়। একটুক্ষণ দাঁড়ায় সেখানে। তারপর স'রে এসে হীরেনের সামনে দাঁড়ায়।

'গেল-মাসটা কি ক'রে ম্যানেজ করেছি তুমি আইডিয়া করতে পারো ?'

হীরেন মীরার চোখে চোখ রাখলো। 'না। আবার কিছু বিক্রি করতে হয়েছিলো কি ?'

'না, বিক্রি করবার আর আছে কি।' আস্তে-আস্তে মীরা জানলার কাছে ফিরে গেল। 'পুষ্পর কথা বলেছি তোমায় ? পুষ্প দে ?' মীরা এদিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

'কে ?' হীরেন জানলার দিকে তাকায়, মীরার মুখের দিকে। 'তোমার কেউ কি—'

'না, আত্মীয় নয়। আপন দাদার কাছেই যখন তৃতীয় বার টাকা ধার চাইতে পারি নি তো এমন কে আত্মীয় আছে যে গিয়ে হাত পাতবো ?' মীরা মৃদু নিশ্বাস ফেললো। 'আমার একটি বন্ধু।'

'পুরুষ কি মেয়ে ?' প্রশ্ন করতো হীরেন, হীরেনের কৌতূহলাচ্ছন্ন দৃষ্টি। কিন্তু কিছু বললো না। মীরার দিকে চেয়ে রইলো শুধু।

'বেথুনে এক সঙ্গে পড়েছি আমরা। মস্ত বড়োলোকের মেয়ে। মোটরগাড়ির এজেন্সি আছে পুষ্পর বাবার, ধর্মতলায় দোকান।' দুই হাতের কব্জি বেণীর ওপর রেখে কনুই দুটি ঘাড়ের দু-দিকে প্রসারিত ক'রে দিলে মীরা। শাদা সুন্দর বাহুযুগল। রাজহংসীর পক্ষবিস্তারের কথা মনে পড়লো হীরেনের। 'পুষ্পকে তুমি দেখ নি,' মীরা বললো, 'আমার চেয়েও দেখতে সুন্দর, এই লম্বা টাইপের শরীর, সবচেয়ে মারাত্মক ওর ভুরু, বর্ণনা নেই, তুলনা নেই এর।' মীরার চোখ বুজে এলো সখীর রূপবর্ণনা করতে-করতে।

'আমি দেখি নি।' হীরেন আস্তে বললো।

চশমা-পরা, আদুরে চেহারার, গালে অভিমান-লেগে-থাকা একটি মেয়েকে ছাড়া আর কোন্ মেয়েকেই বা দেখেছিলাম, হীরেন ভাবলো এবং এখন ভেবে অবাক হয় সে কতকাল কতদিন মীরা অভিমান করছে না। কেন?

অভিমান করতে পারতো, মীরাকে আজ দেখলে মনে হয় কি?

'পঞ্চাশ টাকা দিয়েছে পুষ্প, চাইতেই সেদিন দিয়ে দিলে।' মীরা বললো।

'তাই নাকি!' হাসতে চেষ্টা করলো হীরেন।

মীরা হারেনের হাসি দেখার অপেক্ষা করলো না। জানলা থেকে স'রে গিয়ে আলনা থেকে নীল মাদ্রাজি শাড়িটা টেনে নামালে, আর জংলি কাঁচুলি, একটা গোলাপী শায়া।

'তুমি আবার বেরুচ্ছো?'

'হুঁ।' মুখ তুললো না মীরা। আটপৌরে ঢাকাই ছেড়ে গোলাপী শায়া পরতে ব্যস্ত। কাঁচুলি ঢাকলো সোনালী ছাইরঙা ব্লাউজে। সূক্ষ্ম লালপাড়-বসানো হাতা।

'বললাম তো কাজ নেই এখন ক্যাপ্‌সুল এনে, ওই এমনি একটু পেন্ হচ্ছিলো, হবার উপক্রম করছিলো, হয়তো হয় নি।' হীরেন বললো।

'না, তোমার ওষুধ না আনলেও আমায় বেরোতে হবে। আরো ক-টা টাকার দরকার। কা'র কাছে বা চাই—' মীরা গলায় গালে পাউডার মাথে। আয়নার দিকে ফেরানো মুখ। 'কা'র কাছে গিয়ে এখুনি আবার হাত পাতি!' বিড়বিড় করলো ও গম্ভীর হ'য়ে।

হীরেন কথা বলছে না।

আয়না থেকে স'রে এসে মীরা বললো, 'শাড়ি এখন কিনবো না, আর

টাকাই-বা কোথায় শাড়ি কেনার, একটা স্যু না হ'লে চলছে না, কাপড়ের জুতো প'রে তো অফিস করা চলে না।'

'তা তো না-ই।' হীরেন মীরার পায়ের দিকে তাকায়, লাল কাপড়ের ওপর জরি-বসানো হাল্কা শৌখিন চটি, বিয়েতে যেটা উপহার পেয়েছিলো। মীরা তা-ই প'রে এখন কাজ চালাচ্ছে, বাইরে যাচ্ছে।

'স্যু না হ'লে অফিসে যাবে কি ক'রে?' উদ্বিগ্ন চোখ মীরার মুখের দিকে তুলে ধরলো হীরেন। 'পাবে কি কারো কাছে ক-টা টাকা?'

'দেখি।' মীরা হাতে ব্যাগ নিলে। 'অমরেশের কাছে চেয়ে যদি পাই।'

'কে অমরেশ,' অস্ফুটে বলতে গেল হীরেন। মীরা দরজার কাছে স'রে গেল। যেন কথাটা কানে ঢুকলো না। চৌকাঠের বাইরে গিয়ে একবার ঘুরে দাঁড়ায় ও। 'তিনটের সময় মালতী আসবে, যদি ওভালটিন খাও ওকে বোলো জল গরম ক'রে দেবে।'

'আচ্ছা।' ঘাড় নাড়লো হীরেন।

মীরা আর দাঁড়ায় না। সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ হ'তে পাশের ঘরে একটা বিশ্রীরকম গলা-খাঁকার হীরেন শুনতে পায়।

'স্কাউণ্ড্রেল।' দাঁতে দাঁত ঘ'ষে হীরেন বিড়বিড় ক'রে উঠলো। তারপর কতক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো একভাবে। আর্টিস্টের চরিত্র-সমালোচনায় বেশিক্ষণ মন দিতে পারলো না সে।

ভাবছিলো সে মীরার কথা। কে অমরেশ? কি হয় ওর? আত্মীয়? বন্ধু?

আত্মীয়ের কাছ থেকে মীরা টাকা কর্জ করবে না। পাঞ্জাবির দুই পকেটে দু-হাতের মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ ক'রে হীরেন পায়চারি শুরু করে।

তিন

কে অমরেশ তা হীরেনকে যে বলতেই হবে তার কি অর্থ আছে। মীরা ভাবলো।

কা'র কথা না বলেছে ও, বা না বলছে।

আর খুব সুখের ব্যাপারে তো কারো কাছে অগ্রসর হচ্ছে না সে, যে—

তা ছাড়া, সারা ট্র্যাম রাস্তা, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ থেকে চৌরঙ্গি, চৌরঙ্গি থেকে হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রীটের জংশন পর্যন্ত আসতে-আসতে মীরা ভাবলো, যদি আজ এমন হ'ত হীরেনের সঙ্গে বিয়ে না হ'য়ে অমরেশের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে মীরার এবং অমরেশ-মীরার সংসারখরচের টাকার জন্যে মীরা হীরেনের কাছে ছুটছে, তো মীরা কি অমরেশের প্রশ্নের উত্তরে হীরেনের সমস্ত পরিচয় দিতো, না দিতে পারতো?

হয়তো অমরেশ প্রশ্নই করতো না।

এমন হওয়া যে সম্ভবও ছিলো।

হ্যারিসন রোডের ডান-পেভমেণ্ট ধ'রে পুবদিকে অগ্রসর হবার সময়ও মীরা কথাটা চিন্তা করলো। টা-টা করছে রোদ।

পথের এ-পাশে ট্যাক্সি ও-পাশে রিক্সার সারি। মীরাকে ডাকছে, হাতছানি দিয়ে গলা-খাকার দিয়ে রিক্সাওলা ট্যাক্সিওলা।

কিন্তু মীরার লক্ষ্য হোটেল ডি ল্যুক্সের কোলাপ্সিবল্ গেট।

রুমাল দিয়ে গলা ও গাল একটু চাপড়ে নিলে মীরা গেট পার হওয়ার সময়।

আগে দরজার কাছে দারোয়ান ও কুকুর দেখতে পেতো সে, এখন তারা কেউ নেই।

যেন সমস্ত হোটেলটাই মিইয়ে আছে।

টবের পাতাবাহার শুকনো।

সিঁড়ির গালচে ফুটো হ'য়ে গেছে এখানে-ওখানে, দিনকাল খারাপ হোটেলের। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় মীরার বুকের মধ্যে দুব্‌দুব্ করছিলো। অমরেশ আছে কি এখনো এখানে?

যেন হোটেলটার মতো অমরেশও মিইয়ে আছে, প্রায় ম'রে যাচ্ছে তার সকল স্মৃতি মীরার মনে। তাই কি? চোখের কোনা ভিজে-ভিজে অনুভব করলো মীরা।

বিয়ের আগে হীরেন মীরার প্রেমে পড়েছিলো। তারও আগে পড়েছিলো অমরেশ। ঈষৎ পিঙ্গল চোখ, প্রশস্ত কাঁধ, কোঁকড়ানো চুল। হ্যাঁ, যদি প্রেমের প্রশ্নই ওঠে, ভালোবাসার স্বত্বাধিকার তো—

দোতলার বাঁ-হাতি বারান্দায় উঠে মীরা একটু-সময় দাঁড়ায়।

A. CHATTERJEE—IN

সেই পুরোনো নেম-বোর্ড। ১৯৪৩-এ যেমন ছিলো ১৯৫০-এও ঠিক তেমনি এক জায়গায় একইভাবে ঝুলছে। কেবল পরিবর্তনের মধ্যে বোর্ডের ওপরের দিকের একটা কোনায় আধুলির সাইজের একটা মাকড়সার জাল মীরার চোখে পড়লো।

সতেরো নম্বর কামরার দরজায় যেতে মীরা ভয়ংকর ঘামছিলো।

দরজায় টোকা দেবার আগে আর একবার ও রুমাল দিয়ে ভালো ক'রে গলা ও ঘাড় মুছলো।

'কে?'

'আমি।'

দরজা খুলে দিয়ে অমরেশ প্রথমটায় একটু অবাক, তারপর অল্প শব্দ ক'রে হাসলো, 'আরে!'

'ভয় পেলে ?' আস্তে বললো মীরা, মুচকি হেসে।

'না, ভয় কেন।' অমরেশ মীরার হাত ধরতে গেল, কিন্তু পারলো না, বরং সেই হাতে দরজার পর্দাটা একদিকে ঠেলে দিয়ে বললো, 'এসো এসো।'

মীরা ঘরে ঢুকলো।

'মরুর দেশে নীহারকণা।' ব'লে অমরেশ বারবার মীরার আপাদ-মস্তক দেখতে লাগলো। 'বোসো।'

'না, বসবো না।' দাঁড়িয়ে থেকে স্থির চোখে মীরা দেখতে লাগলো পিঙ্গল চোখ, কোঁকড়ানো চুল, প্রশস্ত কাঁধ। কিন্তু কেমন-একটু শুকিয়ে গেছে অমরেশ, না ? মীরা লক্ষ্য করলো।

কাঁধের সেই প্রশস্ততা নেই। পিঙ্গল চোখ নিষ্প্রভ। উস্কখুস্ক চুল। শরীরের বজ্র-আঁটুনি যেন স্খলিত হ'য়ে পড়ছে।

অমরেশের পরনে ডোরা-কাটা স্যালুয়া, গায়ে একটা রাগ জড়ানো।

'তোমার শরীর ভালো নেই ?' মীরার স্বর কাঁপছিলো, চাউনিতে উদ্বেগ।

'না, এই এমনি, একটু ইনফ্লুয়েঞ্জার মতন।' অমরেশ মলিন হাসলো। 'বোসো, তারপর খবর কি ?'

মীরা বসলো না এবং কথারও উত্তর দিলে না। অমরেশকে দেখা শেষ ক'রে ও তার ঘর দেখছে। সেই সরু সিঙ্গল্ খাট, এলোমেলো হ'য়ে আছে। বালিশ দুটো স'রে গেছে, সুজনির প্রায় অর্ধেকটা স্থানচ্যুত হ'য়ে মেঝের ওপর গড়াচ্ছে, ছাইদানি ভ'রে গিয়ে পোড়া-সিগারেটের টুকরোগুলো বিছানায়, কিছু-বা মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

ফাউণ্টেনপেন রিস্টওয়াচ থেকে আরম্ভ ক'রে আয়না, চিরুনি, টুথব্রাস, তোয়ালে, নেক্‌টাই, কাচের গ্লাস, ক্রীমের কৌটো, জুতোর ব্রাস সব গিয়ে জড়ো হয়েছে একটা টেবিলে। কাচের গ্লাসটা গড়িয়ে টেবিলের

এমন কিনারে এসে ঠেকেছে যে যে-কোনো মুহূর্তে প'ড়ে গিয়ে ওটা ভাঙতে পারে।

মীরা ছোট্ট নিশ্বাস ফেললো।

'হাসছো যে?' মীরা প্রশ্ন করলো অমরেশের মুখের দিকে চোখ পড়তে। অমরেশ তখনও মীরাকে আপাদমস্তক দেখছিলো, দেখছে আর অল্প-অল্প হাসছে।

'আশ্চর্য সুন্দর হয়েছো দেখতে বিয়ের পরে,' অমরেশ বললো, 'বোসো।'

'না, বসবার সময় কোথায়।' মীরা ফের টেবিলের দিকে চোখ ফেরালো। 'ক-টা টাকা কর্জ দাও।'

'তার অর্থ? হঠাৎ?' অমরেশ গম্ভীর।

মীরা অমরেশের চোখে চোখ রাখলো।

'মিস্টার চক্রবর্তীর খুব অসুখ, আরো দুটো ইনজেক্‌শন কিনতে হবে আজ।'

'কি অসুখ?' অমরেশ আস্তে-আস্তে বললো, 'জানি না তো।'

'পেটে অপারেশন হয়েছিলো। এখনো ভয়ংকর দুর্বল। মাঝে-মাঝে বুঝি স্লাইট পেনও হয়।'

'কি মুশকিল।' অমরেশ পর-পর দুটো ঢোক গিললো, 'আমি তো, আমি যে, অবশ্য—গত দু-মাস ছিলামও না কলকাতায়।'

'কি মুশকিল।' মীরা বললো, 'থাকলেই-বা তুমি জানতে কি ক'রে, আমার ঠিকানাও যে তুমি জানো না।'

অমরেশ কথা কইলো না।

মীরা খাটের ওপর বসলো। ডান-হাতের ব্যাগটা ধ'রে বাঁ-হাতে দুই আঙুলে ও কপালের দুটো রগ টিপে ধরে।

'ঘোরাঘুরি ক'রে তুমি নিশ্চয়ই খুব টায়ার্ড ?' অমরেশ মীরার কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়, 'মাথা ধরেছে ?'

'না।' হাত সরিয়ে মীরা মৃদু হাসলো। যেন ঘুম থেকে উঠেছে, ঘুম থেকে উঠে অমরেশের মুখের দিকে চেয়ে স্বপ্নিল হাসছে।

'তুমি হাসছো, কিন্তু—' বিষণ্ণ মুখে অমরেশ বিড়বিড় করে।

'কি ?' মীরা অমরেশের হাত ধরে। 'কি ভাবছো ?

'তুমি লুকোচ্ছো, কিন্তু বুঝতে পারছি বেশ কষ্টে পড়েছো।'

'তা কি করা, কি করতে পারো তুমি যদি আমাব অদৃষ্টে কষ্ট লেখা থাকে।' মীরার হাসি এবার মৃদু শব্দ ক'রে উঠলো, পাহাড়ী ঝরনার ঝিরঝিরানির মতো।

হাত ছাড়িয়ে নেয় অমরেশ। পায়চারি করে একটুক্ষণ। 'সত্যি আমি কি করতে পারি—' অভিমানে গম্‌গম্‌ করছিলো পুরুষের গলা। 'আমি কে—'

মীরা চুপ।

কোন্‌-একটা কামরা থেকে অদৃশ্য ঘড়ির টিকটিক ভেসে আসছিলো।

অমরেশ হঠাৎ ফিরে দাঁড়ায়।

'ক-টাকা তোমার দরকার, কি পরিমাণ টাকা হ'লে এখন চলে ?'

'এই, গোটা পঞ্চাশ ?' মীরা আস্তে বললো।

অমরেশ নিঃশব্দে টেবিলের কাছে স'রে যায়। তোয়ালে আরসি ঘড়ি পেন-এর আবর্জনা সরিয়ে একটা এটাচি টেনে বা'র ক'রে এক-শ' টাকার একটা কারেন্সি নোট তুলে পরে মীরার কাছে ফিরে আসে। নোটটা মীরার কোলের ওপর রাখলো সে। মীরা অপাঙ্গে টাকাটা দেখলো, কথা বললো না, একটু পরে ভাঁজ ক'রে ওটা ব্যাগে পুরলো। অমরেশ সিগারেট ধরায়।

'বাইরে কোথায় গিয়েছিলে ?' মীরার প্রশ্ন।

'শিলং।' অমরেশ মীরার বুকের ওপর চোখ রাখে। চাকা-চাকা ধোঁয়া উদ্গীরণ করে, ধোঁয়ায় মীরার চোখ ছল্‌ছল্‌ করতে থাকে।

'তোমার ঠিকানা জানি না, কিন্তু আমার ঠিকানা তো তুমি জানতে!' অমরেশের প্রশ্ন।

মীরা মুখ নুইয়ে আছে।

'না কি হ্যারিসন রোডের দিকে বিয়ের পর মুখ ফেরাও নি?'

'অনেকটা সেই রকমই।' মীরা মুখ তুললো।

'হারেম ছেড়ে বুঝি চক্রবর্তী বাইরে আসতে দেয় না?'

'দিচ্ছিলো না।' মীরা গলা পরিষ্কার করলো। 'কিন্তু ঈশ্বর তার সেই সাধ পূরণ করে নি।'

কথা না ব'লে অমরেশ ওপরের দিকে তাকায়। 'হ্যাঁ, একটা-কিছু তোমায় এখন করতেই হচ্ছে। চাকরি বা মাস্টারি।'

'মাস্টারিতে পয়সা কোথায়।' মীরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো। 'আমার এক ননদ করছে, দেখি তো।'

'অবশ্য আমার কতগুলো সোর্স আছে, যদিও সব বিলিতি আমেরিকান কনসার্ন, চেষ্টা করলে—'

মীরার চোখ উৎসাহে ঝক্‌ঝক্‌ করে।

'দাও না ঢুকিয়ে কোথাও, বেশ ভালো মাইনে-টাইনে দেয় এমন কোনো—'

'দেখি চিন্তা ক'রে।' অমরেশ ঘাড় ফেরায়।

মীরা উঠে দাঁড়ালো। 'চললুম আজ।'

'আবার কবে আসছো?' অমরেশ মীরার হাত ধরলো।

মীরা দু-বার তাকায় চৌকাঠের দিকে। 'কি অসম্ভব নির্জন লাগছে এত বড়ো হোটেলটা।' আস্তে বলে সে।

'দুপুরে কেউ থাকে না বড়ো।' অমরেশ গলা পরিষ্কার করে। 'আসছো তা হ'লে আর একদিন ?'

গ্রীবা কাত করলো মীরা। 'আসতে হবে, ভালো একটা কাজটাজ না হ'লে আমার চলছে না, অমর।' মাথা নত ক'রে মীরা জুতোর মধ্যে পা ঢোকায়।

যেন কবে আলতা পরেছিলো ও। যা কোনোদিনই অমরেশ দেখে নি। বুঝি বিয়ের পর থেকে পরছে মীরা, হয়তো চক্রবর্তীর পছন্দ, কিন্তু বাইরে ছুটোছুটি ক'রে আলতা ফিকে হ'য়ে গেছে, মুছে যাচ্ছে।

'চলি।' মীরা আর দাঁড়ালো না।

অমরেশ কথা বললো না।

মীরা স'রে যাচ্ছিলো সিঁড়ির দিকে। ওর শরীরটা নড়ছিলো। দরজায় দাঁড়িয়ে অমরেশ স্তব্ধ।

হ্যারিসন রোডে নেমে লজ্জা দুঃখ রাশি-রাশি ব্যর্থতা মীরাকে জড়িয়ে ধরলো।

না, অমরেশের কাছে টাকা চাওয়ার জন্যে নয়, একদিন এই অমরেশকে না-চাওয়ার জন্যে।

পিঙ্গল চোখ, কোঁকড়ানো চুল, প্রশস্ত কাঁধ, হাসি, কথা—সব, সব ভালো ছিলো অমরেশের, ওর নানা ফ্যাসনের স্থন্দর সব দামী জামা গায়ে দিয়ে কলেজে আসা।

মীরা চেয়ে থাকতো, মীরা প্রায় ঝাঁপ দিয়েছিলো। কিন্তু আইডিয়ার পূজারিনী তখন ও। অ্যাথ্‌লেটের চেয়ে স্কলার ওকে বেশি টেনেছিলো,

কলেজ-ম্যাগাজিনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেওয়া হীরেন চক্রবর্তীর ঝকঝকে সব প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ, রোঁলা, বার্নার্ড শ।

ফাস্ট´-ইয়ারে পড়ুয়া মীরা জর্জেট ছেড়ে শান্তিনিকেতনী ধরলো। বেণীর রিবন খুলে চুলে ফুল গুঁজলো। পাউডারের পরিবর্তে মুখে মাখলো সিন্থেটিক লোধ্ররেণু।

হোক রংপুরের জমিদারের ছেলে। অমরেশ চ্যাটার্জি বার-এ ঢুকে ড্রিঙ্ক করছে, রেস খেলছে। ওর কাজ কলেজের ক্রিকেট টিমের পাণ্ডাগিরি করা, সোশ্যাল ফাংশনে ফিমেল-স্টুডেন্টদের চেয়ার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানা। চারদিক থেকে ছি-ছি।

তাই মীরা ঘাড় ঘুরিয়েছিলো চোখ ফিরিয়েছিলো ডায়াসের ওপর উপবিষ্ট সেদিন বর্ষামঙ্গল-সন্ধ্যার সুন্দর অতিথি শান্ত ভদ্র মার্জিত হীরেন চক্রবর্তীর দিকে।

আর, কলেজের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে মীরা কলেজের সবচেয়ে পণ্ডিত গুণী চক্রবর্তীর চিত্তজয় করেছে, খবরটা যেন ঢেউ দিয়ে গিয়েছিলো সমস্ত সুধী-সমাজে।

মীরার মনে পড়লো। না, এখন ঠিক মনে নেই বিয়ের সন্ধ্যায় কোন্ কোন্ অধ্যাপক আশীর্বাদ করতে এসেছিলেন।

মীরার কেবল মনে আছে কলেজের সব ছেলেমেয়ের মধ্যে অমরেশকে ও দেখে নি।

আশ্চর্য, মীরা এখন ভাবে, বিয়ের আসরে তাকে না দেখেও কি ক'রে সে মন খারাপ না ক'রে থাকতে পেরেছিলো।

মানুষের মন কত অদ্ভুত। ভাবে মীরা। ক্রসিং পার হ'য়ে ও জুতোর দোকানে ঢুকলো। জীবনে এই প্রথম সবচেয়ে বেশি দামের জুতো কিনতে পারলো সে অমরেশের টাকায়।

জুতোর দোকান থেকে বেরিয়ে মীরা ঢুকলো শাড়ির দোকানে।

জুতোর সঙ্গে পরা চলে এমন কাপড় দাও। শো-কেসের একটা জমকালো শাড়ি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে ও।

মীরার বুকের ভিতর দুবদুব শব্দ হচ্ছিলো। রক্তে কলোচ্ছ্বাস। ঘড়িতে আড়াইটা। এক গোছা নোট তুললো ও ব্যাগ থেকে। নিশ্চয়ই, হাত ভ'রে অমরেশ টাকা দিয়েছে, হাত উজাড় ক'রে মীরা জিনিস কিনছে নিজের জন্যে, কিনবে।

নিজের জন্যে মীরা কীই-বা কিনেছে এই ক-মাসে। ক্যাশমেমো ভাঁজ করতে-করতে মনে-মনে গম্ভীর হ'য়ে গেল ও।

হ্যাঁ, পারেই তো। মীরার চাকরি হয়েছে। পুষ্প আদর ক'রে বান্ধবীকে এই শাড়ি দিয়েছে। 'তোর বেরোবার ভালো কাপড় নেই।'

হীরেনকে কথাটা বলতে মীরার একটুও আটকাবে না।

ধরতে গেলে একরকম বিয়ের পর থেকেই তো মীরা কর্জ ক'রে সংসার চালাচ্ছে, তার ওপর রুগীর পথ্য, ওষুধের খরচ।

আজকের টাকাটা যদি ও ওখানে না ঢালে, আলাদাভাবে খরচ করে তো দোষের হবে কি! অমরেশ যেমন তার জীবনে সংগোপনে রয়েছে, তেমনি এই টাকাটাও গোপন থাক। ইচ্ছে হ'লে মীরা শোধ করবে, ইচ্ছে না হ'লে করবে না। ওটা ওর নিজস্ব। কিন্তু তবু মীরা এর একটা অংশ সংসারের জন্যে, হীরেনের জন্যে, খরচ করলো। না-ক'রে পারলে না।

পাশের স্টেশনারি দোকানে ঢুকে এক-টিন কোয়েকার ওটস্, মাখনের কৌটো, একটা জেলি, একটা ভালো রেজর কিনলো মীরা। হীরেনের ভালো সেফ্‌টি রেজর কোনো কালেই নেই। বিদ্বানরা চিরকালই নিজের সজ্জা শোভা বিলাস প্রসাধন সম্পর্কে উদাসীন। হীরেনও তাই।

কিন্তু তাঁদের মতো যদি সে উদার হ'ত।

বিয়ের পরে, বিয়ের পর থেকেও বেশি অসুখের পরে, মীরা বেশ লক্ষ্য করছে, ঈর্ষান্বিত হীরেন। শুধু কি ঈর্ষা, ঈর্ষায় লোকের চোখের তারা আচমকা এতো ধারালো হ'য়ে ওঠে না, একদিকে সূক্ষ্ম প্রশ্ন অন্যদিকে সমবেদনার উচ্ছ্বাস,—বস্তুত হীরেন যে সময়-সময় কি করে, কি রকম হ'য়ে ওঠে তার গলার স্বর, চাউনি, মুখের হাবভাব তা সে নিজে বুঝতে পারছে না। মীরা বোঝে। স্ত্রীকে সন্দেহ করার আগ-মুহূর্তে পুরুষ এই হয়। এই হ'লো হীরেন শেষ পর্যন্ত।

শাড়ির প্যাকেটটা বাম বগলের নিচে চেপে ধ'রে মীরা ট্র্যামের অপেক্ষায় দাঁড়ালো। জুতো, মাখন, জেলি, ওট্‌সের কৌটো পুরেছে ও একটা থলের ভিতর। ডান-হাত টন্‌টন্‌ করছে ব্যাগ ও থলের ভারে। দরদর ক'রে ঘাম ঝরছে গাল-গলা বেয়ে, বডিসটা প্যাচ্‌পেচে হ'য়ে উঠেছে। খোঁপার নিচটা লাগছে কেমন আঠা-আঠা।

ট্র্যামের দেরি দেখে বাসে উঠতো মীরা, প্রায় পা বাড়িয়েছে, স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল।

পুষ্পর বিশালকায় বুইক মীরার শরীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। টাট্‌কা ফুলের গন্ধে জায়গাটা ভ'রে ওঠে।

'খুব যে মার্কেটিং করছিস!' পুষ্প হাসছে। লম্বা গলা বাড়িয়ে দিয়েছে গাড়ির জানলার বাইরে। রোদে কানের হীরা জ্বলছে।

'কদ্দূর?' মৃদু হেসে মীরা প্রশ্ন করলো।

'আপাতত ফিরপো, সেখান থেকে—' পুষ্প হঠাৎ মীরার দিক থেকে ঘাড় ফিরিয়ে গাড়ির ভিতরে তাকালো। 'বলো?'

সুদর্শন তরুণ অল্প-অল্প হাসছে, লজ্জিত, আরক্ত। 'আমি কি ক'রে বলবো, তুমি বলো।' পুষ্পর কোলের ওপর হাত রাখে সে। পুষ্প ঘাড় ঘোরালো মীরার দিকে।

'সেখান থেকে প্রিন্সেপ ঘাটে একটু ব'সে সোজা বোটানিক্যাল গার্ডেনে। এ-বেলার মতো এই প্রোগ্রাম।' ম্যানিকিওর-করা ডালিম-দানার মতো ঝকঝকে নোখে পুষ্প থুঁত্নি চুলকালো। 'তোর খবর কি?'

'কি আর খবর!' গম্ভীর হ'য়ে মীরা গাড়ির ভিতরে চোখ রাখলো।

'অনুপ,—সুশীলের সঙ্গে পড়ে।' পুষ্প পরিচয় করিয়ে দেয়। 'ইনি মীরা চক্রবর্তী, আমার বন্ধু, একসঙ্গে বেথুনে পড়েছি।'

মীরা হাত তুললো না, পুরুষ অনুপকুমার দুই হাত একত্র ক'রে মীরাকে নমস্কার জানায়। ভোমরার চিকন পাখার মতো নতুন গোঁফের রেখা, পরিচ্ছন্ন আবেশচঞ্চল চোখ। সুশীলের সঙ্গে পড়ে মানে এ-বছর স্কটিশ থেকে আই. এ. পাস করলো।

'বেশ আছো।' মীরা পুষ্পর চোখে চোখ রেখে অল্প-অল্প হাসে।

'তুই-ই বা মন্দ আছিস কি।' পুষ্প একটা সিগারেট ধরায়। 'নয় কি?'

'কি রকম?' মীরা ভুরু কোঁচকালো।

'এই— অধ্যাপকের সঙ্গে প্রেম করলি, অধ্যাপককে বিয়ে করলি। গিন্নীবান্নী হ'য়ে এখন বাজারটাজার নিয়ে ঘরে চললি।'

'ও।' মীরা ঠিক হাসলো না।

'তারপর? মিস্টার চক্রবর্তী আছেন কেমন?' পুষ্প সামাজিক হ'তে চেষ্টা করলো।

'এই একরকম।'

'এখন বেরুতে পারেন তো?'

'না, শরীর ঠিক শক্ত হচ্ছে না।'

পুষ্প চুপ ক'রে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লো। ডালিমদানার মতো লাল ঝকঝকে নোখের ফাঁকে ধরা দামী সিগারেট।

বাস এসে গেছে।

মীরা বললো, 'চলি।'

পুষ্প হাত বাড়িয়ে বাধা দেয়।

'কই, আর তো তুই আমাদের বাড়িতে গেলি না?'

'যাবো সময় পাচ্ছি কই।' মীরা অর্ধেক ঘুরে দাঁড়ালো। টাকা কর্জ করার পর পুষ্পর সঙ্গে আর একদিনও সে দেখা করে নি। মনে হ'তে মীরা বেশ লজ্জা পেলো।

'মিস্টার চক্রবর্তী বেশি বাইরে-টাইরে যাওয়া পছন্দ করেন না বুঝি?' পুষ্প ফুলের পাপড়ির মতো লাল ঠোঁট ছড়িয়ে হাসলো।

'করতেন না, কিন্তু বাইরে এখন যাচ্ছে কে, কে আছে আর—'

'সে তো ঠিকই।' পুষ্প মৃদু ঘাড় নাড়লো।

'কিন্তু অকৃতজ্ঞ।' মীরা অকুণ্ঠে সখীকে জানায়।

পুষ্প চুপ ক'রে সিগারেটের ধোঁয়া ছড়ায়। অনুপ নতমুখ হ'য়ে ব'সে। শুনছে।

অপাঙ্গে একবার ওকে দেখে পুষ্প বললো, 'ভয়ংকর স্বার্থপর জীব ওরা, পুরুষরা।'

'বাড়িতে না থাকলেই দুর্ভাবনায় মরে।' মীরা গাঢ় নিশ্বাস ফেললো।

'তাই!' পুষ্প বললো, 'যাক্‌গে, তুই পেসেন্স হারাবিনে, অসুখে ভুগে হয়তো ব্রেন একটু ইরিটেটেড।'

'না না, পুষ্প, ওই স্বভাব। বিয়ের আগে পুরুষের সব চেনা যায়, ওটা—'

'কিন্তু তা হ'লে তো চলবে না, বাইরে তোকে আসতেই হবে। একটা কাজটাজ না করলে সংসার চলবেই বা কি ক'রে।'

মীরা বললো, 'তাই বলছিলাম বেশ আছিস, এতো তাড়াতাড়ি যদি বিয়েটা না করতুম।'

'তা এখন করবি কি।' পুষ্প, কুমারী পুষ্প পুরুষালি ভঙ্গিতে থুঁতনি

তুললো, আবার একরাশ ধোঁয়া বা'র করলো মুখ ও ওর অদ্ভুত নিটোল নাসারন্ধ্র থেকে। 'আমি জানতাম, আমি জানি ব'লেই ও-কাজ করি নি, করছিনে।' অপাঙ্গে সে আবার গাড়ির ভিতরের পুরুষকে দেখলো।

মীরা একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেললো।

'চলি।' বললো ও আগতপ্রায় তৃতীয় বাসের দিকে চেয়ে।

'সুশীল গেছে বয়স্কাউটদলের সঙ্গে পুরীতে পিক্‌নিক্‌ করতে। অনুপ পড়েছে একলা। বলছিলো কাল, দিদি ড্রাইভিং শিখি নি, সুশীল ফিরে আসার আগে আমায় ওটা শিখিয়ে দাও। স্কাউট না হ'য়েও যে আমি অমানুষ হই নি এটা প্রমাণ করবো।' ব'লে পুষ্প ঠোঁট টিপে হাসলো।

'বেশ তো, ভালো ক'রে শিখিয়ে দাও।' মীরাও ঠোঁট টিপলো। আড়চোখে আর-একবার ও তরুণ শিক্ষার্থীর চিকন গোঁফের রেখা, পাউডারের ছোপ লাগা সুবলিত ঘাড়, কানের নিচ পর্যন্ত টানা তেরছা নিখুঁত জুল্‌পি, পাঞ্জাবির তলা থেকে উঁকি দেওয়া নেট্‌-এর গেঞ্জির ফুট্‌কি, বাঁ-কব্জির ঘড়ি, পকেটের সিল্কের রুমালটা দেখে শেষ করলো।

'বাই বাই।' পুষ্পর এক হাত স্টীয়ারিং হুইলে, অন্য হাত নেড়ে ও মীরাকে বিদায় জানায়।

'বাই বাই।' মীরা হাত তুললো।

পুষ্পর গাড়ি ভিড়ের মধ্যে মিশে যায়।

মীরা দাঁড়িয়ে থেকে তৃতীয় বাসটাও চোখের সামনে চ'লে যেতে দেখলো। তখনই বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হ'লো না ওর। যেন ঘুরতে ইচ্ছে হচ্ছিলো এমনি, অকারণ।

কোথায় যাই, কোথায় যাবো ভাবতে-ভাবতে অজান্তে কখন ও এসপ্ল্যানেড-মুখো ট্র্যামে উঠে পড়লো।

চার

মেটে-রং জামার ওপর নীল টাই ঝুলিয়ে এসেছে বিপদবরণ।

যেন এইমাত্র সে সেলুন থেকে ফিরছে। সাবানের শুকনো ফেনা কানের নিচে ঠোঁটের ডগায়। হীরেন লক্ষ্য করলো।

'বোসো।' আঙুল দিয়ে উকিল-বন্ধুকে সে একটা বেতের মোড়া দেখিয়ে দেয়, স্থইচ জেলে দেয়। অন্ধকার হ'য়ে গেছে ঘর।

কিন্তু বিপদের কানে কথা ঢুকছে না।

'নাইস্ নাইস্!' টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সে চেঁচাচ্ছে, কখনো ছুটে যাচ্ছে টিপয়ের কাছে।

'ওটা কি, ক্রীমারি বাটার! খাঁটি অস্ট্রেলিয়ান্ চীজ্। সারা কলকাতা শহর ঘুরে সেদিন আমি একটা যোগাড় করতে পারি নি, ব্রাদার।'

'মীরা এনেছে।'

'সে তো বুঝতেই পারছি। ওয়াণ্ডারফুল তোমার মিসেস।' বিপদ চড়া-গলায় বললো। 'এই পর্দার কাপড় কত ক'রে আনলো?' বিপদের চোখ চ'লে গেছে জানলায়।

'দেড় টাকা, কি পৌনে দু-টাকা গজ।' হীরেন আমতা-আমতা ক'রে বললো, 'আমি সঠিক জানি না।'

'বিউটিফুল।' বিপদ আর-একবার পর্দার গায়ে আঙুল বুলোয়। যেন পর্দাটাকে আদর করলো আঙুল বুলিয়ে। 'তারপর, মিসেস গেছেন কোথায়?'

'এই এলো ব'লে।' হীরেন মোড়ার দিকে আঙুল দেখায়। 'তুমি বোসো।'

'বসবো, বসবো।' কেবলই ঘুরে-ঘুরে বন্ধুর গৃহ ও গৃহসজ্জা দেখছিলো

বিপদ। 'এখানে চাঁপা ওখানে রজনীগন্ধা।' টেবিল ও টিপয়ের ওপর চোখ বুলিয়ে উকিল হীরেনের কাছে ফিরে এলো। 'তোমার মহিষীর রুচি আছে।'

'তারপর, তোমার খবর কি ?'

'ক্রাইসিস্! টের পাচ্ছো তো ?' ভয়ংকর ময়লা একটা রুমাল বা'র ক'রে বিপদবরণ তার মোটা ঘাড় মুছলো।

'তারপর, তোমার খবর কি ?'

'এই তো, প্রায় মরণের দরজা থেকে ফিরে এলাম।' হীরেন মন্দ গলায় হাসলো।

'হ্যাঁ, শুনছিলাম কা'র মুখে। কিন্তু জানো তো ব্রাদার, লক্ষ ভাবনা মাথায়। আর এদিকে লক্ষ দিন ভাবছি চক্রবর্তীকে একদিন দেখতে যাই। অথচ কার্যত—'

হীরেন চুপ।

'যাক্‌গে, সেরে যে উঠেছো। এত বড়ো অপারেশন।' বিপদ চোখ ফেরালো চশমা-পরা মীরার ফটোর দিকে। ঘাড় মোছা শেষ ক'রে রুমালটা পকেটে ঢোকালো।

'তোমার প্র্যাক্‌টিস চলছে কেমন ?' হীরেন প্রশ্ন করলো।

'অষ্টরম্ভা।' বিপদ চোখ না ফিরিয়ে বললো, 'দু-বেলা দুটো ট্যুইশানি করছি প্র্যাক্‌টিসের ওপর, তবু কুলোতে পারছি না। কোর্টে দুপুরের টিফিন সারি এখন চিনাবাদাম চিবিয়ে, উড়ের চা-এ, ভাতের নিত্যসঙ্গী দাঁড়িয়েছে বিউলি-ডাল আর পুঁইডাঁটা।'

হীরেন চুপ।

'ভালো।' বিপদ হঠাৎ অধ্যাপকের দিকে মুখ ফেরায়, যেন কি-একটা কথা মনে পড়েছে তার। 'তুমি—তোমাদের আজকাল–

বিপদ থেমে গেল।

'বলো, থামলে কেন।' হীরেন উকিলের চোখ দেখে। 'মীরার দাদা কিছু-কিছু হেল্‌প করছে।'

'তাই।' উকিল রুমালটা আবার পকেট থেকে টেনে বা'র করে। 'আমিও ভাবছিলাম।' ব'লে সে ঘাড়ে রুমাল বুলোতে-বুলোতে আবার বন্ধুর গৃহ ও গৃহসজ্জা দেখতে থাকে।

একসঙ্গে পড়েছে দু-জন, এক স্কুলে, এক কলেজে।

(হীরেনের মাথা বেশি, হয়েছে অধ্যাপক। বিপদের গলা বড়ো, হয়েছে উকিল।)

'স্টার্টিং-এই ক্রাইসিস্ শুরু হ'লো তো আমরা করবো কি।' বিপদ এক-সময়ে নিচু গলায় বললো।

হীরেন থুঁত্‌নি নাড়লো।

'তা তোমার স্ত্রীর যখন ডিগ্রী আছে, একটা দুটো মেয়ের ট্যুইশানি করতে পারেন।'

হীরেন কিছু বললো না।

'কি চাকরিতেও দিতে পারো।' যেন বন্ধুর স্ত্রী সম্পর্কে বন্ধু সসংকোচে প্রস্তাবটি তুললো, 'কি করা, আজকাল অনেকেই এটাও করছে। একলার আয়ে কারুর দশ দিনের বেশি চলছে না। মিড্‌ল ক্লাসটা একেবারে ম'রে যাচ্ছে।'

'দেখি।' হীরেন এমন স্বরে কথাটা বললো, যেন মীরা সম্পর্কে এখনও কিছু স্থির হয় নি। ব'লে সে উল্টোদিকের দেয়ালে চোখ রাখে।

'যদিও ম্যাট্রিক পাস, তবু আমি ঢুকিয়ে দিতাম আমার বৌকে কোনো অফিস-টফিসে। কিন্তু, সদিচ্ছা আমাদের পূরণ হয় কই।' ব'লে বিপদবরণ লম্বা একটা নিশ্বাস ফেললো।

হীরেন উকিলের মুখের দিকে তাকায়।

'তিন বছর বিয়ে হয়েছে, অল্‌রেডি দুটো এসে গেছে, আরও একটি আসছে।' বিপদ হাতের তিনটি আঙুল তুলে ধরলো। 'চাকরি করবেন উনি কখন!'

হীরেন মৃদু হাসলো।

'না ব্রাদার। ইচ্ছে ছিলো একটু ভালো স্ট্যাণ্ডার্ডে থাকবো, একটু স্টাইলে চলবো, তা—' বিপদবরণ আক্ষেপের নিশ্বাস ফেললো।

'ভালো কথা, যতির খবর কি?' যেন প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যে হীরেন যতিশঙ্করের কথা তুললো। তাদেরই আর-একটি বন্ধু। কিন্তু কপালগুণে উকিল ও অধ্যাপকের চেয়ে অনেক বেশি উঠে গেছে: মুখ বা মাথা নয়, তার ছিলো বেশি সাহস। প্রথমে ঢোকে এমনি সৈন্য হ'য়ে যুদ্ধে। এখন আছে কমিশন্‌ড র‍্যাঙ্কে। পাইলট।

'ও, তুমি বুঝি শোনো নি।' বিপদের চেহারাটা এবার একটু প্রফুল্ল দেখায়। 'ভয়ানক ট্র্যাজেডি ঘটেছে ওর জীবনে, ওদের, শুনলাম।'

'কি রকম?' হীরেনের চেহারা কালো।

'বৌটা বেজায় সুন্দরী ছিলো, জানতে তো?'

হীরেন থুঁত্‌নি নাড়লো। 'খুব বেশিদিন তো বিয়ে হয় নি?' বললো সে।

'ওই, ওই ছ-মাস ন-মাসেই ওদের যথেষ্ট। তবে হ্যাঁ—' বিপদ গলার স্বর মিহি করলো, 'ওরা বাবা হায়ার-সার্কেলের মানুষ—আমাদের গরিবদের আলোচনা করা সাজে না যদিও, কিন্তু—' বিপদ তৎক্ষণাৎ চোখ বড়ো করলো, 'যা ফ্যাক্ট্‌ তা বলতে দোষ কি। আর, আর সত্যি, যতির জন্যে দুঃখু হয়, আমাদেরই ও একজন ছিলো তো।'

'কি ব্যাপার?' হীরেন অস্পষ্ট গলায় প্রশ্ন করলো।

'পালিয়েছেন শ্রীমতী।' বিপদ খসখসে গলায় বললো, 'অবশ্য প্রথমটায় যতিও বুঝতে পারে নি। চিরকালই ওর মনটা শাদা, জানো তো।'

হীরেন মাথা নাড়লো।

'অমুক অফিসারের বাড়িতে পাঠিয়েছে বৌকে ডিনার খেতে, তমুক অফিসারের লন্-এ পাঠিয়েছে টেনিস খেলতে।' বিপদ গুজগুজ ক'রে হাসলো। 'অবশ্য না পাঠিয়েও উপায় ছিলো না, ওদের যা ল্যাজকাটা সোসাইটি নব-দিল্লির!'

'তারপর?'

'আর তারপর কি।' বিপদ হাসি বন্ধ ক'রে হীরেনের চোখে চোখ রাখলো। 'যতির ভালোমানুষির অ্যাড্‌ভান্টেজ নিলে মেয়েটা। ল্যাজ কাটালো।'

হীরেন নীরব।

বিপদ রুমালটাকে ভাঁজ ক'রে ক'রে একটা অম্‌লেটের সাইজে এনে দাঁড় করালে। একটুক্ষণের স্তব্ধতা। বুঝি ঝি এসে গেছে। রান্নাঘরের টুকটাক আওয়াজ শুনে হীরেন অনুমান করে।

'আমাদের অশান্তি টাকাপয়সা না-থাকার, রোগশোকের, আর ওদের অশান্তি—'

বিপদ কথাটা শেষ করার আগে হীরেন বললো, 'আমার মনে হয়, আমি ভাবছিলাম, যতি যদি একটু শক্ত হাতে—'

হীরেনকে শেষ করতে না দিয়ে বিপদ প্রবল বেগে মাথা নাড়লো, চোখ টিপলো।

'কিস্‌সু না ব্রাদার; বলছো, যদি শক্ত হাতে রাশ টেনে ধরতো— উঁহুঁ, বেরোবার যে. সে বেরোবেই। ওই এক-একটা টাইপ থাকে। সে-সব মেয়ে যে কি আমি তুমি আইডিয়া করতে পারি না।'

হীরেন কথা বললো না।

'আমি ঠিক গুলি ক'রে মেরে ফেলতাম।'—ব'লে উকিল ঘোঁৎ ক'রে নাকের শব্দ করলো। 'তারপর, তোমার মিসেস যে এখনো—'

'আসবে, এক্ষুনি এসে যাবে।' হীরেনের গলায় অস্বস্তি ছিলো, অবশ্য তা ধরতে পারার মতো সূক্ষ্ম বোধশক্তি উকিলবন্ধুর নেই বুঝে হীরেন অল্প হাসলো। 'তোমার এত তাড়া কিসের, কোথায় যাচ্ছো?'

'বা—রে, সাতটা বাজে, ট্যুইশানি আছে না? আচ্ছা, বেশ—' ব'লে উকিল গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

'একটু চা-টা—' আমতা-আমতা করে হীরেন।

'আরেক দিন। মিসেস ঘরে নেই তো ঝিয়ের হাতে চা খাওয়াবে নাকি?' বিপদ চৌকাঠের দিকে এগিয়ে গেল। 'আরেক দিন।'

এবং চৌকাঠ পার হওয়ার আগে সে আর-একবার ঘাড় ঘুরিয়ে বন্ধুর ঘর দেখলো, ঘরের ভিতরের সজ্জা, টেবিল, টিপয়, দেয়াল, দেয়ালে-টাঙানো মীরার ফটো, ফটোর নিচে ঝুলোনো একটা বিলিতি কোম্পানির ক্যালেণ্ডার।

'নাইস নাইস!'

ঠিক কোন্ জিনিসটিকে লক্ষ্য ক'রে উকিল শেষবার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলো হীরেন টের পেল না।

'চললে?'

'হুঁ।' জুতোর ফিতে বাঁধা শেষ ক'রে বিপদবরণ সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়। 'সাময়িক অসুখ যদিও তোমার, আমার চেয়ে তুমি ঢের ভালো আছো হে, ভালো থাকবে।'

'কি রকম?' হীরেন ঢোক গিললো।

বিপদ সিঁড়ির কাছে চ'লে যায়। 'ওই তো বললাম, আমার ওটা

শুধু খাওয়া ঘুম আর ইয়ে দেবার জন্যে সংসারে এসেছে। তোমার উনি, মিসেস চক্রবর্তী অনেক বেশি স্মার্ট, বুঝেসুজে চলেন।' বলতে-বলতে উকিল সিঁড়ির নিচে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

বিপদবরণের ভাবধারায় হীরেন দু-বার চিন্তা করলো। এ-ঘরে একটি শিশু থাকলে কেমন হ'ত। মীরার ছেলে, ছেলে বা মেয়ে। হীরেনের চোখের সামনে নতুন ছবি ঝুলছিলো।

একটা দোল্‌না ঝুলিয়েছে মীরা ওই কোনায়। টিপয়টা রজনীগন্ধা-হীন হ'য়ে একটা ফীডিং-বট্‌ল্‌ ধ'রে আছে। বেবি-পাউডার আর তোয়ালে রাখা হয়েছে বোতলের পাশে। কাজলের কৌটো। হীরেন মাথা নাড়লো। নিশ্চয়ই শিশুকে কোলে নিয়ে মীরা পরিচর্যা করতো না, করবে না। ওই হ'ত। হীরেন ভাবলো, আর পরক্ষণেই আবার তার মনে হ'লো, মীরার পেটে কোনো শিশুই হয়তো আসবে না। হয়তো কেন, নিশ্চিত। এ-ঘরে দোল্‌নার জায়গা কই। এঞ্জেল মীরা চক্রবর্তীর ঘর এটা।

হীরেন চশমাহীন মীরার ফটোর দিকে তাকিয়ে একটা স্তিমিত নিশ্বাস ফেললো।

টেবিল থেকে গ্লাস তুলে একটু জল খেলো। তারপর ফিরে গেল কুমারী মীরার কাছে।

যদি ঘরে শিশু থাকতো তো এই মীরা কক্ষনো এতক্ষণ বাইরে থাকতো না। ছুটে আসতো।

হীরেনের অসুখের দরুন কোনো কাজে বাইরে গেলেও ও বেশিক্ষণ বাইরে থাকতো না।

কিন্তু সে এ নয়। অন্য টাইপ।

সারা সকাল বাইরে ঘুরে এসে ওই যে স্নানের সময়, খেতে ব'সে একটু-সময়ের জন্যে মীরা ঘরোয়া সাজ ধরেছিলো, তাও এখন, একটানা দু-ঘণ্টা এই ঘরে একলা থাকার পর হীরেন প্রায় ভুলতে বসেছে। নিশ্চয়ই, এ-ঘরে অসুস্থ স্বামী আছে, তার দুধ, দম-দেওয়া ঘড়ি, গরম ব্যাগ, থার্মোমিটার, রুগীর মনকে প্রফুল্ল রাখতে দু-রকমের ফুল। চাঁপা আর রজনীগন্ধা। হীরেন পায়চারি করলো, আরো-কিছু সময় পায়চারি করলো। ঘড়ি দেখলো। সাতটা বেজে বত্রিশ মিনিট।

'মালতী কি করছো?'

'এই-যে দাদাবাবু।'

লম্বা গড়ন। কালো-রং। কালোপাড় ফর্সা একখানা কাপড় পরনে। টান ক'রে বাঁধা খোঁপায় মালতী শুকনো মোরগ-চণ্ডী ফুল কি খয়েরি ট্যাসেল জড়িয়েছে, ঘোমটাটা হঠাৎ টেনে দিলে ব'লে হীরেন ভালো দেখতে পেল না। রান্নাঘরের চৌকাঠের এ-পাশে দাঁড়ায় সে।

'তোমার দিদিমণি এখনো ফিরলো না।'

'কোথায় গেল?' মালতী মিশিমাখা দাঁতে অল্প-অল্প হাসে।

'একটু কাজে বাইরে গেছে।' গম্ভীর হ'য়ে হীরেন মেঝের দিকে চোখ নামালো। মেয়েটি অঞ্জনবাবুর বাড়ি থেকে এসেছে, মানে অঞ্জনবাবুর বাড়িতে যে পুরোনো ঝি-বুড়ি আছে তার মেয়ে। মালতী মীরার ঝি। মীরার মানুষ। দিদিমণি কাল থেকে কাজে বেরোবে তাই ও এসেছে রান্নাঘর সামলাতে।

'দাদাবাবুর কিছুর দরকার আছে?' মালতী প্রশ্ন করলো। 'এক্ষুনি তোমার ওবলটিঙের জল গরম হবে।'

ফিরে যাচ্ছিলো হীরেন, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়।

'তোমার স্বামী আছে, মালতী?'

'আছে দাদাবাবু, সিঁথিতে সিঁদুর দেখছো না?' মালতী ভ্রূভঙ্গি ক'রে হাসলো।

হীরেন মালতীর সিঁথিমূলে সিঁদুর দেখতে পেল। বয়স ত্রিশ অতিক্রান্ত। তাই মীরার চুলের মতো এই চুলে যৌবনের চাকচিক্য তত না থাকলেও ধূসর হ'য়ে যায় নি।

'তুমি যে খুব ছটফট করছো, দাদাবাবু।'

'কি রকম?' হীরেন চমকে ঝিয়ের চোখ দেখে।

মালতী মুখ নামিয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে। দুপুরের এঁটো গ্লাস ও বাটি ধুচ্ছিলো ও। হাতে একগাছি ক'রে পাতলা সোনার চুড়ি। জল ঘেঁটে-ঘেঁটে মালতীর হাতের আঙুল ফ্যাকাসে হ'য়ে গেছে—হীরেনের চোখে পড়লো।

'তোমার স্বামী কি করে?'

'সিনেমা-কোম্পানির দরোয়ান।'

'ভালো।' হীরেন এক-পায়ের ওপর দাঁড়ায়। 'তোমরা দু-জনেই রোজগার করছো।'

মালতী একটু চুপ থেকে বাসনগুলো মুছে-মুছে সাজিয়ে রাখে।

'না, স্বামী আমার রোজগারে খায় না। আলাদা থাকা খাওয়া চলছে।'

'কি রকম?' হীরেন চৌকাঠ ঘেঁষে দাঁড়ায়।

'তোমরা নেখাপড়া জানা লোক গো বাবু, মাজাঘসা মন। মুখ্খুর কীত্তি শুনলে হাসবে ছাড়া কি।' মালতীর চোখের হাসিতে এখনো বেশ ধার আছে, হীরেন লক্ষ্য করলো।

'মুখ্খু কি করেছে, শুনি?' ঠিক হাসলো না হীরেন, কৌতূহলে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে দাঁড়ালো।

'মান হয়েছে বাবুর।' মালতীর চোখ এবার হাসলো না, ফোঁস ক'রে একটা নিশ্বাস ঝরলো সুগোল নাসারন্ধ্র থেকে।

'কি হয়েছে বলো না ছাই!' হীরেন হাসির ভঙ্গিতে এবার অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করলো। 'অত ঘোরাচ্ছো কেন।'

যেন ফিক্ ক'রে মালতী এই একটু হেসে আবার পলকে গম্ভীর হ'য়ে যায়।

'গোঁয়ার, গোঁয়ারের সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে আমার মরণ হয়েছে।' মালতী ঠুক্ ক'রে গরম জলের কেট্‌লিটা উনুনে বসায়, শেল্‌ফ থেকে কাপ-ডিস টেনে নামায়, দুধের টিন ওভালটিনের কৌটো রাখে পায়ের ধারে মাটিতে।

'এমন বিয়ের কপালে নাথি মারি, এমন ভালোবাসার মুখে আগুন।' মালতী আর-এক ঝলক গরম নিশ্বাস ফেললো। হীরেন চুপ। মালতী বললো, 'আর আসবে না মিন্‌সে এই দোরে, আসুক, কাটারি দিয়ে নাক-কান কেটে দেবো। আমার বয়েস যায় নি, আমি মরবো না।'

কাটারির পরিবর্তে মালতী হাতের দুটো লম্বা আঙুল বাড়িয়ে দেয় হীরেনের সামনে।

কালো আঙুলে শাদা পাথর বসানো আংটির ঝলক ওঠে।

কিন্তু মালতীর চোখে কাটারির ধার।

কলেরায় ম'রে যায় ললিত, ললিতের অচৈতন্য দেহ নিয়ে রাত দুটোর সময় একলা ও ক্যাম্পবেল হাসপাতালে ছোটে।

'অ্যাম্বুলেন্স' ছিলো না। প্রতিবেশী গোপাল স্যাক্‌রার কাছে রাত দুপুরে, ধরতে গেলে জলের দরে, কানপাশা দুটো বিক্রি ক'রে টাকা যোগাড় করলো মালতী। তারপর ট্যাক্সি ক'রে ললিতকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

যমের দরজা থেকে ফিরে এসে ললিত হাজরা জেরা করে, রাত্রে

একলা কেন স্যাকরার দোকানে ঢুকেছিলো মালতী, ওর বাইরে গিয়ে ট্যাক্সি ডাকার দরকার ছিলো কি। পাড়ায় আর লোক ছিলো না, ঘরে কি বুড়ি মা ছিলো না? না-হয় ম'রে যেত ললিত।

হীরেনের চোখে চোখ রাখে মালতী। 'ব্যারাম শাশুড়ীবুড়িরও হয়েছিলো। বুড়িকে না দেখে জোয়ান স্বামীকে দেখলুম কিনা, তাই হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ও আমার কানপাশার কথা জিজ্ঞেস করলো না, দশদিন কি খেনু খোঁজ নিলে না, করলো আমার চরিত্রি সন্দেহ। পুরুষ!'

'এর আগে বুঝি তুমি বাইরে যেতে না?' হীরেন নিচু-গলায় বললো।

মালতী মাথা নাড়লো। 'ও যেতে দেবে বাইরে! বলে কি, খাই না-খাই, বাঁচি মরি কুটোটির জন্যে আমি তোকে বাইরে পাঠাচ্ছি না, তুই আমার বুকের পায়রা, ঘরের পরী।'

হীরেন দুই পায়ের ওপর সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়। 'বেশি ভালোবাসতো আর কি বৌকে ললিত।'

'ভালোবাসার ফাঁস, ফাঁসি পরিয়েছিলো ও গলায় আমায় দিনরাত আটকে রেখে।'

মালতী ওভালটিনের কাপ হীরেনের হাতে তুলে দেয়।

'মিন্‌সের মন ছোটো গো দাদাবাবু।'

হীরেন বাটিতে চুমুক দেয়, তারপর মুখ তোলে।

মালতী চুপ।

যেন আর-কিছু বলার নেই। হাত বাড়িয়ে বটি নেয়, টুক্‌রি থেকে একটা বেগুন দুটো শুক্‌নো ঝিঙে তোলে।

শূন্য কাপটা হাত থেকে এক-সময় নিচে নামিয়ে রাখলো হীরেন।

'এই-যে ঘরে-ঘরে এখন দিদিমণিরা সব বাইরে যাচ্ছে, দিনভর বাইরে থাকছে চাকরি . করছে, ঠেস খেয়ে, গা ঘেঁষে চলছে রাস্তায় গাড়িতে রাজ্যের পুরুষের, দাদাবাবুরা কেউ মন খারাপ ক'রে মুখ ভার ক'রে ব'সে আছে কি ?'

তরকারি কুটতে-কুটতে মালতী নিজের মনের কথা বলে। 'থাক তুই তোর মনের খুঁতখুতুনি নিয়ে। আমার দিন কাটবে। তোর কাজে রাতে একলা বাইরে গেছি তো আমার জাত গেছে, কেমন ?'

হীরেন কড়িকাঠের দিকে তাকায়।

'বলেছি, সব বললাম সেদিন মীরা দিদিমণিকে ; বলে, কোন্ দুঃখে তুই আর ললিতের কাছে যাবি, মিছে বদনাম দিলে যে। লেখাপড়া জানা মেয়ে তো, বুদ্ধি পরামর্শ দেয় ভালো।' মালতী হীরেনের মুখের দিকে তাকায়। 'গেল-বোশেখে মিন্সে একবার সাধতে এসেছিলো।'

'এখন বুঝি একলা আছো ?'

'কোন্ দুঃখে ?' মালতী মুচ্কি হাসে। মাথার কাপড় স'রে যেতে হীরেন দেখলো সুন্দর খয়েরি রং-এর একটা ট্যাসেল জড়ানো ওর খোঁপায়। 'আমি বুড়িয়ে গেছি তুমি বলছো কি গো, দাদাবাবু ?'

'না, তা না—' হীরেন অস্পষ্ট গলায় বললো, 'আমি জানি না সব তোমার, জিজ্ঞেস করছি।'

দাদাবাবুর চোখ দেখে মালতী সন্তুষ্ট হয়। ভুরু নামিয়ে বলে, 'আছি কেশবের সাথে। হিঁদুর মেয়ের তো দু-বার বিয়ে নেই, অই এক সঙ্গে থাকা আর কি।'

'কি করে কেশব ?' ইচ্ছে না থাকলেও হীরেন প্রশ্ন করে, আরও একটু-সময় চৌকাঠ ঘেঁষে দাঁড়ায়।

'রেশনের ট্রাক চালায়। দিদিমণি জানে।'

'ভালো।'

'দু-জনে রোজগার করছি, আছি সুখে।' মালতীর চোখ ঝল্‌সে ওঠে। 'এই নতুন আংটি করলাম, চুড়ি গড়ালাম। স্বামীর ঘরে থাকতে তেল পাই নি গো দাদাবাবু মাথায় মাখবার, গায়ে মাখতে একদিন একটা সাবান। এক-কাপড় সেলাই ক'রে ন-মাস পরেছি।'

'ললিতকে ছেড়ে এসে ভালোই হয়েছে।' হীরেন বলতে চায়, হাসতে চায়।

কিন্তু মালতী তখন অতিমাত্রায় ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে একটা পিঁপড়ে নিয়ে। পিঁপড়েটা বুঝি ওর ঘোমটার নিচে ঢুকে ঘাড় ও পিঠে ছুটোছুটি করছে। দাঁড়িয়ে মালতী তাড়াতাড়ি আঁচল ঝাড়লো—পিঠ চুলকালো। খোঁপা ভেঙে পিঠময় ছড়িয়ে পড়ে। মালতীর অনেক চুল।

সদ্যফোটা বকুল ফুলের গন্ধ নাকে নিয়ে হীরেন আস্তে-আস্তে সেখান থেকে স'রে এলো।

পাঁচ

ভোমরা।

ভোমরা কাঁপছে, ওর ঠোঁট নড়ছে উত্তেজনায়। চোখের রং, ঠিক লাল নয়, গোলাপী হ'য়ে আছে চাপা চোখের জলে, চাপা আগুনে, ক্রোধে।

সকলের চেয়ে বয়সে ছোটো, মীরাদের মধ্যে সবচেয়ে দেখতে ছোটো। কলেজে থাকতে যেমন ছিলো এখনও তেমনি। পুতুলের মতো নাক চোখ গলা, ছোট্ট শরীর নিয়ে সেই ভোমরা। এখনো ফ্রক পরতে বাধা নেই।

মীরা ওর কাঁধের ওপর হাত রাখলো আস্তে। 'কি, তুই আমায় সব বল্ না।'

'ব'লে কিছু লাভ নেই।' ভোমরা মীরার হাত সরিয়ে দূর্বার ওপর ব'সে পড়লো।

কার্জন পার্ক। শ্রাবণের আকাশ মেঘে-মেঘে কালো নীল হ'য়ে আছে। হোয়াইটওয়ের ঘড়িতে চারটে বেজে পনেরো। একটু দূরে এক-ঝাঁক সূর্যমুখী মাথা জাগিয়ে চেয়ে আছে মীরাদের দিকে। আর আল্‌তো হাওয়ায় একটু-একটু নড়ছে। সূর্যমুখীর জঙ্গলের ও-পাশ দিয়ে ঘড়ঘড় ক'রে আর-একটা ট্র্যাম চ'লে গেল।

মীরা ও ভোমরা চুপ।

'তারপর, তুই কেমন আছিস?' ভোমরা মীরার চোখের ভিতরে তাকায়।

'এই একরকম।' মীরা হাতের জিনিসগুলো ঘাসের ওপর নামিয়ে রাখে। ভোমরা আড়চোখে দেখলো নতুন শাড়ি, জুতো, মাখন, জেলি, ওটসের কৌটো।

'বাজার করতে বেরিয়েছিলি বুঝি?' এক ঝলক নিশ্বাস ফেলে ভোমরা বললো, 'তোর সঙ্গে এত বছর পর হঠাৎ ট্র্যামে এমনভাবে দেখা হবে সত্যি ভাবি নি।' ভোমরার চোখ চকচক করছে।

মীরা চুপ।

ভোমরা ওয়েলিংটনের কাছাকাছি হঠাৎ কোথা থেকে গাড়িতে ওঠে। দুই সখীতে আচম্‌কা তখন দেখা।

'বিয়ের পর থেকে বরাবর তোরা কোডার্মায় ছিলি?' মীরা প্রশ্ন করলো।

'হুঁ।' ভোমরা ঘাড় ফেরালো। 'চার বছর।'

'কলকাতায় তুই কবে এসেছিস?'

'এক মাস। কিছু বেশি।'

'এই এক বছর ছিলি কোথায়, কা'র কাছে?' মীরা সামনের দিকে ঝুঁকে বসে।

'দিদির কাছে, মীরাটে।'

ভোমরা মীরার চোখের ভিতরে তাকায়। মীরাও ভোমরার চোখ থেকে চোখ সরায় না।

'কি বলছে মিস্টার মজুমদার?' অস্ফুটে মীরা প্রশ্ন করলো।

বলার আগে আবার ভোমরার ঠোঁট নড়লো, গলার স্বর কাঁপলো, মৃদু ঘন নিশ্বাস ফেললো একটা :

' 'তুমি দিন-দিনই আমার চোখে, আমার কাছে ছোটো হ'য়ে যাচ্ছো ভোমরা, ছোট্ট হ'য়ে গেছো।' '

মীরা চুপ।

ভোমরা তার স্বামী মিস্টার মজুমদারের উক্তির পুনরুল্লেখ করছিলো :

' 'আমি দিন-দিনই যেন কেমন আর্টিস্ট হ'য়ে উঠছি। চোখ কেবলই

এখন লম্বা-টাইপ খুঁজছে, তোমার চেয়ে অনেক বেশি লম্বা শরীরের মেয়ে।' '

মীরার চোখের পাতা নড়ে না।

' 'ডল্'—সময়-সময় ও আমায় আদর ক'রে ওই ডাকতো।' ভোমরা মীরার ভুরুর ওপর দৃষ্টি রাখে। 'বলতো— 'কিন্তু আমি টায়ার্ড, সত্যি অত ছোট্ট পুতুল নিয়ে আর খেলা এখন ভালো লাগছে না।' '

ভোমরার পাখির নাকের মতো বাঁকা সরু ছোট্ট নাকের ওপর চোখ রেখে মীরা দুঃখে ঠোঁট কামড়ালো। 'পশু, বিস্ট!' মীরা বিড়বিড় ক'রে উঠলো, 'তো, জিজ্ঞেস করেছিলি কি, কি অপরাধ তোর? কেবল শরীরে ছোট্ট হওয়া?'

ভোমরা নিঃশব্দে নোখ দিয়ে একটা দূর্বাঘাসের বুক চিরে ফেললো।

'দীর্ঘাঙ্গীর দেখা পেয়েছে কি? অমানুষ!' মীরা ফিসফিসিয়ে উঠলো, 'লালসা।'

ভোমরা নীরব। কিছুক্ষণের স্তব্ধতা।

দূরে সূর্যমুখীরা বাতাসে কাঁপছে। আর-একটা ট্র্যাম যাচ্ছে নতুন সবুজ আলো জ্বেলে। ভোমরা আড়চোখে আপন হাতঘড়ির সঙ্গে চৌরঙ্গির ঘড়ির সময় মেলায়। তারপর চুপ ক'রে থাকে। ছ-টা পনেরো।

'বেবি কা'র কাছে?' মীরা প্রশ্ন করলো।

'আমার কাছে।' মৃদু কেশে ভোমরা গলা পরিষ্কার করলো।

'ঐ একটি তো?'

'হুঁ।' ভোমরা বললো, 'অবিশ্যি কলকাতায় আসার আগে আমি দিদির কাছে রেখে এসেছি খোকাকে, মীরাটে।'

'না রেখে এসে করবি কি। অতটুকুন বাচ্চা নিয়ে ঘুরবি কত এখানে?'

ভোমরা আকাশের দিকে মুখ ক'রে চুপ।

একটু পরে মীরা বললো, 'এখানে মিস্টার মজুমদার কোথায় আছেন জানিস না?'

ভোমরা মাথা নেড়ে 'না' বললো।

'তুই আছিস কোথায়?'

'কাকাবাবুর বাসায়।'

মীরার মনে পড়লো ভোমরার এক কাকাবাবু আছেন গড়পার রোডে।

সেই ভোমরা, মীরার মনে আছে, কলেজের কমনরুমে পিং-পং কি বাগাটেলির আসরে যোগ না দিয়ে নিজের মনে স্ট্যাম্প-এর অ্যালবাম খুলে বসতো, কি বিলিতি বা ভালো বাংলা উপন্যাস। তখনই বোঝা গিয়েছিলো সত্যি ওই ছোট্ট মেয়ের মধ্যে একটা বিশেষ-কিছু আছে, একটা বিশেষ ঘটনা ওর জন্যে অপেক্ষা করছে, নইলে ও এমন আলাদা হ'য়ে যাবে কেন,—যাচ্ছিলো কেন হঠাৎ এক-ছুটিতে শিলং-এ থেকে ঘরে এসেই। বোঝা গিয়েছিলো পরের ছুটিতে যখন আবার ও শিলং-এ চ'লে যায়।

আর ফিরে এলো না।

ভোমরার আর বি.এ. পরীক্ষাই দেওয়া হয় নি। দেখতে সকলের চেয়ে ছোটো। কিন্তু পরীক্ষায়, মেয়েদের জীবনের সবচেয়ে দামী পরীক্ষায় ও সকলের বেশি নম্বর তুলেছিলো।

কলেজে বেশ সোরগোল প'ড়ে গিয়েছিলো বিলেত-ফেরত পাকা-পোক্ত কোনো-এক ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে ভোমরার প্রেম ও আকস্মিক পরিণয়ে। বিয়ের পর ও শিলং পাহাড় থেকে কোডার্মার খনিতে উড়ে গেছে প্লেনে।

কলকাতায় সখীদের সঙ্গে আর দেখাই করে নি। বিলেত-ফেরত ইঞ্জিনীয়ারের গিন্নী হ'য়ে মীরাদের মনের আকাশে সুদূর নক্ষত্রের মতো বিরাজ করছিলো প্রতিভাশালিনী এই 'ডল'। সত্যি, কী ভয়ংকর ঈর্ষা করেছিলো সেদিন মীরা আর তার সখীরা তাদের খুকীর মতো দেখতে বান্ধবীকে।

নক্ষত্র ছিটকে পড়লো মাটিতে।

ভোমরা ফিরে এসেছে।

আলো-অন্ধকারে বিচিত্র হ'য়ে গেছে পার্ক। মুখের রেখা দেখা যায়, রঙ বোঝা যায় না।

'উঠি, চলি এবার।' ভোমরা ন'ড়ে ওঠে।

'বোস্।' মীরা মৃদু ধমকের গলায় বলে, 'তোর কাকাবাবু জানেন ?'

'বলেছি, না ব'লে করবো কি।' ঝিরঝিরে একটু হাসি এলো যেন ভোমরার গলায়।

মীরা ঢোক গিললো। 'কি বলেন তিনি ?'

' 'তোমরা সব আধুনিক-আধুনিকা, তোমাদের মতিগতি বোঝা আমার পক্ষে কঠিন, যা-খুশি করো।' '

'দুঃখে বলেছেন,' মীরা বললো, 'এর বেশি আর কি বলবেন তিনি; কীই-বা করার আছে তাঁর।'

চৌরঙ্গির আকাশে বিজ্ঞাপনের রক্ত-ঝড় বইছিলো, ভোমরা একদৃষ্টে চেয়ে। উইলস, ফোর্ড, ডিল্যাক্স। এক সেকেণ্ডে তিনটে গাড়ি ও পাঁচটা সিগারেটের নাম পড়লো মীরা।

'কি করবি এখন ঠিক করেছিস ?'

'কিছুই না।' ভোমরা মীরার দিকে মুখ ফেরায়। 'যদি আমার

অবস্থা তোর হ'ত তুই কি করতিস, কি করা উচিত তুই-ই ব'লে দে মীরা। বুদ্ধি ঠিক করতে পারছি না।'

মীরা চুপ।

'দিদি বলছে ফিরে যেতে, কাকাবাবু বলছেন তুই আমার কাছে থাক, পড়াশোনা কর্। কিন্তু এ-দিনে আর একজনের ওপর—'

মীরা বুঝলো ভোমরা কি বলতে চায়।

'একটা বাচ্চা হ'য়ে আমি ঠেকে গেছি, নইলে, তা না হ'লে আমিও কি একটা চাকরি-টাকরি নিয়ে থাকতে পারি না, মীরা। রঙের নেশায় আমিও কি চোখ ভ'রে রাখতে পারতুম না আলাদাভাবে বেঁচে? কিন্তু বেবিকে কোথায় রাখি, কা'কে দিই—'

অস্পষ্টতায়, দীর্ঘশ্বাসে শেষের দিকের কথাগুলো বোঝা গেল না। ভোমরা আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ায়। মীরা তখুনি উঠতে পারলো না। ভোমরা চ'লে যাওয়ার পর তার খেয়াল হয় ওর ঠিকানা রাখা হ'লো না। ভোমরার কাকাবাবুর বাসার নম্বর মীরার আজ আর মনে নেই।

উঠে আস্তে-আস্তে মীরা মাঠ পার হ'লো।

অমরেশের দশ টাকা এখনো তার ব্যাগে রয়েছে। সে এখানে এসেছে নিউমার্কেট উদ্দেশ্য ক'রে। কতকাল টাকার অভাবে ও দু-একটা বিলিতি ম্যাগাজিন কিনতে পারছে না। অমরেশের বাকি টাকাটা সে এভাবে খরচ করবে। একটা দুটো কেন, চার ছ-টা পত্রিকা কিনে নিয়ে গেলেও হীরেনের কিছু বলার নেই—বলা উচিত নয়।

কর্তব্য, কর্তব্য। 'আধুনিক আধুনিকা'র কথায় মীরার নিজের ঘর মনে পড়লো। 'কত খেঁলো।' কর্তব্যের প্রাচীর তুলতে গিয়ে প্রাচীর-পরিবেষ্টিত রুগ্ন অকর্মণ্য স্বামীর চোখ চিন্তা ও চেতনাকে মেয়েরা সূচের মুখের মতো ধারালো ক'রে তোলে, মীরার জীবনে তার জ্বলন্ত প্রমাণ

পাওয়া যাচ্ছে। কী ক'রে স্ত্রী এমন সুন্দরভাবে সব ম্যানেজ করছে। জুতো কিনতে গিয়ে মীরা শাড়ি, রুগীর তিনরকম পথ্য এবং তার ওপর ম্যাগাজিন ও চৌকাঠের সামনে রাখার একটা পুরু সুন্দর পাপোষ কিনে নিয়ে এলো। আশ্চর্য।

কত টাকা ও কর্জ করলো। সব টাকা অমরেশ দিয়েছে ? কে অম—

বুকের রক্ত দ্রুত ওঠা-নামা করছিলো মীরার। এতগুলো জিনিস বইতে না পেরে ও প্রথমে রিক্সা, তারপর সেই চিন্তা বাদ দিয়ে ট্যাক্সি ডাকলো।

কর্তব্যের গিঁট এখন থেকে একটু-একটু ঢিলে ক'রে দেবে ও।

দেওয়া ভালো। মীরা ভাবলো।

কাল থেকে তো ও চাকরিতে যাচ্ছে। কাজ থেকে ফিরে এসেই আর রান্নাবানা কি হীরেনের টিফিন, কি রাত্রির খাওয়া নিয়ে সে মেতে উঠবে না, বরং বেহালাটা নিয়ে নতুন কোনো গৎ—

সাংসারিক কাজের জন্যে ও একজন ঝি রেখেছে। ইচ্ছে করলে মীরা কেবল সন্ধ্যা কেন, সারা দিন রাত গানের চর্চায় মেতে থাকতে পারে। ইচ্ছে করলে ও কাল থেকে চাকরি করতে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা পর্যন্ত বাতিল করতে পারে।

কোনো পুরুষের কাছ থেকে কর্জ ক'রে ঘরে নিয়ে আসা টাকা ও একটা পুরুষ-প্রতিষ্ঠানে চাকরি-করে-আনা টাকার মধ্যে বেশ কম কি।

সন্দেহের অনুপাত তো দুটোর ওপরই একরকম থাকা উচিত, রাখা উচিত।

ট্যাক্সিতে ব'সে অসুস্থ হীরেনকে মনে-মনে মীরা অনুকম্পা করলো।

ইচ্ছে ক'রেই মীরা আজ দেরি করছে, দেরিতে ঘরে ফিরছে।

বেড়াতে ভালো লাগছিলো তার চৌরঙ্গির রাস্তায়, রেড রোডে,

মনুমেণ্টের পাদদেশে—যদি বলে, যদি বলতে থাকে ও ঘরে ফিরে, তো হীরেন নিশ্চয়ই রাত্রে খাবে না,—পেট ব্যথা করছে, আজ আবার কিড্‌নির একটু যন্ত্রণা হচ্ছে ব'লে নির্ঘাৎ চুপ ক'রে শুয়ে পড়বে। দেওয়ালের দিকে ফেরানো ইউনিভার্সিটির ঝকঝকে রত্ন হাইলি ইনটেলেক্‌চুয়্যাল আধুনিক হীরেন চক্রবর্তীর চেহারা সন্দেহে শীর্ণ কাতর স্তিমিত হ'য়ে গেল।

অনুকম্পা করে বৈকি মীরা।

ভোমরার দুঃখ এসেছে একভাবে। মীরার দুঃখ আসছে অন্যভাবে। আসবেই।

উৎপত্তি এক, না দুই।

প্রেম, তারপর বিবাহ।

তোমাদের নিয়ে যদৃচ্ছ ব্যবহার আমরা করবই। পুরুষ। ডবল সার্টিফিকেট দিয়েছো যে।

কিন্তু ভোমরা চুপ ক'রে থাকতে পারে, কাঁদতে পারে,—মীরা, মীরা হুল ফোটাবেই, যদি ফোটায় তো কি করতে পারে হীরেন, কি করবে—গাড়ির এক-একটা ঝাঁকুনির সঙ্গে মীরার বুকের মধ্যে আবর্ত উঠছিলো, দুঃখের, অভিমানের, রাগ ও চাপা ঘৃণার।

ভাবতে মীরার সত্যি সময়-সময় কান্না পায়, ভয়ংকর ঘৃণা হয়। বিয়ের পর থেকে মীরা যত করছে, সংসারটাকে টেনে তুলছে, ধ'রে রাখছে, একটু ভালো চেহারা দিতে চাইছে, ততই অক্ষম হীরেন অপরিচিতের বিস্ময় নিয়ে মীরার দিকে চাইছে, মীরাকে দেখছে। যেন এমন হওয়া উচিত ছিলো না, এত ভালো৷ হীরেন যে অনেক-সময় চেষ্টা ক'রে হাসে, মীরা কোনো জিনিস ঘরে নিয়ে গেলে বা নির্বিঘ্নে একটি কাজ সম্পন্ন করলে অমিত উচ্ছ্বাসে চিৎকার ক'রে ওঠে, বলে, 'তুমি ব'লেই সম্ভব হ'লো,

আমি হ'লে পারতাম না, পারি না মীরা।' সেই উচ্ছ্বাসের আড়ালে না-পারার ঈর্ষা হিংসা হীনতার যন্ত্রণা পুরুষের চোখকে কুটিল শানিত ক'রে দেয়। মীরা ইজিচেয়ারে শায়িত হীরেনের সূচীমুখ চোখ দেখে, দেখছে রোজ।

ট্যাক্সি রাসবিহারী অ্যাভিনিউর মোড় ঘুরলো। ঘড়িতে দশটা।

মীরা বিচলিত হ'লো না।

শাড়ির প্যাকেটটি কোলের ওপর চেপে ধ'রে ও স্থির হ'য়ে ব'সে থাকে।

কাল থেকে তার সাত ঘণ্টা অফিসে খাটার রুটিন শুরু।

শক্ত, শক্ত বৈকি একটি মেয়ের পক্ষে। হারেমবিলাসিনী তাই আজ মীরা একটু রাত ক'রে ঘরে ফিরলো, বেড়িয়ে।

হ্যাঁ, সংসারের যা প্রয়োজন, কর্জ ক'রে আজও তা সে সম্পন্ন করেছে। টাকা যোগাড় ক'রে কেবল মীরার নয় হীরেনের জন্যেও অনেক জিনিস কিনে মীরা ঘরে ফিরছে। ফেরার সময় একটু বেশিক্ষণ বেড়িয়ে এলো এই-যা। না, একটু পরে মীরা ভাবলো, সিগারেট থাক আর অনুপকুমারকে ড্রাইভিং শেখাতে বোটানিক্যাল গার্ডেনে নিয়ে যাক, পুষ্প—মীরা ও ভোমরার সখী—পুষ্প চ্যাটার্জি আজও বিয়ে না ক'রে অনেক বেশি বুদ্ধি ও পরিচ্ছন্ন মনের পরিচয় দিয়েছে। মীরা চলন্ত ট্যাক্সির গর্ভ থেকে চাপা নিশ্বাস ফেললো।

ছয়

হীরেন চমকে উঠলো।

লোকটা যে এমন অভদ্র, বেহায়া নির্লজ্জ হ'তে পারে হীরেনের ধারণায় ছিলো না।

এক মাস হ'তে চললো এই বাড়িতে এসেছে সে, একদিন হীরেন তার ঘরের দরজায় গেল না, কথা বলে নি ওর সঙ্গে, যতটা সম্ভব এড়াচ্ছে। কিন্তু জাতে আর্টিস্ট ব'লে কি বাইরের জগৎ সম্বন্ধে ওদের বোধশক্তিটা একেবারে ভোঁতা মেরে গেছে!

অদ্ভুতভাবে হীরেনের চৌকাঠের সামনে চ'লে এসেছে, দেশলাই চাইছে আর্টিস্ট।

হীরেন নিঃশব্দে দেশলাই বাড়িয়ে দিলে। 'অবাঞ্ছিত আগন্তুক।' মনে-মনে বললো সে।

লাল ট্রাউজার, ভায়োলেট পপ্লিনের হাওয়াই শার্ট গায়ে, হাওয়ায় ওড়ে এমন কোঁকড়ানো লম্বা চুল, তেল নেই।

'থ্যাঙ্ক ইউ।' আর্টিস্ট যেন মন্ত্রোচ্চারণ করলো।

হীরেন কথা না ক'য়ে দেশলাই ফিরিয়ে নিলে।

'মিসেস এখনো ফেরেন নি বুঝি?'

'না।' হীরেন আর্টিস্টের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিজের ঘরের দিকে তাকায়।

'ভা-রি ইণ্টারেস্টিং আপনার ঝি মালতী।' আর্টিস্ট ঝরঝর ক'রে হেসে সিগারেটের অজস্র ধোঁয়ায় ঘরের সামনেটা আচ্ছন্ন ক'রে দেয়।

'আমার ঘরের সবই ইণ্টারেস্টিং।' হীরেন বিড়বিড় ক'রে বললো নিজের মনে।

'আচ্ছা।' চ'লে যাচ্ছিলো স্কাউণ্ড্রেল, আবার ঘুরে দাঁড়ালো। হীরেন বিরক্ত হয়।

'আপনার ঝি কি চ'লে গেছে?'

'কেন?' রুক্ষ গলায় হীরেন প্রশ্ন করলো।

'একটা দেশলাই ওকে দিয়ে আনিয়ে রাখতাম, রাত্তিরের জন্যে।'

'নন্‌সেন্স।' হীরেন প্রায় অস্পষ্ট গলায় উচ্চারণ করলো। 'নির্লজ্জ, অশিক্ষিত।' বললো সে মনে-মনে।

আচ্ছা, সারাদিন ওই ঘরটার মধ্যে ব'সে হাম্বাগটা করেই বা কি। হীরেন ভাবে।

ওর সারাদিনের আঁকা সব ছবি যায়ই বা কোথায়, কে কিনছে! কাপড়জামা, চালচলন খুব যে একটা গরিবের মতন তা-ও নয়।

'মালতী চ'লে গেছে।' হীরেন গম্ভীর গলায় বললো, আর মনে-মনে বললো, 'মালতী আমার চাকরানী, তোমার নয় যে দোকানে গিয়ে তোমার রাত্রির নেশার রসদ কিনে আনবে।'

আর্টিস্ট বেশ সুন্দরভাবে শিস দেয়। পাখি কি হরিণ দেখলে মানুষ যেভাবে শিস দেয়।

তোমরা আর্টিস্ট ব'লেই এ-সব সম্ভব। হীরেন মনে-মনে বললো। হীরেন নির্বাক। আর-একজনের দরজায় দাঁড়িয়ে সে কি এভাবে শিস দিতে পারতো? আইনত হোক বা জোর ক'রে হোক লোকটা এ-বাড়িতে আছে, থেকে যাচ্ছে মাসের পর মাস হীরেনের পাশের ফ্লাটের প্রতিবেশী হ'য়ে। অথচ সঙ্গে ফ্যামিলি—স্ত্রীলোক বলতে কেউ নেই। নিটোল একলাটি। এখানে নাকি এ-সব নিয়ে আপত্তি করা চলে না, এই পাড়ায়। এখানকার সবাই আর্টের পূজারী। মীরা বলে। এই নিয়ে হৈ-চৈ করলে লোকে তাদেরই নিন্দে করবে।, আর্টিস্টের কিছু হবে না।

তবে কি জেনেশুনে, এক-এক সময় হীরেনের মনে হয়, মীরা এ-বাড়িতে এসেছে।

আশ্চর্য, আশ্চর্য মীরার রুচি।

মীরার এক-একটা রুচির পরিচয় পেয়ে হীরেন স্তব্ধ, বিমূঢ়। সেই এঞ্জেল মীরা, নীল মেরুনে মোড়া পালিশ-ঝকঝকে মীরা।

মীরার বাইরের পোশাকটা হীরেনের চোখের সামনে ভাসে। এই মীরা প্রায়ই হীরেনকে বোঝায়, 'বাড়িওয়ালা কি অন্য প্রতিবেশীরা যখন আপত্তি করছে না, মাথা ঘামাচ্ছে না ভদ্রলোকের সঙ্গে স্ত্রী আছেন কি নেই, না কি বিয়েই করে নি, আমাদের পক্ষ থেকে আপত্তি তোলাটা অশোভন।'

কোনো ফ্যামিলি-কোয়ার্টারে স্ত্রী-বর্জিত একটি পুরুষ-প্রতিবেশীর অধিষ্ঠান যে কত বিরক্তিকর, আর কেউ না পাক, হীরেন মর্মে-মর্মে টের পাচ্ছে।

তা ছাড়া তিনি শিল্পী।

মেয়েদের সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনা কৌতূহল আর-দশটি পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল, প্রখর।

রাগে হীরেনের গা জলে।

যেহেতু শিল্পী সেজন্যে তার বেয়াদপি বর্বরতাও তোমায় মুখ বুজে সহ্য করতে হবে। সভ্য আধুনিক সমাজের বিধান।

হীরেন ভুলে গেছে। উকিল বিপদবরণের সঙ্গে কনসাল্ট করা উচিত ছিলো। স্কাউণ্ড্রেলটার ওপর যে-কোনো উপায়ে একটা ইজেক্টমেণ্ট্ নোটিশ আনা দরকার।

'চুপ ক'রে যেন কি ভাবছেন?'

হীরেন চমকে ওঠে। মুখ তুলে তাকায়।

কথার শেষে আর্টিস্ট আবার শিস দিচ্ছে। চোখ দুটো চকচক করছে। যেন খুব উৎফুল্ল একটা-কিছু ভেবে। 'নন্‌সেন্স।' হীরেন বিড়বিড় করলো।

'ওই মেয়েটি কে, রোজ আপনাকে দেখতে আসে?'

'বুলা, আমার বোন।' হীরেন রাগে দাঁত ঘসে, ঘৃণায়। 'কেন?' বেশ রুক্ষভাবে তাকালো সে।

'না, এমনি। দেখছি কিনা সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করে।'

'সিঁড়ি দিয়ে যে-ই ওঠানামা করুক তুমি চেয়ে থাকবে, অসভ্য।' হীরেনের বুকের মধ্যে গর্জে উঠলো, চুপ ক'রে রইলো।

'ইণ্টারেস্টিং গার্ল, দেখে মনে হয়।' আর্টিস্ট হীরেনের চোখে চোখ রেখে অল্প হাসে।

'মেয়ে মাত্রই ইণ্টারেস্টিং তোমার কাছে।' হীরেন চোখ ফেরায়। ভেবে সে ঠিক করতে পারছিলো না কি ব'লে ইডিয়টকে তার দরজা থেকে বিদায় করে।

'কিন্তু, কিন্তু মিসেস চক্রবর্তীকে দেখলে তা মনে হয় না।'

'কি মনে হয়?' হীরেন প্রকাণ্ড ঢোক গিললো, দুই পায়ের ওপর সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো সে।

'অত্যন্ত স্মার্ট মনে হয়।' আর্টিস্ট বললো।

'আর, আর-কিছু মনে হয় না?' হীরেনের চোখ পিটপিট করছিলো।

'আপনি চট্‌ছেন।' আর্টিস্ট হঠাৎ ঠোঁট টিপে হাসে। 'মিস্টার চক্রবর্তী, বলুন?'

'না, তা কেন হবে।' হীরেন, যেন হঠাৎ ধরা প'ড়ে গিয়ে, চেহারায় স্বাভাবিক রং ধারণ করলে; হেসে বললো, 'আপনারা শিল্পী। মেয়েদের শরীরের রেখার মতো ওদের প্রকৃতি, স্বভাবও আপনাদের মনে রেখাপাত

করে, তা শুনে, তা এখন আপনার মুখে শুনছি ব'লে রাগ করলে আমার চলবে কি ? আর্টের আমি কি বুঝি।'

আর্টিস্ট তার ঈষৎ লাল চুলের ওপর আঙুল বুলালো। সিগারেটের টুকরোটা মাটিতে ফেলে দিয়ে জুতো দিয়ে দু-বার ওটাকে ঘসলো।

'আসুন না ?'

'কোথায় ?'

'ঘরে, ওই আমার স্টুডিও।' আর্টিস্ট আঙুল দিয়ে নিজের ফ্ল্যাট দেখালো। 'মিসেস চক্রবর্তী এতক্ষণে ফেরেন নি যখন, হয়তো আরও কিছুটা দেরি হবে ফিরতে।' এক চোখ তেরছা ক'রে সে হীরেনের দিকে তাকায়, মৃদু শিস দেয়।

হীরেন কথা বলতে পারে না, গরম একটা নিশ্বাস ফেললো। 'চলুন।' বেশ বিষণ্ণ গলায় বললো সে একটু পর। 'মীরা সম্পর্কে যদি হাম্বাগটার আরো-কিছু বক্তব্য থাকে শুনে রাখা ভালো।' ভাবলো সে মনে-মনে এবং আর্টিস্টের পশ্চাদনুসরণ করলো।

স্টুডিও বটে !

ঘরের দেয়ালে-দেয়ালে টাঙানো, ইজেলে আটকানো সমাপ্ত অর্ধসমাপ্ত অনেক ছবি। আর্টিস্ট হলদে টিন থেকে সিগারেট তুলে হীরেনকে অফার করলো।

'ওটা কি ?' হীরেন আঙুল দিয়ে একটা ছবি দেখায়। দেয়ালে ঝুলছে।

'ওটাও একটি মেয়ের ছবি।' আর্টিস্ট গম্ভীর গলায় বললো, 'মায়া মিত্তির। যেমনটি দেখেছি এঁকেছি।'

হীরেন স্তম্ভিত। হাত পা চুল ও মুখ বসানো লম্বা একটা থার্মোমিটার।

উদ্ধত লাল রং। আর সিলিণ্ডারের মধ্যে নীল রক্তের শিরার মতো পারদের রেখা এক-শ' দশ ডিগ্রীতে উঠেছে।

'ব্লাড্ টেম্পারেচার।' হীরেনের কানের কাছে মুখ নিয়ে আর্টিস্ট ফিসফিসিয়ে উঠলো, 'স্মার্ট একটি মেয়ের অ্যাম্বিশনের মাত্রা দেখানো হচ্ছে।'

শুনে হীরেন চুপ ক'রে রইলো। ভয় পেল।

বুঝি কোন্ মায়া মিত্তিরকে নিয়ে তৈরি-করা আর-এক স্ক্যাণ্ডাল শোনাবার জন্যে স্কাউণ্ড্রেল ওরকম ছবি এঁকেছে, হীরেন ভাবলো এবং গল্পটা যাতে না শুনতে হয় তাই তাড়াতাড়ি এগিয়ে আর-একটা ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। তিনটে সদ্যফোটা ডালিয়া। তিনটি মেয়ের মুখ।

হীরেন ছবি থেকে মুখ তুলে আর্টিস্টের চোখের দিকে তাকায়। হীরেনের মুখ কালো হ'য়ে গেছে।

'তিন বোন। হেনা মোনা ডায়না।' আর্টিস্ট একটু থেমে পরে বললো, 'কিন্তু এমন সুন্দর মুখ থেকে রাতদিন পোকা ঝরতো, বিষাক্ত কীট। কেননা, বিয়ের পর একদিনের জন্যে কেউ শান্তি পায় নি, আশানুরূপ স্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রাখতে পারছিলো না তাদের স্বামীরা, তাই অহর্নিশি গালাগাল, গোসা, বিদ্রূপের বিষ ঝরছে বোনদের মুখ থেকে, জিভ থেকে।'

ফুলের বুকের পরাগ-কেশরগুলি কুৎসিত পোকার চেহারা নিয়ে কিলবিল করছে। হলদেটে রং, যেন লালার রসে সিক্ত হ'য়ে জ্যাব্জ্যাব্ করছে। হীরেন ছবি থেকে চোখ সরায়। তার কেমন গা-বমি করছিলো।

'এমন সুশ্রী যাদের চেহারা, তাদের ভিতরটা এত বীভৎস আমি

বিশ্বাস করি না।' অস্ফুটে হীরেন এই প্রথম বললো, 'এই সিনিসিজ্‌মের অর্থ হয় না।'

'হয়, মিস্টার চক্রবর্তী, হ'তে হয়েছে।' আর্টিস্ট হীরেনের মুখের সামনে এসে দাঁড়ায়। 'বিলিয়ার্ডের টেবিল থেকে স'রে এসে আই. সি. এস. নীলগোপাল দাশ, আনন্দ চ্যাটার্জি, হারীত সোম ক্লাবের দেয়ালে মাথা ঠুকেছে, কেঁদেছে রোজ সন্ধ্যার পর। আমি দাঁড়িয়ে দেখতাম। দিনের শেষে ঘরে ফিরলে অর্ধাঙ্গিনীদের ভ্রূকুটি ও বিষনিশ্বাসে বেচারাদের তৎক্ষণাৎ ঘরছাড়া ক'রে দিতো, ক্লাবঘরে এসে ঠাঁই নিতো তিনজন।'

হীরেন গম্ভীর।

লোকটাকে হঠাৎ 'হাম্বাগ' ব'লে হীরেন আর উড়িয়ে দিতে পারছিলো না যেন। যেন কোথায় একটা ব্যথা লুকোনো আছে ওর মধ্যে, ওর লালচে চোখে।

ঢোক গিলে, অনেকটা জোর ক'রে হেসে পরে প্রশ্ন করলো, 'আপনি, আপনিই-বা ক্লাবঘরে গিয়ে ওদের সঙ্গে এত আড্ডা দিতেন কেন? তার চেয়ে—'

'যেহেতু আমি শিল্পী, বনের ধারে নদীর কিনারায় সন্ধ্যাটি না কাটিয়ে—' আর্টিস্ট হাসলো, 'কেমন?'

'না, ঠিক তা নয়।' হীরেন নিজেকে সংশোধন করতে চেষ্টা করলো।

'মানুষ কি মানুষের সংসর্গ ছেড়ে থাকতে পারে যত অদ্ভুত উদ্ভট আইডিয়া নিয়ে শিল্পী ঘুরুক না কেন।' কথার মাঝখানে শিল্পী থামলো, মৃদু হাসলো, তারপর যেন চুপিচুপি কথা বলার মতো হীরেনের চোখের দিকে চেয়ে আস্তে বললো, 'চিরকালই কি আর আমি আর্টিস্ট ছিলাম।'

'কি ছিলেন?' হীরেন একটু অবাক।

'ইঞ্জিনীয়ার। ক্রেন বয়লার টিউব কাঁটা-কম্পাসের মানুষ ছিলো এই মৃগাঙ্ক মজুমদার।'

হীরেন আবার আর্টিস্টের আপাদমস্তক দেখলো। লাল স্যালুয়া, ভায়োলেট হাওয়াই, লম্বা বাদামী চুল। আঙুলের মাথাগুলো পুড়ে কালো হ'য়ে গেছে অনবরত সিগারেটের নিকোটিন মেশানো ধোঁয়া লেগে-লেগে। আবার নতুন সিগারেট জ্বললো, হলুদে টিন হীরেনের নাকের সামনে এগিয়ে এলো। ধন্যবাদ জানিয়ে হীরেন 'অফার' প্রত্যাখ্যান করলো। এত কড়া সিগারেট সে সহ্য করতে পারে না, বললো মৃদু গলায়। ইঞ্জিনীয়ার কিছু বললো না।

ঘরটা অস্বাভাবিকরকম নীরব হ'য়ে গেছে।

'সামাজিক, ফুল্‌ফ্লেজেড গৃহী ছিলাম, মিস্টার চক্রবর্তী।' আর্টিস্ট নীরবতা ভাঙলো, 'কাজ সেরে দিনের শেষে ক্লাবে গেছি বিলিয়ার্ড খেলতে, শুধুই খেলার লোভে।'

'তখন বুঝি বন্ধুরা তাদের ঘরের অশান্তিগুলো আপনার কানে ঢালতো?' হীরেন সত্যিকারের দুঃখ-প্রকাশের চেহারা করলো।

'আরে না না,' বাদামী চুলের মধ্যে হাতের আঙুল ডুবিয়ে মজুমদার মন্থর হাসলো, 'তার চেয়েও জোরালো জাঁকালো রসের ঢেউ আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলো কাঁটা-কম্পাস ছেড়ে তুলি ধরবার। কড়া ইনস্‌পিরেশ্যান ছিলো আমারই ঘরে।'

'কি সে, কি তা?' হীরেন বিড়বিড় করলো।

আর্টিস্ট দেয়ালের একটা ছবির দিকে আঙুল বাড়ায়।

হীরেন আবার কেন জানি বোকা হ'য়ে গেল।

অদ্ভুত ছবি। মাথা খারাপ না হ'লে কেউ তা আঁকবে কেন, ছবি দেখতে-দেখতে হীরেন ভাবে। থার্মোমিটার কি ফুল নয়।

অ্যাশট্রে, অ্যাশট্রে থেকে পোড়া-সিগারেটের ধোঁয়া উঠছে, আর সেই ধোঁয়ায় চুল মেলে দিয়ে বুক মেলে দিয়ে চোখ বুজে একটি মেয়ে প্রাণ ভ'রে নিশ্বাস নিচ্ছে। বকের মতো সুন্দর শাদা গলা। 'কে ইনি ?' হীরেন ফিসফিসিয়ে বললো।

'আমার স্ত্রী।' ইঞ্জিনীয়ার রুদ্ধস্বরে জবাব দিলো, 'একজন অ্যাম্বিসাস ওম্যান।'

'কে সিগারেট খেয়েছিলো ?' হীরেন প্রশ্ন করলো, 'কখন ?'

'রাত দশটায় একদিন ক্লাব সেরে বাড়ি ফিরে দেখি ঘরের দরজায় পান্না সিঙ্ঘিয়ার গাড়ি।'

'কে পান্না ?' হীরেন বিড়বিড় ক'রে উঠলো।

'আমার বস্, সিঙ্ঘিয়া মাইকা মাইনের স্বত্বাধিকারী।' ইঞ্জিনীয়ার মোটা-গলায় হাসলো, 'কোডার্মার খনি এলাকার নাম-করা ডিবচ।'

হীরেন চুপ থেকে ঢোক গিললো।

আর্টিস্ট পায়চারি করলো একটু-সময়।

হীরেন ছবি দেখে।

'যেমনটি দেখেছি এঁকেছি।' আর্টিস্ট বলছে, 'কি ক'রে ওই এক টুকরো শরীরে অত অ্যাম্বিশন লুকিয়ে রেখেছিলো তাই ভাবি, ঠিক চার ফুট হাইট ছিলো বডির, মিস্টার চক্রবর্তী।' আর্টিস্ট হীরেনের দিকে মুখ ক'রে ঘুরে দাঁড়ায়। 'আর-আর বন্ধুর স্ত্রীদের মতন 'ডল্' বোকা ছিলো না, অন্য অফিসার-পত্নীদের মতন।'

হীরেন ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে আর্টিস্টের চেহারা দেখে, কথা শোনে।

'আর-আর স্ত্রীর মতো ও আমার অপেক্ষা করে নি, ঝগড়া করে নি স্ট্যাণ্ডার্ডে উঠি নি ব'লে, বাঁকা রাস্তা ছেড়ে বরং নিজেই সোজা পথে এগিয়ে গেছে।'

'কি করেছিলো ?' হীরেন ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করলো।

'আমার বিলেতে যাবার দরখাস্ত স্যাংশন করিয়েছিলো সিন্ধিয়াকে দিয়ে, তারপরেই মাইকা-মাইনের চীফ ইঞ্জিনীয়ার হই আমি, বেতন সোয়া চার-শ' থেকে চোদ্দ-শ'।' ইঞ্জিনীয়ার একনিশ্বাসে বললো।

'তারপর ?' হীরেন রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করলো।

'আই কিক্‌ড হার আউট।' আর্টিস্ট দাঁত কিড়মিড় ক'রে উঠলো, 'আই ওয়াজ টায়ার্ড অব দ্যাট্‌ লিট্‌ল ডল্‌।'

হীরেন হঠাৎ খুব নরম গলায় বললো, 'আমার শরীরটা একটু খারাপ ঠেকছে, আমি ঘরে চললাম মিস্টার মজুমদার।'

'আচ্ছা, আচ্ছা।' আর্টিস্টও শাদা সরল গলায় এবার হাসলো, 'আপনাকে অনেকক্ষণ ধ'রে রেখেছি, মিস্টার চক্রবর্তী।'

'না না, তাতে কি, অনেকগুলো ভালো ছবি দেখা গেল।' হীরেন বিনয়ে গ'লে গেল। 'সময় পেলেই আসবো, আমি তো সারাদিনই বাড়িতে আছি। এসে আপনার ছবি দেখবো।'

প্রতিপক্ষ থেকে আর-কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। চৌকাঠ পার হ'য়ে হীরেন তাড়াতাড়ি করিডরে চ'লে এলো।

ঘড়ির কাঁটা দশটার ঘর পার হয়েছে অনেকক্ষণ। মীরার কেনা নতুন বিগ্‌বেন ঘড়ি টেবিলে বসানো। হীরেন স্থিরচোখে একবার দেখলো।

বস্তুত মীরাকে কোনো প্রশ্ন করবে না, মীরার সঙ্গে কথা বলবে না, হীরেন স্থির করলো। ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়বে কি না হীরেন একবার তা-ও চিন্তা করলো। এমন সময়—

হীরেন দেয়ালের দিকে চোখ ফেরালো। ঘরে ঢুকে মীরা হাতের জিনিসগুলোর কয়েকটা খাটের উপর বাকিগুলো মেঝের ওপর নামিয়ে রাখলো। হীরেন তাকালো না।

মীরা বুঝলো গৃহিণীর বিলম্বে ঘরে ফেরার দরুন গৃহস্বামীর এই চেহারা হয়েছে।

এবং সে নিজেও যতটা সম্ভব কম কথা বলবে বাড়ি ফেরার পথেই ঠিক ক'রে এসেছে। মীরা চুপ।

কিন্তু কথা এক-সময় বলতে হয়।

হীরেন চোখ তুলে দেখলো মীরা মাদ্রাজি ছেড়ে আটপৌরে পরেছে। হাতমুখ ধুয়ে এসে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছচে। খোঁপা খুলে গিয়ে পিঠময় ছড়িয়ে পড়েছে চুল।

'এত দেরি ক'রে ফেরার কারণ কি তোমার?'

চমকে মীরা ঘাড় ফেরালো।

এক চোখ ছোটো ক'রে হীরেন বললো, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

স্বামীর চোখে চোখ রেখে মীরা চাপা উষ্ণ একটা নিশ্বাস ফেললো।

হীরেনের ঠোঁটে চুড়মুড়ে একটুখানি হাসি।

মীরা তা-ও লক্ষ্য করলো।

হীরেন ইজিচেয়ার ছেড়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়। 'অনেক-কিছু কেনাকাটা হয়েছে। কত টাকা কর্জ করলে?'

মীরা নীরব।

টেবিলে ঢাকা-দেওয়া দুটো প্লেট।

মীরা ঢাকনা তুললো। 'এসো খাবে।'

'আমি খাবো কি না ভাবছি।'

'কেন?'

'পেটটা কি রকম—'

মীরার নিশ্বাসপতনের শব্দ হ'লো।

'আমার ওষুধ এনেছিলে ?' যেন ভয়ে-ভয়ে, আস্তে হীরেন একটু পরে প্রশ্ন করলো। 'ভুলে গেছো ?'

গম্ভীর গলায় মীরা বললো, 'তখন বললে দরকার নেই, পেটব্যথা নয় ওটা, ওমনি, —ওষুধ আনা হয় নি।'

'ভালো।' হীরেনের নিশ্বাসপতনের শব্দ হ'লো।

কতকক্ষণের স্তব্ধতা।

'কত টাকা কর্জ করলে ?' হীরেনের গলা।

'এসো।' যেন প্রশ্নটা কানে ঢোকে নি, দুটো কাচের গ্লাসে জল ভ'রে মীরা টেবিলে রাখে, চেয়ার দুটো টেনে আনে। 'সত্যি তুমি খাবে না ?'

'না।' হীরেন সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়ায়। স'রে যায় জানলার কাছে।

বুঝি মীরা নিজের প্লেট টেনে নিয়ে একলা খেতে আরম্ভ করবে। হীরেন ঘাড় ফেরালো।

'অমরেশ কে, তুমি বললে না তো ?'

'আমার বন্ধু।'

'বন্ধু!' হীরেন নির্লিপ্তের মতো মীরার সিঁথির দিকে তাকালো, ঢোক গিললো। 'কিন্তু আগে তো ওর নাম শুনি নি তোমার মুখে।'

'ইউনিভার্সিটিতে পড়তো, তুমিও দেখেছো হয়তো।'

'তা তো কত ছেলেকেই দেখেছি।' হীরেন ভাঙা-গলায় হাসলো। 'কত টাকা দিলে ?'

মীরা চুপ।

'তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে কি না জানতে চাই।'

'উত্তর তো দিয়েই চলেছি।' কঠিন হ'য়ে গেল মীরার মুখাবয়ব। বলতে কি, হীরেনের চোখের দিকে তাকাতে তার কেমন ঘৃণা হচ্ছিলো। তাড়াতাড়ি একটা বড়ো ভাতের গ্রাস তুলে ও মুখে পুরলো।

হীরেন পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে আবার পায়চারি করে।

মীরা নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করলো।

'মালতী কখন গেছে?'

মীরার প্রশ্নের উত্তর দিলে না হীরেন।

'ওর তো অত সকালে চ'লে যাওয়ার কথা নয়।' তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে মীরা বললো, 'কাল ছ-টায় এসে ওর উনুন ধরানো চাই, ন-টার মধ্যে আমাকে বেরোতে হবে।'

'চাকরি করছে ব'লেই যে সকাল-সকাল তোমার কাছে আসবে এবং দেরি ক'রে তোমার বাড়ি থেকে বেরোবে তা মনে কোরো না মীরা, —অবশ্য তুমিও জানো, ও তো তোমারই লোক—লাভার নিয়ে ঘর করছে যখন বেচারা।' খোঁচা দেওয়ার মতো চিকন গলায় হীরেন চিবিয়ে-চিবিয়ে বললো।

'আমার লোক মানে?' মীরা চোখ বড়ো করলো।

'তোমার লোক, তুমি ওকে এনেছো, তার জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তুমি ভালোভাবে জানো।'

'বেশ তো।' মীরা চোখ নামালো। 'ঝি ঝি-ই—টাকা দেবো কাজ করবে—যদি ভালো না লাগে তুমি আর-কাউকে নিযুক্ত করো।'

'আমি যে ঘর থেকে বেরোতে পারছি না, আমি যে পঙ্গু হ'য়ে গেছি, মীরা।' যেন যন্ত্রণায় চিৎকার ক'রে উঠলো হীরেন। মীরার হাত থেকে কাচের গ্লাসটা প'ড়ে গেল মাটিতে, ঝন্ ক'রে শব্দ হয়, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে কাচের গুঁড়ো।

নিচের দিকে তাকিয়ে মীরা সন্তর্পণে পা রাখে।

'তোমার কি ইচ্ছে পরিষ্কার ক'রে বলো না—বেশ তো, আমি কিছুই দেখবো না, কোনো ব্যাপারে নেই, চালাও তুমি। —কী দরকার আমার

লোকের কাছে গিয়ে টাকা ধার করার, বাজার করার—তুমি আছো, তুমি থাকতে—' বলতে-বলতে একটা চোখ ছোটো হ'য়ে গেল মীরার। 'আজ একটু রাত ক'রে ঘরে ফিরেছি, তাই হাজার প্রশ্ন, —কাল, কাল যখন সারাদিন বাইরে কাটিয়ে বাড়ি ফিরবো, জানি না, আমার তো মনে হয় তুমি স্ট্যাণ্ড করতে পারবে না। থামোকা—'

চকচকে চোখে মীরা চেয়ে থাকে।

'কথা বলছো না যে ?'

হীরেন মাথা নিচু করে।

'দরকার নেই আমার চাকরিতে গিয়ে।' একটু পরে কার্পেট থেকে কাচের গুঁড়ো তুলতে-তুলতে মীরা নিজের মনে কথা বললো, 'তুমি কাল —আর দরকারই বা কি লোক রাখার—কাল আমি মালতীকে বরং জবাব দেবো, ঘর থেকে তো আর বেরোচ্ছি না, একলাই সব করবো।'

হীরেন ইজিচেয়ারে ফিরে যায়।

'কিন্তু চাকরি না-ক'রে কি চালাতে পারবে ?' হীরেন বেশ-কিছুক্ষণ পর গলা পরিষ্কার করলো।

'তা আমি জানি না। তোমার চোখে রাতদিন সন্দেহ ঝুলবে আর আমি পশুর মতো খাটবো, এ তুমি কি ক'রে আশা করো ?'

হীরেন নীরব।

আলো নিভিয়ে দিলে মীরা।

সাত

আর-একটি সকাল।

আশ্চর্য প্রশান্তি মীরার চোখে মুখে। অদ্ভুত দৃঢ়তা।

মুখ-হাত ধুয়ে এসেই মীরা শাড়ি বা'র করলো। সেই চোখ-ঝলসানো মেরুন।

'কোথায় চললে?' হীরেন অবাক।

'একটু বেড়িয়ে আসি।' মীরা মুখ তুললো না।

'ও।' অস্ফুট শব্দ বেরুলো হীরেনের ঠোঁট থেকে। মাথা নত ক'রে সে তার শুকনো শীর্ণ হাতের আঙুল দেখলো কতক্ষণ।

'কখন ফিরছো?' মীরার কাপড়-পরা হ'য়ে গেলে হীরেন প্রশ্ন করলো।

'এই তো, একটু বাদে।'

'আমার দুধ?'

'মালতী এসে দেবে।'

যেন হীরেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'লো। রাগারাগির মাথায় আজ এখন থেকেই না মীরা ঝিকে জবাব দিয়ে দেয় সেই আশঙ্কা করছিলো সে।

হীরেনের চেহারায় এবার প্রশান্তি নামলো।

মীরা তখন গালে-মুখে পাউডার ঘসছে।

হীরেন অল্প হেসে বললো, 'তবে তুমি ওই কাজে যাবে না ঠিক করেছো?'

'হ্যাঁ।'

'কি ক'রে চলবে, এতগুলো টাকা বাড়িভাড়া, রেশন, ঝিয়ের মাইনে?' হীরেন মীরার চিবুকের ওপর চোখ রাখে, তখনো অল্প-অল্প হাসছে সে।

'যে-ভাবে চলছে সে-ভাবেই চলবে।' মীরা মুখ না ফিরিয়ে উত্তর করলো। কঠিন গলার স্বর।

'ধার-কর্জ ক'রে ?'

'হ্যাঁ।'

হীরেন নীরব।

'চলি।' হাতে ব্যাগ তুলে নিলে মীরা।

'কখন ফিরবে, কখন ফিরছো, একটু যদি সকাল-সকাল—চা না-খেয়েই বেরুচ্ছো, এটা কেমন।' হীরেন চৌকাঠে দাঁড়ায়।

আর-কোনো কথা বলবে না ব'লেই মীরা ঠিক করেছিলো, কিন্তু না-ব'লে পারলে না। 'সকালে না-গেলে ওকে পাবো না।'

হীরেন, আশ্চর্য, যেন দশ মন বোঝা ওর মুখে কে চাপিয়ে দিয়েছে, জিভ নাড়তে পারলে না, ঠোঁট খুলতে পারলে না।

কি প্রশ্ন সে করতো মীরা জানে। তাই বিষাক্ত একটা হাসির ঝিলিক ঠোঁটে নিয়ে তরতর ক'রে ও নিচে নেমে গেল।

নিশ্চয়ই। চরম বিদ্রোহ বুকে নিয়ে মীরা রাস্তায় নামে। ঘৃণায় দুঃখে তার কেমন জ্বর-জ্বর ঠেকছিলো। মীরা একটা চায়ের দোকানে ঢুকলো। কিছুক্ষণ স্থির হ'য়ে ব'সে সে ভালো ক'রে ভাবতে চায়।

আজই তো শেষ নয়, আজকের পর আবার কাল একটা দিন আসবে। কালকের পর পরশু। হীরেনের এই রোগ সারবে না, কারো কখনো সারে নি।

মীরার চোখের সামনে পুষ্পর ফুলের জীবন ফুটে ওঠে। কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর-কিছু করার নেই, মীরা চোখ বুজে চায়ের কাপে চুমুক দিলে। কিন্তু ভোমরা? মালতী?

যেন হঠাৎ সজীব হ'য়ে ওঠে মীরা। তবু ওদের জীবন ভালো, এক জায়গায় শান্তি আছে, পঙ্গু শিথিল অকর্মণ্য স্বামী ওদের মুখের দিকে চেয়ে নেই, ওদের ফেরার অপেক্ষায় ঘড়ির কাঁটায় চোখ রেখে প্রহর গোনে না। সন্দিগ্ধ নির্ভরশীল পুরুষ।

কি করা, কি করবে। চা খেতে-খেতে মীরার নাক ঘামলো, কপাল ঘামলো। আঃ—একবার মীরার ইচ্ছে হ'লো, কাল যেমন ও তাকে প্রশ্ন করেছিলো, আজ সে তাকে—ভোমরাকে হাতের কাছে পেলে প্রশ্ন করতো, 'আমায় বুদ্ধি দে ভোমরা, এই অবস্থা।'

ভাবতে-ভাবতে মীরা রেস্তঁরার দরজা পার হ'য়ে আবার এসে রাস্তায় দাঁড়ালো। এর মধ্যেই চন্‌চন্ করছে রোদ। মাটি গরম।

হ্যাঁ, টাকা কর্জ করতে বেরিয়েছে ও, টাকা না নিয়ে তো ফিরতে পারে না।

প্রথম বাস দেখেই মীরা হাত তুললো।

নিশ্চয়ই। আর দরজায়-দরজায় নয়, যে-দরজায় তার যাওয়া সাজে, যেখানে আকাশ এখনো অভিমানে নীল হ'য়ে আছে, যে নিঃসঙ্গ ঘরের ছায়ায় ভালোবাসা মৃতবৎসার মতো প'ড়ে আছে, মীরা সেই ঘরের দরজায় টোকা দেবে, হাত পাতবে, 'ওঠো, জাগো,' ব'লে চিৎকার ক'রে সারা দুপুর কাঁদবে। শুধু আজ নয়, কাল, পরশু—এখন থেকে রোজ মীরা অমরেশের কাছ থেকেই টাকা আনবে। এনে হীরেনকে খাওয়াবে। আর-কিছু করার নেই তার—আর-কিছু করতে সে জানে না।

যন্ত্রচালিতের মতো মীরা বাসের পাদানিতে পা বাড়ালো।

•

ঘর থেকে অমরেশ বেরুবার আগে আর-একজন বেরুলো। ভোমরা। অবশ্য অমরেশও সঙ্গে-সঙ্গে পর্দা সরিয়ে বাইরে মুখ বাড়ায়, 'কে, মীরা!'

মীরা নীরব, নিশ্চল।

ভোমরা মীরার দিকে তাকিয়ে পরমুহূর্তেই অমরেশের চোখে চোখ রাখে, 'কই, দাও?'

অমরেশ মৃদু হাসছে।

'আশ্চর্য,' ভোমরার হাতে হাত রেখে অমরেশ বললো, 'তোমার হঠাৎ টাকার অভাব হ'লো? কোডার্মা, কানপুর, দিল্লি, রাঁচির অনেক রাজা-উজীর মেরে তো কলকাতায় এসেছো, নিজেই গল্প করছিলে। আমার মতো গরিবের কাছে শেষে হাত পাততে—'

অমরেশের কথা শেষ হ'তে না দিয়ে ভোমরা তার গালে টোকা দিলে। 'চুপ করো, চুপ করো—সত্যি, লক্ষ্মীটি, অভাব না-হ'লে তোমার কাছে এসেছি! ভয়ানক, খুব বেশি ইচ্ছে করছে একটু ড্রিঙ্ক করি।' ভারি ক্লান্ত শোনালো ভোমরার গলা। 'দাও ক-টা টাকা—মীরা যদি তোমায় একদিন ভালোবাসতো, নিশ্চয়ই অন্তত মনে-মনে হ'লেও তোমায় আমি ভালোবেসেছি—কি, ঠিক কি না মীরা, বল্?'

পিঙ্গল চোখ, প্রশস্ত কাঁধ, কোঁকড়ানো চুল পুরুষের। হাসে অমরেশ।

মীরা স্তব্ধ।

'কিন্তু ওর দরকার বেশি টাকার—ওর স্বামী অসুস্থ।' বলছিলো অমরেশ মীরার দিকে চেয়ে, 'কথা বলছো না মীরা—তুমি তো ভোমরার মতো মদ খেতে আর টাকা চাইছো না, প্রয়োজন।'

কী সাংঘাতিক নির্জন দিন-দুপুরের হ্যারিসন রোডের হোটেল, ভাবছিলো ও মনে-মনে।

আট

ঘড়ির কাঁটায় চোখ হীরেনের। পাথরের মতো স্থির সে।

ছেঁড়া টুপিটা টেবিলের কোনায় রেখে উকিল বিপদবরণ বললো, 'না, যাবে কোথায়—মিসেস ঠিক আসবেন, মোটে তো এখন পৌনে-একটা—আর, আর—' ঘরের চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে উকিল মন্থর গলায় হাসলো। 'এ তুমি আমি—সোসাইটি গার্ল তো আর বিয়ে করি নি আমরা, যে যতিশঙ্করের অবস্থায়—'

'হা—হা—' টেনে-টেনে হীরেনও শুকনো গলায় একটু হাসলো। 'না, ফিরবে ঠিক—আর তেমন তো ঝগড়াঝাঁটি হয় নি, এই এমনি কথা কাটাকাটি মান-অভিমান।'

'ও এমন রোজই হয় আমাদের, দাম্পত্য কলহ—একটু চা-টা খাওয়াও এবার—মিসেসের যদি ফিরতে দেরি হয় তোমার ঝিকে না-হয়—'

'ডাকছি, ডাকছি।' হীরেন ন'ড়ে বসে। ঘাড় ফেরালো, 'মালু, মালতী—'

'এই-যে, নমস্কার।'

হীরেন চমকে মুখ তুললো।

সামনের দরজায় গলা বাড়িয়ে দিয়ে আর্টিস্ট হাসছে। 'কই, আসুন-না, দুটো ভালো ছবি দেখবেন—'

'যাই, যাচ্ছি।' হীরেনের গলা আটকে যায়। হঠাৎ কি-এক আতঙ্কে তার সর্বাঙ্গ হিম হ'য়ে ওঠে।

'কি হ'লো, কি ভাবছো?' বিপদ বন্ধুর গায়ে হাত রাখে। 'কিসের ছবি?' বিপদ পরে প্রশ্ন করলো।

'না না, এই এমনি। ওঁর হাতের আঁকা কয়েকটা নতুন টেকনিকের স্কেচ, স্কেচই তো ওগুলো, আপনি কি বলেন ?' হীরেন আর্টিস্টের দিকে তাকালো না যদিও, উকিল-বন্ধুর ভুরুর দিকে চোখ রেখে যতটা পারলো চেহারা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলো। 'ভয়ানক ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যাল জিনিস, তুমি হয়তো, তুমি হয়তো তেমন—'

'বুঝবে না।' মাথা নেড়ে বিপদ বন্ধুর বাক্য সম্পূর্ণ করলো এবং গলা ঝেড়ে হাসলো।

'এত ইতস্তত বোধ করার কি আছে, আমি ব্রাদার তোমাদের ওই ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যাল ছবি আর আধুনিক কবিতা সত্যি বুঝি না, অবশ্য বুঝতে চেষ্টাও করি না। আপনি কিছু মনে করবেন না, শিল্পী।' পুরু-ঠোঁট বিপদবরণ হীরেনের মাথার ওপর দিয়ে শিল্পীকে দেখলো। 'বন্ধু জানে ছেলেবেলা থেকেই মোটা জিনিসের দিকে আমার ঝোঁক বেশি, ঝুঁকি বেশি—'

'যেমন ?' আর্টিস্ট চুপ, হীরেন হাসবার চেষ্টা ক'রে বললো, 'খাওয়া, ঘুম, খেলাধুলো ?'

'তা ছাড়া কি। পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকই তো তা চাইছে। নয় কি ?'

'সুতরাং মেজরিটি যখন তোমার দিকে, আধুনিক ছবি কবিতা বুঝতে চেষ্টা না-করার জন্য আমরাও তোমাকে দোষ দেবো না। বরং তুমি ততক্ষণ ব'সে গরম চা সিঙাড়া খাও। মালতী, বাবুকে চা ক'রে দাও।' হীরেন উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে কটাক্ষপাত করলো। তারপর আর্টিস্টের চোখে চোখ রেখে আস্তে বললো, 'চলুন।'

মৃগাঙ্ক মজুমদার কথা কইলো না।

লালচে চোখের দীর্ঘ পল্লব একবার মুদ্রিত করলো। জুতো দিয়ে

মেঝেয় সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরোটা চেপে ধ'রে বাইরের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।

'সত্যি ব্রাদার।' হীরেন ঘর ছেড়ে যেতে-যেতে বন্ধুকে বললো, যেন উকিলকে বুঝিয়ে গেল, 'ও-সব ছবি বুঝতে না-চাওয়া দেখতে না-যাওয়া একটা আশীর্বাদের মতন, কী যে পেন্‌ফুল ওগুলো দেখা, তা··· তা···' হীরেনের কথা করিডরে মিলিয়ে গেল।

ঠোঁট তেরছা ক'রে বিপদবরণ নিজের মনে হাসলো। 'কে বলেছে সাধ ক'রে এই যন্ত্রণা পোহাতে। নিজের হাতে মগজে পেরেক ঠোকা আর ওই ছাইভস্মগুলো বুঝতে যাওয়ার মধ্যে তফাৎ কিছুই নেই।' উকিল মনে-মনে বললো। 'হাম্বাগটার খপ্পরে পড়েছে হীরেন। ফ্যামিলি ছাড়া এই কোয়ার্টারে আছে। অভদ্র। হীরুর মন ভিজিয়ে-ভিজিয়ে কোনোদিন ব্যাটা ব'লে বসবে, 'কই তোমার বৌকে এবার আনো, আমার ছবির মডেল হবে।' ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যাল ছবি না কচুপোড়া। নিশ্চয় ন্যাংটা মেয়েমানুষের কতকগুলো ছবি এঁকে রেখেছে শালা। আজকাল যে যত বেশি কায়দা ক'রে রেখায় রঙে মেয়েদের বুক আর উরু আর পিছনটা আঁকতে পারছে সেই তো তত আধুনিক হচ্ছে। সেদিন বার-লাইব্রেরিতে ব'সে হরপ্রসাদ গাঙুলি কি এই কথাই বলছিলো না!'

বিপদের মনে পড়লো, হরপ্রসাদ একটা আমেরিকান জার্নাল উল্টে সবাইকে নামজাদা কোনো আর্টিস্টের আঁকা ছবি দেখাচ্ছিলো। স্যুর্‌-রিয়্যালিজম, ন্যুডিজম ইত্যাদি। ভাসা-ভাসা দু-একটা কথা মনে আছে তার, বন্ধুরা ছবির ওপর আঙুল রেখে বলাবলি করছিলো। বিপদের মাথা ঘুরছিলো। আধুনিক ছবির নামে এখন আবার তার মাথা ধরেছে। তাই দু-জন আর্ট-রসিক ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে ঘোঁৎ ক'রে নাকের একটা শব্দ করলো সে। যেন সেই শব্দের সঙ্গে মাথার ভিতরের

খানিকটা গরম হাওয়া বা'র ক'রে দিয়ে উকিল কিছুটা হালকা বোধ করলো।

মালতী চা নিয়ে এলো। চা ও চিঁড়েভাজা।

বিপদ একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখলো, খোঁপা থেকে ঝুলে-পড়া খয়েরি টাসেল দাসীর। তন্বীভাব।

আধুনিক মনিবানীর আধুনিক ঝি।

'ঘিয়ে ভেজে এনেছো দেখছি।' চিঁড়ের দিকে না তাকিয়ে উকিল মালতীর মুখের দিকে চোখ ধ'রে রাখলো। 'বেশ মুড়মুড়ে হয়েছে।'

'মুখে না ঠেকিয়ে কি ক'রে বুঝলেন মুড়মুড়ে হয়েছে কি স্যাঁতসেঁতে হ'য়ে আছে।'

'ও দেখলেই বোঝা যায়।' বিপদ এবার চিঁড়ের দিকে তাকিয়ে হাসে। তারপর আবার ঝিয়ের চোখের দিকে তাকায়। 'গন্ধে টের পাওয়া যায়। নয় কি ?'

'তাই দাদাবাবুর উকিল-বন্ধু চালাক-রসিক চোখ দিয়ে দেখে নাক দিয়ে শুঁখেই ব'লে দেন শক্ত কি নরম, ঝুনো কি চটচটে। আমাদের কপাল মন্দ। অদেষ্ট খারাপ। তাই। না-হ'লে কি আর···' থুঁত্নি শূন্যে তুলে ঝি লম্বা উদাস ভঙ্গিতে দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

'কি হ'লো ?' বিপদ চারদিকটা একবার দেখে চাপা-গলায় হাসলো, 'দাঁতে না ঠেকিয়ে মন্তব্য করছি ব'লে আফসোস হয়, দুঃখ হয় নাকি ?' গলা বাড়িয়ে সে প্রশ্ন করছিলো।

'না, দাঁতে ঠেকাবার অনেক বাকি।' এবার মালতী চোখ শানালো। 'এই আক্কেল নিয়ে আর মেয়েমানষের মন পেতে হয় না। ছি-ছি, কি ঝক্কি গো কি ঝক্কি ! পুজোর পর থেকে এই নিয়ে তিন দিন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'লো। আট আনার পয়সা হাত দিয়ে গললো না, গলছে না।'

'নাও মালতী, তোমাকে—আচ্ছা পুজোটা না-হয় ফাঁকি দিয়েছি, এই কালিপুজো কি নক্কিপুজোর বখশিসটা দিলুম।'

বিপদবরণ চুপ ক'রে গেল।

'কি?' মালতীর ঝকঝকে চোখের প্রচ্ছন্ন হাসি চোখা বিদ্রূপ উকিলকে এবার বিঁধছিলো। 'চিঁড়ে ভিজে জল হ'য়ে গেল নাকি? কথা নেই কেন?'

লজ্জার অথই জলে প'ড়ে উকিল হাবুডুবু খায়। 'আমার মনে থাকে না, সত্যি মনে থাকে না, নেক্সট টাইম যখন এ-বাড়ি আসবো—ছি-ছি, সামান্য একটা বখশিস, বলো কি।'

'না, থাকগে।' যেন কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে মালতীরও কেমন-কেমন ঠেকছিলো, 'আমি পয়সা দিয়ে কি করবো। আমার পয়সা খায় কে। আমি কা'কে দিয়ে রেখে মরবো। রেখে দিন আপনার পকেটে ওটা। মশায়ের দু-দিনের বাজারখরচ চলবে। আপনার বাচ্চার দুধের দাম দিতে পারবেন। চুল ছাঁটাতে পারবেন, কাপড়জামা ধোপাখানায় দিতে পারবেন, জুতোটা সেলাই করাতে, বিড়ি খেয়ে-খেয়ে গলাটা ঝাঁজরা হ'য়ে যাচ্ছে—দু-এক প্যাকেট সিগারেট খেতে, কেবল পায়ে হেঁটে ফুটপাতে ঘ'সে জুতোটা ক্ষইয়ে ফেলেছেন—ট্র্যাম-বাসে দিনে অন্তত এক-আধবার ওঠা যাবে। অনেক কাজে লাগবে। রেখে দিন, রেখে দিন দাদাবাবু আপনার বখশিস পকেটে।' ব'লে প্রায় শিস দেওয়ার মতো নিশ্বাসের শব্দ ক'রে বকুলগন্ধী খোঁপাটা বাঁ-হাতের ঝাপ্‌টায় চকিতে নাড়া দিয়ে কক্ষ থেকে মালতী যখন নিষ্ক্রান্ত হয় তখন বিপদ আর বিপদের মধ্যে থাকে না।

ট্র্যামে ওঠা জুতো সেলাইয়ের কথাটা মেয়েটার মুখে, অবশ্য রহস্যচ্ছলেই, আরো-একদিন সে শুনেছে।

'এটা অপমান করা ছাড়া আর কি।' বিপদ চায়ে চুমুক দিয়ে চিঁড়ে চিবোতে-চিবোতে ভাবলো। 'নিজে খুব ফিটফাট কলেজী মেয়ের মতো সেজেগুজে থাকতে পারছে, আর, একজন উকিলের এই বেশ। এর জন্যই অহংকার।'

বিপদ চিঁড়ে চিবোতে গিয়ে রাগে দাঁতে দাঁত ঘসলো। 'ভ্রষ্টা, বেশ্যা।' যেন বিপদ একলা নির্জন ঘরের দেওয়ালগুলোর দিকে তর্জনি তুলে বক্তৃতা করলো, 'তুই অসৎ। অসৎ পথে যদি চলতো তো বিপদের আজ এই অবস্থায় থাকতে হ'ত নাকি। গাড়ি করতো বাড়ি করতো সেও। কিন্তু নীতিভ্রষ্ট হয় নি। তা ছাড়া সে পুরুষ। কোনো প্রশ্নই উঠবে না কি ক'রে পয়সা করেছে। তোর? কিসের জোরে এই অহংকার, এত গরম কেন! বাসন মেজে কত রোজগার করিস, ক-টাকা দেন মীরা চক্কোত্তি!'

'কেউটে সাপ!' চা শেষ ক'রে হীরেনের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ধরাতে-ধরাতে উকিল এ-বাড়ির ঝিটাকে আরো বেশ-খানিকটা গালাগাল করলো মনে-মনে। 'সাহস, কথার ধার কত! বখশিস তোমার পকেটে রেখে দাও! আরে, আরে তুই যে-সব বাবুর বখশিস খেয়ে তাদের গা চেটে পা চেটে গা তেলতেলে করেছিস, ফর্সা হচ্ছিস দিনকে দিন, সে-সব বাবুদের তো আর জানতে বাকি নেই উকিলের।'

'সব স্কাউণ্ড্রেলের দল! চোর, ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার! দেশটা ওরাই তো ডুবিয়েছে, আর ওদের পয়সার জোরেই দেশ ভ'রে পৃথিবী জুড়ে সব দুর্নীতি মাথা তুলেছে।'

সেজন্যেই ভালো মানুষ বিপদ, বিপদের দল ডুবতে বসেছে। এত গরম ঝিয়ের এক্সট্রা ইন্‌কাম আছে ব'লে। স্বামী ছেড়ে একটা সিনেমা-কোম্পানির ছেলের সঙ্গে আছে মেয়েটা। বিপদ শুনেছে বৈকি।

সেদিন পঙ্কজ রায় বার-লাইব্রেরিতে হীরেনের বাসার এই ঝি-টি সম্পর্কে একটা মন্তব্য করেছিলো। মনে আছে বিপদের। কি স্থত্রে পঙ্কজ হীরেনের পিসতুতো ভাই।

সুতরাং স্থবিধা পেলে বিপদ মাগীকে অপমান করতে ছাড়বে না, মনে-মনে ঠিক করলো। 'কেউটে সাপ!' হিস্‌হিস্‌ ক'রে মালতীকে গালাগাল দিতে-দিতে সিগারেটটাকে প্রায় শেষ ক'রে এনে স্তিমিত ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে ম্রিয়মাণ নিস্তেজ চোখে তাকিয়ে-তাকিয়ে বিপদ একটা কথা ভাবছিলো, 'ভিতরটা ভয়ানক রাফ্‌—কিন্তু বাইরেটা! কে বলবে মালতী চাকরানী! অদ্ভুত চেহারা, আর এমন ফিটফাট থাকে! দেখে হঠাৎ মনেই হয় না যে—'

ঠিক কা'র সঙ্গে কিসের তুলনা দিলে মালতীকে ভালো মানাবে মনে-মনে ঠিক করতে-করতে, মালতীর দেহের অগাধ সৌন্দর্যের সঙ্গে তার বৃত্তি ও স্বভাবের এতটা পার্থক্য ও দূরত্বের হিসাব বা'র করতে-করতে স্থূলমস্তিষ্ক ভোজনবিলাসী বিপদ এ-ঘরে যখন একলা চুপচাপ ব'সে মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলো তখন তার চোখমুখের অবস্থা দেখে কে না বলবে যে বিপদও কম বড়ো আর্ট-রসিক নয়।

এবার ও-ঘরে উঁকি দেওয়া যাক।

প্রথম নজরেই বোঝা গেল সেখানে আর ঠিক ছবির মাধ্যমে আলোচনাটা না-হ'য়ে দু-জন দুটো চেয়ারে মুখোমুখি ব'সে কথা হচ্ছে।

হীরেন গম্ভীর।

আর্টিস্ট শেষ সিগারেটের নিভন্ত টুকরোটা জুতো দিয়ে মাড়িয়ে মেঝের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে। তারপর খালি সিগারেটের টিনটার ওপর

আঙুল ঠুকে-ঠুকে ডুগডুগি বাজাতে লাগলো। এই আঙুলে তুলি ধরে! হীরেন ভাবলো।

'না, অবশ্য যদি বলেন লেখাপড়া করা দরকার আমি তা-ও করবো। রিয়েলি বলছি। সামনের মাসের গোড়ায় আপনার টাকাটা শোধ করতে পারবো। দেখি যদি রিস্টওয়াচটা বিক্রি করতে পারি।'

হীরেন নিজের হাতঘড়ি দেখলো।

'এ-সব আঁকাআঁকি করছেন কেন? সময় নষ্ট। সাময়িক উত্তেজনা। একজন খারাপ হয়েছে ব'লে আপনি অ্যাব্‌নর্মাল থাকবেন কেন। চাকরিতে ফিরে যান। এ-সব ছবি—আমি মেনে নিচ্ছি যে আজ যে-বেদনাবোধ জেগেছিলো তা-ই প্রেরণা দিয়েছে আঁকতে। এভাবে পৃথিবীতে অনেক প্রতিভার বিকাশ হয়েছে। তবু তো, তা ছাড়া এই শহরে আর-কিছু না-ক'রে, খেয়ে এবং এত টাকা ঘরভাড়া দিয়ে কেউ এতকাল থাকতে পারে নি।' কথাগুলি না-ব'লে পারলে না হীরেন। এ-ঘরে ঢুকে আজ ছবিগুলির বিক্রি সম্বন্ধে হঠাৎ সন্দেহ হয়েছিলো তার। এবং এইমাত্র এত সব আর্ট-আলোচনার পর আর্টিস্ট ঝুপ্‌ ক'রে তার কাছে পঞ্চাশ টাকা ধারের প্রস্তাব দিতে হীরেন বেশ অস্বস্তি বোধ করলো, বিরক্ত হ'লো একটু। ধার। না কি এই জন্যেই এত ভূমিকা। বলে কিনা হীরেনেরই এখন এমন টানাটানি চলছে। যেন অসৌজন্যতার পালিশ দিতে পরক্ষণেই হীরেন বললো, 'তা ছাড়া আমার কাছে তো টাকাকড়ি কিছু থাকে না। সব মীরা। মীরাই দেখছেন, করছেন। হাসপাতাল থেকে পঙ্গু হ'য়ে ফেরার পর থেকে সংসারের সব ভার নিয়েছেন উনি।' কথা শেষ ক'রে হীরেন মৃদু হাসলো।

আর্টিস্ট শুকনো একটা তুলি বুলিয়ে ইজেলের ওপর কাল্পনিক ছবি আঁকছিলো।

'আচ্ছা, তা হ'লে আমি উঠি এখন, চলি আজ—বন্ধু ব'সে আছে।' ব'লে হীরেন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো।

এ-ঘরে শূন্য প্লেট আর চা-এর পেয়ালার ওপর দুই পা তুলে দিয়ে বিপদ গভীর চিন্তামগ্ন। যেন চোখ দিয়ে সীলিং জরিপ করছে। কপালে কুঞ্চন।

হীরেন ঘরে ঢুকতে বিপদ চোখ নামালো। 'দেখে এলে ছবি?'

'টাকা কর্জ চাইছে।' হীরেন ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিলে।

'কস্মিন্‌কালেও ওই কর্ম কোরো না ব্রাদার, দিয়েছো কি মরেছো। ইহজন্মে ফেরত পাবে না। আমি দেখেই বুঝেছি একেবারে ভেরণ্ড-ভাজা আর্টিস্ট। একটা ছবি ওর সাত বছরে বিক্রি হয়?'

হীরেন চুপ ক'রে রইলো।

বিপদ মুখ বিকৃত ক'রে বললো, 'আরে সব শালাই মডার্ন ছবি আঁকে, মডার্ন লেখে—বলি আগে তো বাস্তব দেখ্, তোর চারপাশে কি সব জিনিস আছে মোটা তুলির টানে সেগুলো ভালো ক'রে ফুটিয়ে তোল্। ছবি বিক্রি হয় না তখন কেমন দেখি। তুইও খেয়ে বাঁচবি। কেবল ছাইভস্ম আঁকলেই হ'লো না।'

হীরেন এবার না-হেসে পারলো না। 'তুমিও যে একজন মস্ত বড়ো আর্টক্রিটিক হ'য়ে গেলে উকিল—ব্যাপার কি?'

উকিল তৎক্ষণাৎ উত্তর করলে না। কুমারী-মীরার ফটোর দিকে একটু তাকিয়ে থেকে পরে অল্প হেসে বললো, 'অ্যাটমস্‌ফিয়ার, পরিবেশ তা ক'রে দেয় ব্রাদার। বেশ তো, ছবি আঁকবে তো এই মডেল আঁকুক। এর তুলনা আছে নাকি। সাধারণ অথচ সুন্দর।'

হীরেন ভুল করলো।

'তিনি তো সুন্দর, খুবই পার্ফেক্ট চেহারা। কিন্তু—কিন্তু আমি কি উল্লুকটাকে গিয়ে বলবো তুই মীরা দেবীর ছবি আঁক, এঁকে বাজারে বিক্রি ক'রে অন্নসংস্থান কর্? ব্রাদার, আছো বেশ।'

উকিল ময়লা রুমাল দিয়ে কপাল মুছলো। 'এ-সব বাজে ঝোঁক আমার নেই। তা হ'লে তো শোভার মাকেও গিয়ে বলতে পারি, কাপড়চোপড় প'রে তৈরি হও, তোমার ছবি আঁকা হবে এবার, বাজারে বিকোবে। তাই কি না? কী আমার আর্টিস্ট রে!'

হীরেন চুপ ক'রে রইলো।

শোভা উকিলের বড়ো সন্তান।

বিপদ গলাটাকে আরো খসখসে ক'রে তুললো, মাথাটা নোয়ালে। হীরেনের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, 'গিন্নি তোমার সুন্দরী এবং খুবই মডার্ন। সে-কথা নয়। ভারি চমৎকার একটি মেয়ে জুটিয়েছো ভায়া। যাই বলো একেবারে আল্ট্রা মডার্ন! দাও-না ব'লে ও-ঘরের গর্দভটাকে, মালতীর মুখখানা তুলির টানে ফুটিয়ে তুলুক। আরে, ঝি হ'লে হবে কি, ঝিয়ের মধ্যে বুঝি বিউটি নেই? কি বলো?'

একটু-সময় ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হীরেন মৃদু হাসলো।

'না, যাই বলো ব্রাদার, অদ্ভুত ওর নাক চোখ এবং বডির শেপ্। একটা ছন্দ একটা বিভঙ্গময়ী ভাব আছে তোমাদের এই মালতীর মধ্যে। ঝি চাকর মালী মেথর ধাঙড় রিক্সাওয়ালাদের আমরা এড়িয়ে চলছি, দূরে সরিয়ে রাখছি, তাই আর্টেরও উন্নতি নেই। নেচার ফুটছে না, আড়ষ্টতা থেকে যাচ্ছে শিল্পে সাহিত্যে সংগীতে। মিথ্যে বলছি?'

'আইডিয়াটা তোমার মাথায় মন্দ আসে নি।' উকিলের সামনে

টেবিলে চা-জলখাবারের শূন্য বাসনগুলো দেখতে-দেখতে হীরেন বললো, 'বেশ, মৃগাঙ্ক মজুমদারকে আমি এখুনি ডেকে ব'লে দিচ্ছি। আঁকার ভালো মালমশলা তোমার হাতের কাছে রয়েছে। খামোকা কেন উপোস থাকছো, উকিল-বন্ধুর এই সাজেশ্‌ন।'

'হেঁ হেঁ।' খুশি হ'য়ে উকিল ঘাড় নাড়লো। 'কিন্তু শালা কি আঁকবে। ও-সবের দিকে একেবারে নজর নেই। আঁকবে যত—' এবার আর চাপা-গলায় না, গলা চড়িয়ে বললো, 'আঁকবে কলেজী মেয়ের মুখ, আই. সি. এস-এর স্ত্রীর খোঁপা! সব কৃত্রিম, সব ভেজাল। ছবি বিক্রি হবে না আমড়া বিকোবে! সাধারণকে আঁকো, তবেই নাম, তবেই অর্থ।'

হীরেন একটা বড়ো রকমের হাসি গলাধঃকরণ ক'রে তাড়াতাড়ি বললো, 'আর-একটু চা খাবে কি, ডাকবো মালতীকে?'

হীরেন কথাটা বেশ জোরেই বললো, ব'লে চুপ ক'রে রইলো। উকিল সতৃষ্ণ চোখে পিছনের দরজাটার দিকে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে পরে বললো, 'না, আর না, খেয়েছি একবার চা। খাওয়া যেমন-তেমন, অসময়ে চা করার হাঙ্গামাটা কম না।' ব'লে টুপিটা হাতে নিয়ে আবার এমন কাতরচোখে বিপদ পিছনের দরজার দিকে তাকালো যে দেখে হীরেন ভাবলো, কে বলবে এই বিপদবরণ একটু আগে রেশনের চিন্তা করছিলো, বাচ্চার দুধের দেনা শোধ করার ভাবনায় সে অস্থির।

দেখা গেল, আর্ট রাজনীতি সমাজনীতি সব-কিছু নিয়ে বক্তৃতা করার ক্ষমতা রাখে উকিল। না-হ'লে আর উকিল! 'ঝি চাকর ব'লে কথায়-কথায় ওদের চাপ দেওয়াটা আমি পছন্দ করি না। ততটা রিফর্মড্ আমরা হ'য়ে গেছি বৈকি। তাদের আমরা কাছে রাখবো, কাছে ডাকবো, কি বলো? ওখানেই সাম্য, সোশ্যালিজ্‌ম।'

হীরেন ঘাড় নেড়ে বললো, 'নিশ্চয়।'

'যাকগে, তুমি ব্যাটাকে এক-পয়সা ধার দিও না।' বৈষয়িক উকিল দ্বিতীয়বার বন্ধুকে সতর্ক ক'রে দিয়ে বললো, 'চলি, চললাম আজ।'

হীরেন বিপদকে আর বসতে বললো না।

'এঃ হেঃ, দুটো বেজে গেল, আমার রেশনকার্ডগুলো আজ আর জমা দিতে পারলাম না।' চৌকাঠের বাইরে গিয়ে বিপদ বললো, 'কিন্তু দুঃখ থেকে গেল এতটা সময় ওয়েট্ ক'রেও মিসেসের সঙ্গে দেখা হ'লো না, হীরেন। কখন ফিরবেন, কখন ফিরছেন ভার্যা?'

হীরেন এ-প্রশ্নের উত্তর দিলে না। বিপদ চ'লে যেতে একবার হাত-ঘড়িটা দেখলো। দুটো দশ। ঘড়ি থেকে চোখ তুলতে দেখলো ঘরে মালতী ঢুকছে। পেয়ালা প্লেট সরিয়ে নিতে এসেছে। পেয়ালা পিরিচের টুং-টাং আওয়াজের চেয়েও সুন্দর মিঠে গলায় হাসলো মালতী, তারপর অভিযোগের সুরে বললো, 'এমন অসভ্যের মতো মুখের দিকে তাকায় ভদ্রলোক! উকিল না আদালতের কমবেতনী চাপরাসী, ওই রকম নজর।'

হীরেন গম্ভীর হ'য়ে রইলো।

আর-কিছু বলতে সাহস না-পেয়ে মালতী শূন্য বাসনগুলো তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আলস্য দূর করতে হীরেন একটা সিগারেট ধরায়।

নয়

অবশ্য ভোমরাকেই আগে টাকা দিলে অমরেশ। দিয়ে হাসলো। মীরাকে বললো, 'প্রয়োজনের চেয়ে দুঃখের দাবি আগে, এটা অস্বীকার করতে পারো না।' ভোমরাও মীরার দিকে চেয়ে অল্প-অল্প হাসছিলো। টাকা নিয়ে ভোমরা চ'লে গেল।

অমরেশ মীরার চোখের দিকে তাকিয়ে এবার কি যেন ভাবছিলো। একটু পরে সে আবার বললো, 'তুমি টাকা চাইছো সেবার মন নিয়ে, ওর স্বপ্ন এখন সংহারের। সত্যি, কী ট্র্যাজেডি মানুষের জীবনে আসে, দেখো।'

অমরেশ দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'মদ খাচ্ছে, আর জাহান্নমের কথা ভাবছে।'

'আমি জানতাম শেষ পর্যন্ত ওইরকম হ'য়ে যাবে।' মীরা দীর্ঘশ্বাস ফেললো না, বরং একটু কাটা-গলায় বললো, 'এ-ভাবে এত সেন্টিমেণ্টাল মেয়ে স্বাভাবিক থাকতে পারে না। নয় তো সুইসাইড করতো, কি বদ্ধ পাগল হ'য়ে যেত। একটা-কিছু করতেই হ'ত ওকে।'

অমরেশ চমকে মীরার চোখের দিকে তাকালো। অর্থাৎ, আবেগের ক্ষেত্রে কণ্ঠস্বর ওর অস্বাভাবিক ধারালো হ'য়ে যেতে অমরেশ কেমন অবাক হ'লো। 'সত্যি, বিয়ে জিনিসটার ওপর দিন-দিন আমার অশ্রদ্ধা কেবলই বাড়ছে, মীরা। বিশেষ তোমাদের লভ্-ম্যারেজ। উঃ, এ আমি ভাবতেই পারি না। তেলে জলে কখনো মিশ খায়? বলো, খায় কি না? বিয়ে ও প্রেম সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস, আমার তো তাই মনে হয়।' অমরেশ মীরার হাত ধ'রে মৃদু ঝাঁকুনি দিলে।

মীরা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, 'যাকগে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভোমরার

কথা ভেবে লাভ নেই। আর, তুমি—যা করো নি, যা হয় নি তোমার জীবনে আজও, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কূলকিনারা পাবে না কিছু। এককালে ভোমরা ভালোবেসেছিলো, এককালে ভোমরার বিয়ে হয়েছিলো। তা তো হচ্ছেই, করছে কেউ-কেউ, কিন্তু তা থেকে তুমি কি সিদ্ধান্ত টানছো?' মীরার মুখাবয়ব আরো কঠিন হ'য়ে গেল।

অমরেশ তেমনি চুপ ক'রে।

'এসো, তোমার ঘরে।' মীরা অমরেশের হাত ধ'রে তার ঘরে গিয়ে ঢোকে।

একটু আগে ভোমরা চা ও খাবার খেয়ে গেছে। শূন্য ঠোঙা ও একটা কাপ অমরেশের খাটের একধারে প'ড়ে ছিলো। অমরেশ সেগুলোকে নামিয়ে মেঝের ওপর রাখে, তারপর পা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেয় খাটের নিচে।

'তোমায় চা আনিয়ে দিই?' অমরেশ জিজ্ঞাসু চোখে মীরাকে দেখে।

'না।' অমরেশের আয়না তুলে মীরা নিজের মুখ দেখে।

অমরেশ বললো, 'সত্যি, বিয়ের পর তুমি ঢের সুন্দর হয়েছো, অদ্ভুত ভালো লাগছে দেখতে।'

'কতবার বলবে।' আয়নায় আর-একবার নিজেকে দেখে মীরা সেটা হাত থেকে নামিয়ে, আগে টেবিলের জঞ্জালের ওপর শোয়ানো ছিলো এখন আলাদা জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখলো। এবার আয়নায় অমরেশও ফুটলো। পাশে মীরা।

চেয়ারটা খাটের সঙ্গে ঠেকানো ছিলো। টেবিলের কাছে সেটাকে সরিয়ে দিতে-দিতে মীরা বললো, 'ভোমরা কতক্ষণ ছিলো?'

'এই ঘণ্টাখানেক।'

'এখানে ও থাকে কোথায়, জিজ্ঞেস করেছিলে?'

'না।' মীরার চোখে চোখ রেখে অমরেশ মাথা নাড়লো। 'আমি কিছু জিজ্ঞেস করি নি। ও শুধু ব'লে গেল ওর গল্প।'

পিঙ্গল চোখ, প্রশস্ত কাঁধ নড়ছিলো অমরেশের। যেন সবটা শরীরই নড়ছিলো ওর আবেগে।

এই 'না'-কে মীরা অবজ্ঞা করতে পারলো না। তাই, যেন হঠাৎ অতি সুস্থির হ'য়ে খাটের ওপর পা তুলে বসলো।

'কই, তোমার পাখা কোথায় ?'

আরও ঠাণ্ডা পাবার আশায় মীরা স্বইচবোর্ডের দিকে হাত বাড়াতে গেল, আর তার আগেই অমরেশ হাত বাড়িয়ে স্বইচ টিপে পাখা ঘুরিয়ে দিলে। দিয়ে নুয়ে প্রশ্ন করলো, 'খুব রোদে পুড়ে এসেছো মনে হয় ?'

'হ্যাঁ, খানিকটা রাস্তা হাঁটতে হয়েছে বৈকি।'

'আমি আশা করছিলাম আজ তুমি আসতেও পারো।' অমরেশ সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়।

'কখন ?' চোখ বড়ো করে মীরা।

'এই, ভোমরা আসার আগে।'

মীরা চোখ নামালো। অমরেশ নিঃশব্দে হাসলো।

'মিস্টার চক্রবর্তী আছেন কেমন ?' সিগারেট ধরিয়ে অমরেশ পরে বললো, 'পাখাটা আর-একটু বাড়িয়ে দিই ?' রুদ্ধস্বরে অমরেশ প্রশ্ন করলো কি দেশলাইয়ের বারুদ জ্বালার শব্দ হ'লো হঠাৎ পাখা জোরে চলার দরুন তা বোঝা গেল না।

'তোমায় আমি একটা কথা বলি, মনে রেখো।' অমরেশ সিগারেটে টান দিয়ে বললো।

'কি ?' ঠিক অবাকও না, উৎসুকও না—এমনি একটুক্ষণ অমরেশের

চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে মীরা পরে ছোট্ট একটা ঢোঁক গিলে বললো, 'কি মনে রাখার কথা বলছো ?'

'টাকার দরকার হ'লে চুপ ক'রে থেকো না। চক্রবর্তীকে কাল ইনজেক্‌শন দেওয়া হয়েছিলো ?' অমরেশ মীরার হাত ধরলো। ঘাড় নাড়লো মীরা, 'হয়েছিলো।'

অমরেশের হাতে হাত রেখে মীরা বললো, 'তা লজ্জা করলে আজ আবার এই দুপুর রোদ্দুরে তোমার কাছে ছুটে আসতুম কি ?'

মীরা খাটের ওপর অমরেশের পরিত্যক্ত অর্ধমলিন একটা রুমালের ওপর আঁচড় কাটতে লাগলো। ওর পাতলা মাজাঘসা নোখে থেকে-থেকে রক্তের আভা খেলছিলো। যেন তাই মনোযোগ দিয়ে দেখতে-দেখতে অমরেশ প্রশ্ন করলো, 'কি জিজ্ঞেস করছিলে তখন, ভোমরার কথায় ? সিদ্ধান্ত ! কোন্ সিদ্ধান্ত, কা'র সিদ্ধান্ত ?'

'যে তুমি কাউকে কোনোদিন বিয়ে করবে না।'

মীরার কথায় অমরেশ হঠাৎ অত্যধিক জোরে হেসে উঠলো। শব্দটা এ-ঘরে ও-ঘরে প্রতিধ্বনিত হ'লো কতক্ষণ।

মীরা দুই আঙুল দিয়ে কানের ছিদ্র ঢাকলো, একটু পরে হাত নামিয়ে ফিসফিসিয়ে হাসলো, 'আশ্চর্য ! আমি বাইরে থেকে একটি মেয়ে এসেছি তোমার ঘরে, হাজার হোক হোটেল তো, করছো কি ?'

'ভুলেই ছিলাম, মীরা।' অমরেশ সংযত হ'লো খানিকটা। 'তা কেউ নেই, এ-সময়ে কেই-বা ঘরে ব'সে থাকে—আমার মতো নিষ্কর্মা ঢেঁকি নয় যে—'

মীরা কথা কইলো না।

অমরেশ মীরার ভুরুর দিকে চোখ রেখে স্থির হ'য়ে রইলো।

'না, আমি বলছিলাম ওর বিয়ের কথা।' আস্তে-আস্তে অমরেশ

বললো, 'সাততাড়াতাড়ি বিয়ে করতে গেল কেন ভোমরা, এই যদি পরিণাম?'

'তা করলোই বা, দোষ কি, বিয়ে খারাপ না।' মীরা চোখ না-নামিয়ে উত্তর করলো।

'জীবনটা নষ্ট হ'লো তো?' অমরেশ বলতে চাইলো।

'ও নিজে করেছে।' মীরা অমরেশের একটা বালিশ কোলের ওপর টেনে নেয়।

'কি রকম?' অমরেশ মীরার মতো গলার স্বর সহজ করতে পারলো না। 'শকুড সব শুনে। ওর সুন্দর জীবন নষ্ট হয়েছে, সব স্বপ্ন চুরমার হ'য়ে গেছে।'

মীরা কথা কইলো না।

'উঃ, আমি ভাবতেই পারি না কেন সাধ ক'রে মানুষ ভালোবাসার পাখির পায়ে শিকল পরায়, সোনার শিকল রাতারাতি লোহার শিকল হ'য়ে যাচ্ছে তোমাদের। বিয়ে!' যেন অস্ফুট আর্তনাদ করলো অমরেশ।

বিয়ে সম্পর্কে এ-ধরনের একটা মন্তব্য করবে ও, মীরা অনুমান করেছিলো; বিশেষ ভোমরার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর, এখন। মীরা অমরেশের এলোমেলো টেবিলটা দেখতে লাগলো।

'চলো, আজ একটু বেড়িয়ে আসি।' অমরেশ হঠাৎ প্রস্তাব করলো।

'চলো।' মীরা ঘাড় নাড়লো। 'ঘরের মধ্যে হঠাৎ ভালো লাগছে না কেন।'

অমরেশ খুশি হ'লো।

এবং যতক্ষণ সে শেভ্ করলো, চুল পাট করলো, স্যুট্ পরলো, টাই বাঁধলো, বহুদিনের অযত্নে রক্ষিত পাইপটাকে স্যুটকেসের তলা থেকে টেনে বা'র ক'রে তৈরি হ'য়ে নিলে ততক্ষণ মীরা দু-হাত লাগিয়ে প্রায়

রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে যতটা পারলে অমরেশের ঘরখানাকে গুছিয়ে ফেললো। 'কী অগোছালো থাকো তুমি!'

'কি হবে গুছিয়ে?' অমরেশ ঈষৎ হাসলো। 'কি হবে সব সাজিয়ে। সাজানো-গোছানো জীবনের মূল্য নেই।'

'কেন?' মীরা অমরেশের চোখে চোখ রেখে পরে ধীরে-ধীরে বললো, 'সাজাতে দোষ কি।'

'বিশ্বাস নেই, মীরা, কিছুতেই আর তোমরা আমাকে বিশ্বাস ধরাতে পারলে না এই জীবনের ওপর।'

'তাই তো তুমি সুখী।' বিড়বিড় ক'রে মীরা বললো, তারপর অমরেশের পিঙ্গল চোখের তারাগুলো আবার অবাক হ'য়ে দেখলো কতক্ষণ।

রাস্তায় নেমে অমরেশ ট্যাক্সি ডাকলো।

'কোন্‌দিকে যাবে?'

এত আস্তে মীরা প্রশ্ন করলো যে গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার শব্দে তা চাপা প'ড়ে গেল। অমরেশ ট্যাক্সিওয়ালাকে কোন্‌দিকে যেতে বললো শুনলো না ও। পাশাপাশি পিছনের সীটে বসলো দু-জন। হোটেল ডি-লুক্স-এর কোলাপসিব্‌ল গেট-এর সামনে খানিকটা পোড়া পেট্রলের গন্ধ রেখে গাড়ি—গাড়ির স্রোতে ঝাঁপ দিতে মীরা আর-একটু স'রে বসলো অমরেশের কাছ ঘেঁসে। অমরেশ হাত দিয়ে মীরাকে জড়িয়ে ধরলো।

গঙ্গার ধার। নির্জন জায়গা। অপরাহ্ণ।

ঘাসের ওপর রুমাল বিছিয়ে বসলো দু-জন।

একটা জাপানি জাহাজ ভেসে গেল সামনে দিয়ে। কমলা-রং রৌদ্র ও অজস্র চিক্‌রি-কাটা ছায়ায় ভরা এমন অদ্ভুত সুন্দর বিকেল অনেকদিন দেখে নি তারা। ঘাসফুলটির মতো ছোট্ট শাদা একটা প্রজাপতি মীরার মাথার ওপর উড়লো কতক্ষণ, নেচে-নেচে ঘুরলো।

অমরেশ অবাক চোখে প্রজাপতি-নৃত্য দেখছিলো।

মীরা বললো, 'ভোমরার দুঃখটা মোটা রকমের। চোখ দিয়ে দেখা যায়।'

অমরেশের মুখে কথা নেই।

'না, আমায় ব'লে দাও অমরেশ, কি করবো।' যেন হঠাৎ অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠলো মীরা। 'এমন চুপ ক'রে থাকলে তোমায় নিয়ে এখানে আসতুম কি!'

যেন নির্বিকারচিত্ত হ'য়ে অমরেশ বললো, 'ভারি সুন্দর জায়গা।'

মীরা বললো, 'আমি কি বলছি, শোনো।'

'সত্যি, আমি একটা কথা বুঝি না।' অমরেশ এবার মীরার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকালো। 'আমি ভাবতেই পারি না মীরা, কি ক'রে এমন অশান্তি আসে, বিয়ের বছরটি না-পুরতে ভাঙনের গান শুরু হয়।'

'তুমি বুঝবে না, বিয়ে করো নি যখন।' মৃদু অভিযোগের সুরে মীরা বললো।

'ভোমরার অশান্তি—'

'ভোমরা থাক্।' মীরা অমরেশের কাঁধে কনুই রাখলো, 'ভোমরার অবস্থা পর্যন্ত আমি নিজেকে গড়াতে দেবো না। আমার জীবনের মূল্য অনেক বেশি।'

অমরেশ কথা কইলো না।

মীরা বললো, 'সব তুমি পাচ্ছো। ঘরে ব'সে। ভাবতেও হচ্ছে না। ওষুধ পথ্য ফল ফুল, মোটামুটি রকম ভালো জামাকাপড়, এই সেদিনও নিউমার্কেট থেকে মীরা তোমার অতিরিক্ত ব্যবহারের জন্য সুন্দর একটা অ্যাস্ট্রে কিনে নিয়ে এলো। হ্যাঁ, চাকরি-নেই-অবস্থায়ও তুমি সিগারেট খেতে পারছো, মীরাই খাওয়াচ্ছে। সুখে আছো, বেশ সুখেই ছিলে। বাড়িভাড়া, দু-জনের ভাতের খরচ, ঝি, ইলেক্‌ট্রিক বিল্, মেথর, ধোপার পয়সা—হাসপাতাল থেকে, কেন, তারও উনিশ কুড়ি দিন আগে থাকতে আর ভাবতে হচ্ছিলো না তোমাকে কিছু। সব মীরার ঘাড়ে পড়েছিলো। ঘুরে-ফিরে টাকাকড়ি যোগাড় ক'রে মীরা যখন ঘরে ফিরলো, দেখা গেল, তোমার মুখ মেঘলা আকাশের মতো অন্ধকার—চোখে প্রশ্নের প্রখর বিদ্যুৎ।'

'তুমি চুপ ক'রে ঘরে ব'সে থাকলেই পারো।' অমরেশ মীরার চোখের দিকে না-তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরায়, জুতো দিয়ে জ্বলন্ত কাঠিটা ঘাসের গালিচার ওপর হাল্কাভাবে চেপে ধরে।

'আমাকে কিন্তু বেরোতে হবেই, কেননা আমারও ভাত-রুটির এবং লজ্জা নিবারণের জন্য পাটের চট হ'লেও একটা-কিছু কেনার সংস্থান করতে ঘরে-বাইরে ছুটোছুটি করতেই হবে। হচ্ছে। ধারকর্জ ক'রে আনি কি ভবিষ্যতে চাকরি ক'রে খাই।'

অমরেশ ঘাড় নাড়লো।

'তা তো করতেই হবে। ভর্তা যখন অক্ষম।'

কথা শেষ ক'রে অমরেশ সিগারেটের ধোঁয়ার সুন্দর একটি রিঙ তৈরি করলো। তারপর মীরার চোখের দিকে চেয়ে বললো, 'ভয়ংকর মানসিক ক্লেশের মধ্যে আছো তা হ'লে তুমি ?'

মীরা আর কথা কইলো না।

'আমি তো দেখছি তোমাদের দু-জনের সম্পর্ক ভোমরার সঙ্গে ওর স্বামীর সম্পর্কের চেয়েও জটিল হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে—দাঁড়াবে একদিন।'

'এখুনি দাঁড়িয়েছে,' মীরা বললো, 'বলছি কি তোমায়! উঃ, বিয়ে ক'রে আমার কী সর্বনাশ হ'লো। কেন আমি বিয়ে করতে গেলাম, অমরেশ।'

অমরেশ বেশ জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। মীরার চোখে চোখ রেখে কতক্ষণ স্থির হ'য়ে তাকালো। জল চিকচিক করছে মীরার দুই চোখে। গঙ্গার ওপারের সূর্যাস্তের লাল আভা লেগেছে ওর কালো জল-চকচকে ঝকঝকে নীলাভ সুন্দর চোখের তারায়।

অমরেশ আরও কতক্ষণ তাকিয়ে থাকতো। মীরার হাতের ধাক্কায় তন্ময়তা কাটলো।

'আমায় বুদ্ধি দাও, আমায় তুমি যে-পরামর্শ দেবে সেই পরামর্শ শুনবো।'

অমরেশ দুই হাতে মীরাকে জড়িয়ে ওর ঘাড়ে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'তুমি অস্থির হ'য়ো না, এতটা অস্থির হওয়া তোমার সাজে না। কী হয়েছে, কিছুই হয় নি। একটা বেবি পর্যন্ত তোমার নেই ভোমরার মতন। কাল থেকে তুমি আলাদাভাবে থাকতে পারো, ইচ্ছে করলে পারো না কি? থাকা উচিত।'

'খারাপ দেখায়, এই যা আপত্তি।' মীরা সন্ধ্যার রক্তিম আকাশের দিকে চোখ ফেরালো। 'না-হ'লে দেড় বছর? দেড় মাস এক সঙ্গে ঘর করার পর মেয়েরা বোঝে এ-ঘর সে রাখবে কি ভাঙবে।'

অমরেশ আক্ষেপের সুরে বললো, 'অত্যন্ত পরিতাপের কথা। আমরা না-হয় যণ্ডাগুণ্ডা মার্কা ছেলে। রেস্ খেলি, ড্রিঙ্ক করি, নো-ম্যারেজ ক্রীড মেনে নিয়ে মেয়েদের পিছু ছুটি। কিন্তু তোমরা? হীরেন চক্রবর্তীর

দল ? মার্জিতমন সুরুচিসম্পন্ন সব ? জীবনের ওপর শুভদৃষ্টি রেখে এ-সব কি করছেন ? After all বিয়ে-টিয়ে ক'রে ?'

প্রশস্ত কাঁধ একটু পিছনে হেলানো অমরেশের। সূর্যের শেষ রশ্মি পড়েছে ওর পিঙ্গল চোখে। বাঘের চোখের মতো লাগছিলো অমরেশের সবুজ হরিদ্রাভ ঈষৎ রক্তিম চোখ। কিন্তু সেই চোখে হিংসার জ্বালা ছিলো না। চোখের রঙ, ভেবে-ভেবে মীরার মনে পড়লো, একটু আগে ধর্মতলার একটা হোটেলে ব'সে অমরেশ বীয়ার খাচ্ছিলো কাচের গ্লাসে। সোনালী হরিদ্রাভ পানীয়ের মাথায় রক্তের ছিটার মতো লক্ষ-লক্ষ ফেনার রঙ ঘুরপাক খাচ্ছিলো।

অমরেশের প্রশ্নে মীরা চমকে উঠলো।

'তা তুমি এখন ঠিক করলে কি ? কি করবে ?'

'কিছু না।'

'ক-দিন এখন কিছু না-করাই তোমার ভালো।'

মীরা চুপ ক'রে রইলো।

'কেবল খাটলেই হয় না,' অমরেশ বললো, 'তার দাম পাচ্ছো কই ? খাটুনির অনুপাতে তোমার খাওয়া হচ্ছে না, বেশ দেখতে পাচ্ছি। সুন্দর হয়েছো একটু, কিন্তু তার তুলনায় শরীর ভাঙতে শুরু করেছে বেশি।'

'যদি শরীর ভেঙে দিয়েও স্বামী-দেবতার মন পাই।' হাসলো না, বেশ জোরে একটা নিশ্বাস ফেললো মীরা।

'বাজে সেন্টিমেণ্ট, সেন্টিমেণ্টও না, সেন্স্‌লেস আইডিয়া, এ সেন্স্‌লেস টক্।' অমরেশ ধমকের সুরে বললো, 'আজ আর এ-সব কথার দাম নেই। যুগ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এখন তুমি কি করবে, কি করা উচিত

সেটাই আগে দেখবে। শিক্ষিতা মেয়ে হ'য়ে বৈজ্ঞানিক সত্যগুলো অস্বীকার করতে পারো না। এ-ভাবে শুধুই একটি লোকের মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা করার ফলে তোমার নিজের মনের ওপর যে চাপ পড়ছে তার ফলে তোমার স্বাস্থ্য আরো সকাল-সকাল ভাঙছে। আমি সে-কথাই ভাবছি। ভোমরার মতো বাজে সেন্টিমেণ্ট নেই তোমার জানতাম। ওই করতে গিয়ে মেয়েটা মরেছে।'

যেন হৃদ্‌পিণ্ডের দ্রুত ওঠানামা শুনতে-পেলে মীরা।

'অভিমান, কার ওপর অভিমান ক'রে তুমি নিজেকে কষ্টে রাখছো? প্রকৃতির প্রতিশোধ তোমার ওপর আসবে। না এসে পারে না। মন ও দেহ দুই-ই যখন বিদ্রোহ করছে তখন তা যত চাপবে তত উগ্র হবে তার প্রকাশ। আর শিগ্‌গিরই তা দেখতে পাওয়া যায়। পাগল হয়, পার্ভার্ট হয়, স্যুইসাইড ক'রে মরেছে কত মেয়ে। এ-ভাবে অবুঝের মতো নিজেকে ধ্বংস হ'তে দিও না, লাভ নেই।' অমরেশ মীরার হাতে চাপ দিলে।

'না, শেষ পর্যন্ত আলাদা হ'য়ে থাকতে হবে আমাকে।' মীরা ঘাড় সোজা করলো। 'আমি দেখছি, অপেক্ষা করছিলাম ওর মতামতের। যদি রাজি হ'ত এমন ভালো চাকরিটা হাতছাড়া করতাম না। এই দুর্দিনে কিছু-একটা ক'রে চালাতে হবে যখন; কাল থেকেই লেগে পড়তাম।'

'লাভ হ'ত না কিছু, সন্দেহের একটা খাঁড়া দিবারাত্র তোমার মাথার ওপর ঝুলতো শুধু।'

মীরা কথা কইলো না।

'ভালোবাসা ভালো মীরা, কিন্তু বিয়ে জিনিসটাই বাজে।' অমরেশ আধ-শোয়া হ'য়ে ছিলো, সোজা হ'য়ে বসলো এখন। 'এখানে সন্দেহ-টন্দেহ

ঢুকলে আর রক্ষে নেই। (পোকায় যেমন আমটাকে খেয়ে ফেলে সন্দেহের কীটও জীবনকে ফোঁপড়া ক'রে ছেড়ে দেয়।) বাহ্যিক প্রকাশটা চাপা থাকলেও ভিতরে সত্তা থাকে না কিছু।'

'কেন এমন হয়, কেন এমন হচ্ছে আমায় তুমি বোঝাও।' কাতর-ভাবে মীরা অমরেশের মুখের দিকে তাকায়।

'আমি কি ক'রে বুঝবো, কী তোমায় বোঝাই। ভালোবাসার সোনার আতাকে বিয়ে করার পরদিন থেকে তোমরা কি ক'রে পোকায়-খাওয়া ফলে পরিণত করো সময়-সময় আমিও ভাবি। কী ঠুনকো এই সম্পর্ক, মানুষকে ছোটো ক'রে দেয়—দু-জনই নিচে নেমে যায়।'

মীরা নীরব।

'যাকগে, হুট্ ক'রে এখন তোমার কিছু করার দরকার নেই। তাঁর যদি পছন্দ না হয়, ভালো না বাসেন রোজ আট ঘণ্টা নিয়ম ক'রে বাইরে কাটাও, তো তুমি কিছুদিন, বেশ, চুপ ক'রে ঘরেই থাকো না-হয়। তোমারও রেস্ট নেওয়া হবে। তোমাকে ক-দিন ঘরে থেকে বিশ্রাম নিতে, রাতদিন টাকাপয়সার ভাবনা নিয়ে মাথা গরম না-করতে কি আমি বলতে পারি না মীরা? এটুকু বলার অধিকার আমার আছে। নাও, ধরো এটা।' হোটেল থেকেই অমরেশ লিখে এনেছিলো, এখন জামার পকেট থেকে বা'র করলো। মীরা অন্ধকারে চুপ থেকে মাথা নাড়লো, মাথা নত করলো।

'কি, দরকার হ'লে অধ্যাপককে গিয়ে বলবো, বলতে পারি, মীরার বন্ধু, সুতরাং আপনারও। হ্যাঁ, আমি হেল্প করছি, দু-জনকেই। দু-জনের স্বাস্থ্য ভালো থাকুক, সুন্দর হোক শুভ হোক জীবন, এই আমার ইচ্ছে। আমি চাইছি। কেন, আমার এই ইচ্ছে কি অস্বাভাবিক, অসুস্থ, মীরা?'

অমরেশের গলায় অসহিষ্ণুতা ফুটলো।

মীরা হাসলো না, হাসির মতো নিশ্বাস ফেলার শব্দ করলো। 'তত্টা উদার তিনি নন।' বললো ও ধীরে-ধীরে।

'কেন, আমার টাকার মধ্যে গোলাপের গন্ধ লেগে আছে ব'লে, যে এককালে অধ্যাপক-পত্নী মীরা দেবীকে একটু ভালোবেসেছিলাম, সেই কলেজী দিনে?'

মীরা নিরুত্তর।

'তবে তো তাঁর,' অমরেশও ঠিক হাসলো না, গলার একটা শব্দ করলো শুধু, 'এই আকালের দিনে বন্ধু বেশি নেই মীরা; এই দুর্ভিক্ষের রাজ্যে মানুষ মানুষের রক্ত চুষে খাচ্ছে। টাকার অনেক দাম।'

'তোমার টাকা বাসি গোলাপের গন্ধ না-হ'য়ে শুকনো মাছের গন্ধ হ'য়ে ঠেকবে আর-একজনের নাকে।' মীরা মুখ কালো ক'রে বললো।

'মূর্খ!' গম্ভীর গলায় অমরেশ বললো, 'তাই বলছিলাম বিয়ে করলেই মানুষের মাথা নষ্ট হ'য়ে যায়। কে-বা কলেজের অধ্যাপক, কে-বা রাস্তার মুটে। সব সমান। বৌ-সম্পর্কে সবাই অতিমাত্রায় সচেতন। আশ্চর্য!'

'কোনো মুটের স্ত্রীকেও বুঝি সাহায্য করতে হয়েছিলো তোমার?' মীরা অল্প হেসে প্রশ্ন করলো।

'থাক, আজ আর সেই গল্পে কাজ নেই। ওঠো, অন্ধকার হয়েছে। সাতটা বাজে।' অমরেশ হাতের ঘড়ি দেখলো। তার গলায় থমথমে অন্ধকার। 'কা'কে কি সাহায্য করেছি, দিয়েছি না দিয়েছি, আজ তার হিসেব খতিয়ে দেখার ইচ্ছে নেই। অনেক ভালোবাসার অরণ্যপথে হাঁটাহাঁটি ক'রে অনেক অমূলতরুর কাণ্ডে নিজের ও অনেকের কপাল ফাটিয়ে, বহু রক্তপাতের পর এটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, ভালোবাসতে

নেই। ভালোবাসার পাত্রে টাকা ঢালার চেয়ে তা রাস্তায় ছিটিয়ে দেওয়া ভালো। কী তার দাম যেখানে স্বীকৃতি নেই, শ্রদ্ধা নেই, প্রীতির প্রাপ্য সম্মানটুকু কেউ দেয় না প্রতিদানে? তাই আজকাল রাস্তার গরিবদুঃখী ভিখিরি রিক্সাওয়ালা মুটে মজুরদের সাহায্য করছি। সেখানে বরং দিয়ে অনেকটা সান্ত্বনা পাই, শান্তি আছে।'

একটু চুপ থেকে আস্তে-আস্তে মীরা বললো, 'ভোমরাকে কত টাকা দিলে? সবটা দিয়েই কি ও মদ খাবে? ও যে ওর কাকাবাবুর কাছে মাগ্‌না ভাত পাচ্ছে মনে হয় না কিন্তু। খরচ দিয়ে থাকছে নিশ্চয়। এদিনে যত বড়োলোক আত্মীয় হোক, যত প্রীতির সম্পর্ক থাক বিয়ের আগে, বিবাহিতা মেয়েকে কেউ আর ভাত দেয় না। কেমন?'

'অন্তত দেওয়া উচিত নয়। সেখানেও অকৃতজ্ঞতা, মিথ্যে দুর্নাম। তোমাদের মেয়েদের এই পৃথিবীতে গ'ড়ে ভগবানও কি কম ফ্যাসাদে পড়েছে!' যেন নিজের মনে কথা বললো অমরেশ। অন্ধকারে তার গলা কাঁপছিলো। আর সেই কণ্ঠস্বরের দৃঢ় সত্যতার ধাক্কায় মীরার গলাও কাঁপছিলো ভয়ে, বিষণ্ণ লজ্জায়।

যেন এই প্রসঙ্গ চাপা দিতে অনুরোধ জানিয়ে মীরা বললো, 'তুমি পারছো ব'লেই তো হেল্‌প করছো। প্রতিদানে প্রচুর উপেক্ষা, অকৃতজ্ঞতা, বিস্মৃতি পেয়েছো পরেও। তা কি আমি জানি না।'

'হ্যাঁ, অনেকে একেবারে ভুলেছে।' অমরেশ আকাশের দিকে চোখ তুললো।

সে কে, কা'রা, কোন্ মেয়ে, মীরার মনে পড়লো না। অমরেশ এক আশ্চর্য পুরুষ! আজ তার নতুন ক'রে মনে পড়লো। আর মনে পড়লো তার কুমারী-হৃদয়, কৈশোর প্রেমের সবুজ হলুদে মেশানো সেই সোনালী দিন। কামনার কালো ঘন তামাটে প্রলেপ আর স্বার্থপর

পৃথিবীর বিদ্‌ঘুটে রঙ লেগে-লেগে বিকৃত হ'য়ে ওঠার আগের জীবন। মনে প'ড়ে মীরার চোখে প্রায় জল এসে গেল।

মীরা আজ আবার নতুন ক'রে অমরেশকে দেখলো। এক পরম প্রেমিক। সুন্দর বিশাল মহীরুহের মতো। যার অফুরন্ত ফুল, ফুলের সৌরভ, ফল, ফলের শাঁস, পত্র আর পত্রের অফুরন্ত সবুজ লাবণ্য ভোগ ক'রে-ক'রে মেয়েরা, অনেক মেয়ে প্রেমের খেলা খেলেছিলো। তার মধ্যে মীরাও ছিলো। খেলতে-খেলতে বড়ো হয়েছিলো, তারপর উড়ে গেল সব স্বার্থপরের মতো দিগ্বিদিকে। স্বার্থপর পাখিদের ঠোকরে কামড়ে পাখার ঝাপ্‌টায় ক্ষতবিক্ষত নিষ্পত্র বৈরাগী উদাসী অবিশ্বাসী অমরেশ যেন অন্ধকারে হা-হা ক'রে বলছিলো, 'মদ খেয়ে ও স্বামীর ওপর প্রতিশোধ নিতে টাকার জন্যে আসুক, কি খোরাকি চলে না ব'লে বাজে চাল দিয়ে টাকা নিক, বিয়ের পরে এই প্রথম ওকে সাহায্য করলাম এবং এই শেষ। কাল এলে আর পাবে না। টাকার দাম আছে। অন্তত ভোমরার ভালোবাসার চেয়ে আমার টাকার মূল্য বেশি।'

একটু থেমে অমরেশ বললো, 'এবং আমার মনে হয়, ওর স্বামী ওর প্রতি যে-ব্যবহার করছে ওটাই ওর আসল প্রাপ্য। এই প্রকৃতির মেয়ে ও। মন জুড়ে ধু-ধু বালি, মিথ্যের মরুভূমি।'

মীরা চুপ ক'রে শুনলো।

'একটা মিথ্যের করুণ পটভূমিকা রাখছে শুধু এখন পিছনে।'

মীরার বুকের ভিতর ঢুব্‌ঢুব্ করছিলো।

অমরেশের গলা যত জোরে কাঁপলো মীরা নিজেকে তত বেশি অপরাধী বোধ করলো। একটু আগে ভোমরা-সম্পর্কে অমরেশের কথায় ও নিশ্বাসে যে-কাতরতা ও সহানুভূতি ফুটছিলো এখন তা নেই।

'আমি একবার ওর পরীক্ষার ফীজ্ দিয়েছিলাম মীরা, গরিব ও চিরকালই ছিলো, তোমরা জানো।'

মীরা ঘাড় নাড়লো।

'আমি ওকে একটা দামী আংটি প্রেজেণ্ট করেছিলাম। হ্যামিল্টন থেকে কেনা হয়েছিলো মনে আছে।'

'হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে এককালে ও খুব মিশেছিলো।' মীরা বললো।

'স্বার্থপর।'

পাথরের গায়ে ছুরি শান্ দেওয়ার আওয়াজ উঠলো অমরেশের গলায়। 'আজ একটা পয়সা দিয়ে ওকে সাহায্য করার আমার ইচ্ছে নেই। হ্যাঁ, যা বললে, ভাত খাওয়ার জন্যে টাকার দরকার হয়, হ'তে পারে। তাই দিলাম। নিতান্ত করুণা ক'রে।'

'আমার মনে হয় সব-মেয়েদের মধ্যে ও-ই তোমার দিকে ঝুঁকেছিলো বেশি।'

'তাই, এই জন্যেই তিনি সকলের আগে মায়া কাটিয়েছিলেন। স্বপ্নেও ভাবি নি, আঠারো বছরের একটা টুনটুনির মতো দেখতে নাবালিকা কি ক'রে এক সামার-ভেকেশনে বাইরে গিয়ে, মাত্র আঠারো দিন সেখানে বাস করার পর তার মামিমার আলাপিত পাশের বাড়ির এক ইঞ্জিনীয়ার ছোকরার বিবাহিতা স্ত্রী হ'তে রাজি হওয়ার কাজটুকু গুছিয়ে ছুটির শেষে কলেজ করতে কলকাতায় ফিরে এলো।'

'ভোমরা ভয়ানক ডুবে-ডুবে জল খেতো।' মীরা একটা ঢোক গিললো।

'কিন্তু খেয়ে ফল হ'লো কি ?' যেন মুখ বিকৃত ক'রে বললো অমরেশ।

মীরা আবার চুপ ক'রে রইলো।

'ডুমুর ফুল, অই অঙ্গশোভা মনোলোভা, তার বেশি নয়।' অমরেশ

বললো, 'আরে, কেবল বাইরের চটক থাকলে হয় না, শুধু স্টাইল আর ফ্যাসান, কথা আর চাউনিতে যদি তুনিয়া ভুলতো তো মানুষ এত— বুঝলে মীরা, মানুষ বেজায় কাঠখোট্টা হ'য়ে গেছে, কঠিন হ'য়ে গেছে গোটা পৃথিবীর চেহারা হালে। একটু বুঝেশুনে চলতে হয়, দেখেশুনে পা ফেলতে হয়। কী দরকার ছিলো তোমার, অতিরিক্ত ক্ষমতা হাতে ছিলো ব'লে খোদ কারখানা-মালিকের ছেলেকে বাড়িতে ডেকে খানাপিনা লাগাবার। লোকটা যখন ভালো না। তা তোমার ইচ্ছে অসৎ ছিলো আমি বলি না। স্বামীকে বিলেত পাঠাবে আকাঙ্ক্ষা ছিলো মনে।

'বেশি বাড়াবাড়ি করার কোনো মানে হয় না।' নরম স্বরে মীরা বললো, 'ঈশ্বর না দিলে মানুষ কি আর জোর ক'রে অবস্থা ফেরাতে পারে।'

অমরেশ হঠাৎ কথা কইলো না।

একটু পরে মীরার হাতে হাত রেখে আস্তে-আস্তে বললো, 'বাতাসে উড়ে যাবে কাগজটা, তোমার ব্যাগের মধ্যে রাখো।'

মীরা চেকটা থলের মধ্যে পুরলো।

'অবশ্য, তোমার কথা আলাদা। না, এখন হাতে টাকা নেই ব'লে মিস্টার চক্রবর্তীর চিকিৎসার কথা খরচপত্রের ভাবনা ভেবে মাথা গরম ক'রে তোমার লাভ নেই। এই জন্যে বলছি, টেক্ অ্যানাদার চান্স্। অসুখের জন্যে তাঁর মেজাজ এমন খিটখিটে হ'তে পারে, অনেক সময় হয়। দেখা যাক। কাল ওটা ভাঙিয়ে নাও, চলুক এ-ভাবে কিছুদিন। আমি যখন আছি, যখন র'য়ে গেলাম, দেখ না আরো ত্ু-চার মাস। আর—'

'কি, বলো, থামলে কেন?'

অমরেশের ঘাড়ের ওপর হাত রাখলো মীরা।

'যদি বোঝো তিনি টাকাটা দেখেই আজ হঠাৎ যা-তা-খুশি তোমায় একটা ব'লে বসেছেন, কি মাথা গরম ক'রে চেকটাই ছিঁড়ে ফেলছেন, বা ক্রুদ্ধ স্বামী আরো-এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে—'

'আমার গায়ে হাত তুলবেন? আমি ভোমরা? তাই বলছো?'

'না না, তদ্দূর গড়াতে দেবার দরকার নেই, এবং আমি তো মনে করি সে-স্টেজে পড়ার বহু আগেই তুমি অ্যালার্ট হ'য়ে গেছো।' একটু থেমে অমরেশ বললো, 'হ্যাঁ, চক্রবর্তীর অসুখই তাঁর মাথায় হঠাৎ নিজের স্ত্রী সম্পর্কে এ-ধরনের একটা দুর্বল অশুভ চিন্তা ধীরে-ধীরে বাষ্পাচ্ছন্ন হ'তে দিচ্ছে এই জেনে রেখেই তুমি চলবে। তিনি যখন সুস্থ হবেন, যখন কর্মক্ষম হবেন—'

'অর্থাৎ সক্ষম অবস্থায় তাঁর মনের চেহারা কেমন হয় তা দেখার অপেক্ষা করতে বলছো?'

'নিশ্চয়ই।' অমরেশ মীরার কাঁধে অল্প ঝাঁকুনি দিলে। 'তাতে তুমিও নিজের কাছে নিজে ফর্সা থাকবে। দেখা যাক না, রুজি-রোজগারে নেমে তিনি একলা কতটা করেন, কতটা পারেন।'

'তখন আর ঘর থেকেই আমাকে বেরোতে দেবেন না, বলছেন।'

'দেখো না, দেখা যাক।' অমরেশ অন্ধকারে একটু হাসলো, তার দাঁতের অস্পষ্ট শাদা দেখতে পেলে মীরা।

'একবার যখন অধ্যাপকের মাথায় এই রোগের পোকা ঢুকেছে, তখন তার থেকে তিনি অব্যাহতি পাবেন ভরসা পাচ্ছি না। তবু বলছি, এখন তাঁর অসুখ অবস্থায় বিশেষ আর হৈচৈ ক'রে লাভ কি। যে-ভাবে চলছে চলুক। ধারকর্জ আমার কাছ থেকে করছো, বেশ তো, না বললে। মেয়ে-বন্ধু তোমার অনেক আছে নিশ্চয়। সে-ভাবেই একটা মিথ্যে ব'লে দিনকতক চালিয়ে যাও। না, এর জন্যে, এই পাপের জন্যে তোমার

অকল্যাণ নেই। আমি বলছি মীরা, স্বামীর স্বাস্থ্যের জন্য স্ত্রীর এটুকু মিথ্যাচারিতার ছাড়পত্র আধুনিক সমাজ দেয়।'

যেন কা'র একটা গল্প বলতে যাচ্ছিলো অমরেশ। তাই কি? থেমে গেল। 'নাও, ওঠো, রাত হয়েছে, আর ব'সে নয়।' উঠে দাঁড়িয়ে রুমাল ঝাড়তে-ঝাড়তে মীরার সামনে একটু-সময় পায়চারি করলো অমরেশ।

মীরা তেমনি বাঁ-হাঁটু ঘাসের ওপর প্রসারিত রেখে ডান-হাঁটুর ওপর থুঁত্‌নি ঠেকিয়ে গঙ্গার ওপারে তাকিয়ে। কালো চিমনির সারির পিছনে কাস্তের মতো রুপালী চাঁদের ফালি উঁকি দিয়েছে সবে। ঝিরঝিরে হাওয়া বইছিলো। অন্ধকারে মীরার চুল নড়ছিলো কিনা অমরেশ দেখতে পেলে না।

'চাকরি, চাকরির জন্যে তোমার ভাবনা নেই।' অমরেশের গলায় গুম্‌গুম্‌ আওয়াজ হয়। 'আমি বলছি, এখন না, উঃ তোমাকে, মীরাকে ব্যাগ হাতে ক'রে ট্র্যামে বাসে লিফ্‌টে সিঁড়িতে ছোটাছুটি ওঠানামা করতে হবে আমি কোনোদিন বিশ্বাস করি নি।'

'অদৃষ্টে থাকলে করতে হবে।'

'ভয়ানক অদৃষ্টবাদিনী তুমি।'

যেন ধমক খেয়ে মীরা থামলো।

'আমি বলছি না চাকরি করা খারাপ। সব সভ্য দেশের মেয়েই করছে। করবে দরকার হ'লে। এখন না। এখন চোখে-দেখা-যায় অসুখ হয়েছে বটে তোমার স্বামীর। আর চোখ-দিয়ে-দেখা-যায়-না অসুখ অশান্তি, বাইরে-থেকে-বোঝা-যায়-না অস্থিরতা অবসাদ নেমেছে তোমার দেহে মনে। সেটা আমি বুঝছি, দেখছি মীরা। হ্যাঁ, সব-দিক দিয়েই ভালো হবে এই ব্যবস্থা। থাকো দিনকতক বাড়িতে। যে-টাকা

দিয়েছি রুগীর ওষুধপথ্য ডাক্তার তোমাদের রেশন বাড়িভাড়া ছ-মাস চলবে। দেখা যাক্। সেরে উঠে সবল সুস্থমন অধ্যাপক কি করেন। সে-ভাবে তখন ব্যবস্থা করলেই হবে। ব্যস্ততার কিছু নেই।'

মীরা আর কথা কইলো না।

'যদি আরো টাকা তোমার ও হীরেন চক্রবর্তীর সংসারখরচ বাবদ ঢালতে হয় আমাকে, ঢালবো। নিঃস্বার্থভাবেই দিচ্ছি মীরা, দিয়ে যাবো। এতটুকু আশা না রেখে। তাতেও যদি তিনি রাগ করেন, মন খারাপ করেন এবং শেষটায় মাথা গরম করেন তো এটা তাঁরই দুর্ভাগ্য, বলো কি না?'

মীরা ঘাড় কাত করলো। মুখভার ক'রে বললো, 'মন খারাপ তিনি সব-কিছুতেই করবেন। আজ তোমার টাকা নিয়ে ঘরে ফিরছি শুনলে মুখ কালো করবেন, একমাস চাকরি না হ'তে ওপরঅলা আমার দশ টাকা মাইনে বাড়িয়েছেন শুনলে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন। মন খারাপ তাঁর ইহজন্মে ঘুচবে না।'

একটু থেমে অমরেশ বললো, 'যা বললাম তাই করো। বেশ তো, টাকা তুমি তোমার দাদার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যাচ্ছো, দিয়েছেন তিনি, বলবে। যদি কারো ভালো মনে দেওয়ার মধ্যেও ভদ্রলোক একটা অশুচির গন্ধ পান তো মিছে কথা ব'লেই তাঁকে তা গ্রহণ করাতে হবে। এই টাকাটাই তাঁর এখন ওষুধ বিশেষ। এই দিয়ে তাঁর ফল দুধ ডিম হবে। টাটকা শাকসব্জি মাখন মাছ। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে আর বাজারের ভাবনা ভাবতে হবে না। তাঁকে তো নয়ই, তোমাকেও না। এই টাকা থেকে অনায়াসে ছ-মাসের বাড়িভাড়াও দেওয়া চলবে। ছ-মাসের পুরো চব্বিশটা রেশন আনিয়ে নিও। আর, তিনি যা মনে-প্রাণে চাইছেন, গৃহিনীকে দীর্ঘ ছ-মাসের মধ্যে একটিবার ঘরের বাইরে

পা না বাড়িয়ে চলতে। দেখা যাক। হীরেনবাবু তদ্দিনে কতটা সেরে
ওঠেন।'

মীরা অমরেশের চোখে চোখ রাখলো।

অমরেশ বললো, 'সিংহ অসুস্থ। সুস্থ হ'য়ে উঠে সোনার হরিণকে কি ক'রে রাখে তার শেষ পরীক্ষাটা হ'য়ে যাক। তারপর রইলোই তো তোমার স্বাধীনভাবে যা-কিছু করার অধিকার। তখন মহানিন্দুকেরও আর-কিছু বলবার থাকবে না। কেননা, পরিবার চালাতে পারছেন না তিনি লোকে যখন দেখবে, তখন তাঁর পরিবার যদি দুই পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে তো তাতে কেউ দোষ ধরবে না। সুতরাং এখন থাক। চক্রবর্তীকে নীরোগ হ'য়ে ওঠার সুযোগ দাও।'

মীরা অমরেশের হাতে হাত রেখে একটা ঢোক গিললো। হঠাৎ অমরেশের গরম নিশ্বাস লাগলো মীরার কানে গালে চুলে অধরে ওষ্ঠে। যেন ছোট্ট একটা ঝড় ব'য়ে গেল মীরার সমস্ত সত্তার ওপর দিয়ে।

আস্তে-আস্তে ঠোঁট সরিয়ে নিয়ে অমরেশ বললো, 'রাগ করলে ?'

'না।' হাত দিয়ে কপালের চুল সরিয়ে মীরা গঙ্গার অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো।

'কাল দশটার সময় ব্যাঙ্কে গিয়ে ওটা ভাঙিয়ে নিও।'

'আজ কত টাকা দিলে ?' মীরা ঘাড় ফেরালো।

'বাড়ি গিয়ে দেখো।' অমরেশ গলা পরিষ্কার ক'রে বললো, 'তোমার স্বামী বিশ্বাস করবে না ঠিকই, কিন্তু তুমি তো করছো, তোমার অজানা রইলো না মীরা। এতটুকু আশা লোভ বা স্বার্থ না রেখে আমি তোমাদের দিচ্ছি—দিলাম। দু-জনে শান্তিতে নিশ্চিন্ত নির্ভরতার আরামে গা ঢেলে দিয়ে ক-দিন কাটাতে পারো এই শুভ ইচ্ছেটাই আজ আমার কাছে সবচেয়ে বড়ো।'

মীরার বাক্‌স্ফূর্তি হ'লো না।

'ঝি-চাকর রাখ্‌তে পেরেছো একটা ?'

'হ্যাঁ।' মীরা উত্তর করলো।

'এমন কি বাজার বা দোকান করতেও তোমার বেরিয়ে দরকার নেই। বলছি এই জন্যে যে, তুমি তাঁর চোখের আড়াল হবে ব'লে নয়, তুমিই স্বামীকে চোখের আড়াল করবে না। সেবা যত্ন সারাক্ষণের সান্নিধ্য দিয়ে ক-টা দিন ওঁর ভ'রে রাখো। তাতে সংশয়ের বিষ সন্দেহের বীজাণু যদি মরে মন্দ কি।'

মীরা অমরেশের কাঁধে ঝাঁকুনি দিলে।

'ওঠো, ঠাণ্ডা লাগে।'

'আমি আশাবাদী, মীরা। আশা করছি আবার দু-জনে সুখী হবে। চক্রবর্তী ইজ নট্‌ এ ফুল। ফিজিক্যালি অসুস্থ তিনি। এটাই আমরা যদি এখন ধ'রে নিই দোষ কি—'

'ক-টা বাজে তোমার ঘড়িতে ?' মীরা ব্যাগ হাতে নিলে।

অমরেশ দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললো। 'আটটা পঞ্চান্ন।'

'ন-টা বাজে।' মীরা বললো।

অমরেশ মীরার হাত ধ'রে উঠে দাঁড়ায়।

'ঠিকানা তো রাখলামই তোমার।' হাতের কাছে আর কথা খুঁজে না পেয়ে অমরেশ বললো।

ঠিকানা রেখে অমরেশ কি করবে মীরা হঠাৎ ভেবে পেলে না। কেননা অমরেশ আর যা-ই করুক অধ্যাপকের গৃহে হানা দেবে না এ-বিষয়ে সে নিশ্চিত ছিলো। হীরেন চক্রবর্তীকে অমরেশ ঘৃণা করে। চক্রবর্তীর চেহারা দেখতেই অমরেশের রুচিতে বাধবে। এতক্ষণ ওর সঙ্গে কথা ব'লে এবং কালচার্ড চক্রবর্তী সম্পর্কে অমরেশের মন্তব্য শুনে

মীরার বার-বার তাই মনে হ'তে লাগলো। বলতে কি, চেকটা যদি অমরেশ শুধু মীরার জন্যেই দিয়ে থাকে তো অন্তরের সবটুকু অনুরাগ নিয়েই সে তা লিখেছিলো। এর একটা অংশ হীরেনও পাবে, মানে তার ওষুধপত্র বাবদ খরচ হবে অমরেশের মনে হয়েছিলো যখন নিশ্চয়ই অনুকম্পা ক'রে সে টাকার অঙ্কটা বসিয়েছিলো।

আর-একবার অমরেশকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হ'লো মীরার, কত দিয়েছে সে আজ।

'বলছিলাম দরকার নেই হোটেলে বার-বার এসে, তোমার স্বামী যা পছন্দ করেন না। যদি মনে করো আরো টাকার দরকার তোমাদের, একটা কার্ড লিখে ফেলে দিও আমার ঠিকানায়। রেজিস্ট্রি মনিঅর্ডার যা ক'রে হোক আমি আবার টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করবো। রেবা কুন্তলা হেনা ডায়না যে-কোনো একটা মেয়েলি নাম রেমিটারের ঘরে বসিয়ে দেবো। হীরেনবাবুর আর সন্দেহ থাকবে না। বার-বার দাদার কাছে কর্জ না ক'রে মেয়ে-বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা ধার করছো বলবে।'

এলোমেলো হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জোনাকি পোকাগুলো নেচে-নেচে ঘুরছিলো। রেড রোডের আলোর ফুল্‌কির সঙ্গে আড়াআড়ি ক'রে ওরা মাঠের অন্ধকার বিদূরণের চেষ্টা করছিলো কি ?

কথা না ক'য়ে মীরা অমরেশের হাত ধ'রে হাঁটলো একটুক্ষণ।

একটু পরে যেন নিজের মনে বললো ও, 'তুমি কত বড়ো, কত ভালো, অমরেশ।'

একবার থেমে মীরা আবার বললো, 'বিয়ে না করলে কত ভালো থাকে মানুষের মন, তাই ভাবছি।'

'যদি বোঝো কিছুতেই চলছে না সেখানে, চ'লে এসো সোজা আমার কাছে ; এখন না। অসুখটা ওর সারুক। আর-একটা চান্স দাও।'

'সেদিন একটা ভালো কাজ তুমিই আমায় যোগাড় ক'রে দিও ব'লে রাখছি। আলাদা হ'য়ে যখন থাকবো একটু ভালো ভাবেই থাকবো। রোজ টাকার চিন্তা ক'রে আয়ুক্ষয় আর করবো না।'

অমরেশ কথা কইলো না। মাঠের জল নিকাশের একটা ছোটো নালা পার হবার সময় মীরাকে প্রায় কোলে তুলে সে সেটা পার হ'লো।

'ভোমরাকে তুমি ও-সব বাজে আইডিয়া ছেড়ে দিতে বলো। ব'লে-ক'য়ে একটা ভালো চাকরিতে ঢুকিয়ে দাও। কী হবে আর প্রতিশোধ-ট্রতিশোধ নিয়ে, যাঁর সঙ্গে আর সম্পর্কই থাকছে না। না, অমরেশ, মনের এক-এক অবস্থায় ভালোবাসার আদর্শের রকমফের হয়, হওয়া উচিত। বিশেষ বিয়ের পর।'

'বুঝি না।' অমরেশ বললো। 'আমি বিয়ে করি নি।'

মীরা কথা কইলো না।

'পারি না কি, আজই পারি ওকে আমি সিনেমায় ঢুকিয়ে দিতে। একটি মেয়ের ডিসেণ্ট্‌ ভাবে থাকতে পারার মতো একটাই তো লাইন আছে এখন মীরা? বিশেষ যে-মেয়ে দেখতে মোটামুটি রকম ভালো। যদিও ভোমরা একটু বেঁটে।' মীরা কথা কইলো না।

অমরেশ বললো, 'ভোমরা ব'লেই এ-কথা বলছি, ও যে-ধরনের মেয়ে যে-রকম সমাজে মিশেছে।'

'আমি অত টাকা চাইছি না। আমার মোটামুটি রকম একটা আপিসের কাজে ঢুকিয়ে দিও।'

'আপিসেও তোমায় মানাবে না মীরা।'

'কেন?' অন্ধকারে মীরার গলা একটু কাঁপলো।

'কেন তা কি তুমি জানো না? কেন হীরেন তোমায় এক মিনিট

চোখের আড়াল করতে চায় না? আমিও যদি তোমায় চোখের আড়াল না ক'রে তোমায় নিয়ে বালিগঞ্জে স্টেটের বাড়িতে গিয়ে উঠি? অনেক দিনের হাহাকার-মেশানো হোটেলবাস ছেড়ে দিই এবার, তুমি কি তা চাও না মীরা?'

মীরা কথা কইলো না।

অমরেশ মীরার গালে ঠোঁটে চুম্বন করলো। 'তুমি সুন্দর, তুমি অদ্ভুত সুন্দর, মীরা।'

'এই, রাখো, কেউ দেখবে।'

দূরে চৌরঙ্গির লাল বেগ্‌নি সবুজ আলোর ঢেউগুলো থর্‌থর্‌ ক'রে কাঁপছিলো।

'কি, ভুল করেছি, আমি কি ভুল করেছি?'

মীরা অস্ফুট যন্ত্রণায় একটু ককিয়ে উঠলো। হাত দিয়ে খোঁপা ঠিক করলো। হাসলো একটু এবং অমরেশকে তিরস্কার করলো। তারপর অমরেশের হাত ধ'রে আবার হাঁটতে লাগলো। একটু পরেই দিনের আলোর মতো ফুটফুটে চৌরঙ্গির পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত পেভমেণ্টে উঠে এলো দু-জন।

রাস্তার কিনারে সারিবাঁধা কালো-কালো গাড়ি। মসৃণ ঝকঝকে উজ্জ্বল গাড়ির ঢেউ।

'সেদিন আমি গাড়ি কিনবো মীরা।' অমরেশ গদগদ গলায় বললো, 'কোনোদিন ইচ্ছে হ'লো দু-জনে ফিরপোয় চ'লে এলাম। ঝি-চাকরদের এই কার্তিক মাসের শীত-পড়ি-পড়ি কলকাতার সুন্দর-সুন্দর সন্ধ্যায় একটু হাওয়া খাওয়ার ছুটি দিয়ে রাতের আহারটা দু-জনে বাইরে সারি তো ভগবান কি আমাদের ওপর খুশি হবেন না, মীরা?'

'পারোই তো, সে-ভাবে জীবনযাপন করার সংগতি তোমার আছে।'

'এবং সামর্থ্য।' মীরার হাতে বলদৃপ্ত একটা চাপ দিয়ে অমরেশ চকিতে হাত সরিয়ে নিলে।

তির্যকভাবে একটা গাড়ির হেড্লাইট এসে দু-জনের চোখে বিঁধেছে তখন। মীরা চোখ বুজলো। অমরেশ বুজলো কি না মীরা বুঝতে পারলো না। আলোর তীব্রতা কমলে চোখ মেলে মীরা আর চোখ সরাতে পারলে না।

'সংসারে যে কত মুখ আমরা ভুলে যাই।' ব'লে হেসে স্থকোমল সেন মীরার চোখে চোখ রেখে দুই হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকালো।

'নমস্কার।'

'নমস্কার।' মীরা হাত তুললো ও হাসলো। 'আমি কিন্তু ভুলি নি।' স্থকোমলের সঙ্গে জীবনে এই প্রথম সে কথা বলছে।

'আমার সৌভাগ্য।' অমরেশের বন্ধু এবং মীরাদের সময়ের সবচেয়ে ধনী স্থশ্রী ও অভিজাত স্থকোমল এতকাল বাদে এই প্রথম দেখা হওয়াতে এমন ব্যগ্রভাবে হাত তুলবে মীরার ধারণায় ছিলো না। মীরার বুকের মধ্যে দোলা লাগলো।

'কেমন আছেন, মীরা?' পরিচ্ছন্ন হেসে স্থকোমল প্রশ্ন করলো। 'এঞ্জেল মুখার্জিকে কতকাল পরে দেখলাম।'

'আর মুখার্জি নেই, অনেকদিন চক্রবর্তী হ'য়ে গেছেন।' অমরেশ সিগারেটের টিন বন্ধুকে বাড়িয়ে দিলে।

'আই সী।' স্থকোমল লজ্জিত হ'লো। কিন্তু তার লজ্জিত হবার কিছু ছিলো না। বিয়ের সময় মীরা অমরেশের এই বন্ধুটিকে নিমন্ত্রণই করে নি। মনে প'ড়ে মীরা এখন লাল হ'য়ে উঠছিলো।

'কিন্তু ভালো নেই।' অমরেশ বললো, 'বিয়ের পরেই ট্রাবল্স-এ প'ড়ে গেছে বেচারা।'

'কি, কি ?' স্থকোমল গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। 'চলো একটা রেস্টুরেণ্টে গিয়ে বসি।'

'না, রাত হ'য়ে যাচ্ছে। ও বাড়ি ফিরবে। ইনজেকশন কিনতে এসেছিলো। চক্রবর্তী অসুস্থ।'

স্থকোমল রুমাল দিয়ে কপাল মুছলো। 'আই সী।' টাটকা একটা বন্য ফুলের গন্ধে জায়গাটা মদির হ'য়ে উঠলো।

'সত্যি, সংসারে কোনো লোক নিরবচ্ছিন্ন স্থখ পায় না।' সকলের সঙ্গে একটু নীরব থেকে স্থকোমল পরে ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেললো। 'চলি ব্রাদার।'

'কোন্‌দিকে এসেছিলে ?'

অমরেশ মীরাকে দেখছিলো, বন্ধুর মুখের দিকে তাকালো।

'একটু মার্কেটিং।' ঈষৎ হেসে স্থকোমল বললো, 'বৌয়ের কন্‌ফাইন-মেণ্ট পিরিয়ড চলছে জানো না বুঝি, শোনো নি তুমি। একেবারে খরচের সমুদ্রে প'ড়ে গেছি।'

'কি ক'রে জানবো, কি ক'রে বুঝবো। বাড়ির খবর তো আর সহজে দিতে চাও না তোমরা, বন্ধুরা।'

'ঘরের ঝামেলা অনেক বেশি।' আর-একবার মুখভাব দৃপ্ত ক'রে স্থকোমল মীরার সঙ্গে চকিতে দৃষ্টিবিনিময় ক'রে পরে অমরেশের দিকে তাকালো। 'সকলের চেয়ে তুমিই ভালো আছো, অমর।'

'তোমার ব্যবসার খবর কি ? রেডিওর দোকান ?'

'ভালো।' সোনার সিগারেট-কেস বাড়িয়ে দিলে স্থকোমল বন্ধুকে। 'জীবনে যেটিকে সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছি তার খবর কোনোদিন আমার মন্দ হয় না ভায়া।' ব'লে নিজেও একটা সিগারেট মুখে গুঁজে আর একবারও মীরার দিকে না তাকিয়ে গাড়িতে উঠলো। 'চললাম।'

এক অদ্ভুত প্রকৃতির ছেলে। আবার কলেজের দিন মনে পড়লো মীরার। বড়ো ওয়াইন মার্চেন্ট স্থকোমলের বাবা। কিন্তু একটি পয়সা নিজে অপব্যয় করবে দূরে থাক, সেই ছাত্রাবস্থা থেকে সতর্ক প্রহরীর মতো আগলে রেখেছে বাবার প্রত্যেকটি পাই। শুধু তাই নয়, নিজে একটা ছোটোখাটো রেডিওর দোকান খুলেছিলো কলেজ স্ট্রীটে। কলেজ ছুটির পর দোকান দেখতো। মেয়েরা এমন স্থন্দর ঝকঝকে বড়ো-লোকের ছেলের এই খাপছাড়া স্বভাব দেখে নাম দিয়েছিলো ওর 'জ্যু'। স্থকোমল-সম্পর্কে কোনো কথা উঠলে রাগত গলায় সবাই বলতো, 'ইহুদি সেন।'

সব মেয়েই এক দু-দিন স্থকোমলের দিকে তাকাতে চেষ্টা করেছিলো, স্থকোমল একজনের দিকেও তাকায় নি।

'লোকটা চিরকালই এম্নি। স্বার্থপর। আপনমুখী।'

'কিন্তু বৌকে ও খুব ভালোবাসে। দেখা হ'লেই বৌ-সম্পর্কে একটা দুটো কথা বলেছে। সবটাই ওর স্বার্থপর নয়।'

'কোথায় বিয়ে করলো?' মীরা একটু ভাঙা-গলায় প্রশ্ন করলো, 'ছেলেমেয়ে ক-টি?'

'অনেক।' অমরেশ ঈষৎ হেসে বললো, 'বিয়ে করেছে বর্ধমানের রাজ-পরিবারের মেয়ে।'

'ও, এই জন্যেই বৌকে খুব ভালোবাসে বললে? এরি মধ্যে অনেক-গুলো বাচ্চা এনে দিলে ব'লে?' মীরাও হাসলো। যেন মীরা ইচ্ছে ক'রে অমরেশকে খোঁচাটা দিলে। অমরেশ একটু-সময় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে পরে স্থকোমলের সোনার কেস থেকে তুলে দেওয়া সিগারেটটা পরম তৃপ্তির সঙ্গে টানতে লাগলো। মীরা ঘাড় ফিরিয়ে আলোর মালা-পরা মেট্রো সিনেমার বারান্দা দেখছিলো।

অমরেশ বললো, 'আমার তো মনে হয় বিয়ের পর ওটাই ভালোবাসার ব্যারোমিটার।'

'বিয়ে যখন করো নি তোমায় আমি ও-সব বোঝাতে পারবো না, অমর। চলি, অনেক রাত হ'লো।'

'হ্যাঁ, যাও। তোমার বাস এসে গেছে। কালই চক্রবর্তীকে আর-একজন ভালো ডাক্তার দেখাও। আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি তোমায় টাকার জন্যে ভাববে না।' বলতে-বলতে অমরেশ, একটু অবাক হ'লো মীরা, আর এক সেকেণ্ড অপেক্ষা না ক'রে দ্রুত রাস্তার ওপারে চ'লে গেল। তার শ্যামবাজারের বাস এসে গেছে কি ?

মীরা তখুনি বাসে উঠলো না। বরং সাউথের গাড়ি এসে গেছে দেখে যেন ইচ্ছে ক'রে ও অন্যদিকে মুখ ফেরালো। তারপর আস্তে-আস্তে রাস্তা পার হ'য়ে আবার ধর্মতলার দিকে এগিয়ে গেল। দুপুরে তখন কলেজ স্ট্রীটের বাস ধরার আগে যে-চায়ের দোকানে ঢুকেছিলো সেই দোকানটায় আবার ও ঢুকলো। একটা নিরিবিলি কামরা পেলে। সচরাচর যা ঘটে না। কাচ-পরানো চৌকোণ ছোট্ট সবুজ টেবিলের ওপর হাতের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে মীরা চারদিকে উৎসুক চোখে খুঁজতে লাগলো একটা আয়না কোথাও দেখতে পাওয়া যায় কি না। না-পেয়ে অগত্যা এমনি হাত দিয়ে চুল ঠিক করলো, রুমাল চেপে-চেপে মুখ ও চিবুকের নিচেটা ঠিক করলো। তারপর বয়কে ডেকে শুধু এক কাপ চায়ের কথা ব'লে দিয়ে নিঃশব্দে ব্যাগটা খুলে চেকটা বা'র করলো। কাগজের ভাঁজ খুলে মীরা অঙ্কটা পড়লো। তারপর, যেন ছবি দেখছিলো ও, ওটা চোখের সামনে ধ'রে রেখে চুপ ক'রে রইলো। পর-পর অনেকগুলো

ছবি মীরার সামনে এসে গেছে। অমরেশের হোটেলের বারান্দা, ঘরের ভিতর, হোটেল থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে ওঠা; একটা বড়ো রেস্টুরেণ্টে ঢুকছে দু-জন, মীরা সেখানে একটা ব্রেস্ট্ কাটলেট্ ছাড়া আর-কিছুই খায় নি যদিও, রেস্টুরেণ্ট থেকে বেরিয়ে গঙ্গার ধার, ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসা, ওপারে অন্ধকার, কালো চিমনির সারি, কাস্তের মতো রুপালী চাঁদের ফালি উঁকি দিয়েছে পিছনে, অনেক কথার পর দু-জনের অনেকক্ষণ চুপচাপ ব'সে থাকা, তারপর এক-সময়ে আবার মাঠে ফিরে আসা। মাঠের জলনিকাশের নালা পার হবার সময় অমরেশ তাকে প্রায় কোলে তুলে নিয়েছিলো কি? ন্যাড়া বিলিতি আমলকী গাছ থেকে ক-লক্ষ গজ দূরে ছিলো কার্জন পার্ক, চৌরঙ্গির লাল রোশনাই? অমরেশের প্রখর তৃষ্ণার্ত ঠোঁটের কাছে সবটুকু ছেড়ে দেওয়া সবটুকু মেলে ধরা। সম্পূর্ণরূপে মীরা নিজেকে বিকশিত ক'রে দিলে। মীরা যে বেঁচে আছে, ম'রে যায় নি, ইচ্ছে ক'রে আজ অমরেশের সঙ্গে বেরিয়ে সে তা প্রমাণ করলো। এ যেন নিজের কাছে নিজেই পরীক্ষা নেওয়া হ'লো। এই পরীক্ষার খুব বেশি প্রয়োজন ছিলো মীরার।

চা এলো। চেকটা ভাঁজ ক'রে মীরা ব্যাগে পুরলো। তারপর পেয়ালায় একটা দীর্ঘ চুমুক দিয়ে চেয়ারের পিঠে মাথা এলিয়ে দিয়ে বোজা চোখে নির্জীবের মতো কাটালো একটু-সময়।

আরো ছবি দেখতে লাগলো মীরা মনের পটে, আরো অনেক কথা ভাবলো ও। সুকোমল এসেছে সামনে। গর্বিত স্বার্থপর যুবক। সুকোমলের কথা মনে হ'তে অমরেশের মন্তব্যটা মনে পড়লো মীরার। কি ক'রে সে টের পেলো যে যেহেতু সুকোমল প্রতি বছর বৌকে আঁতুড়-ঘরে পাঠিয়ে রাশি-রাশি টাকা ঢালছে ব'লে তার পত্নী-প্রেমের তুলনা নেই! বিবাহিত একটি যুবক সম্পর্কে ব্যাচেলার অমরেশ, চিরকাল

যার হোটেলে কাটলো, এর চেয়ে পাকা কোনো অভিমত পোষণ করবে মীরা তা আশা করে না যদিও। বস্তুত বিয়ে করে নি ব'লে অমরেশকে কত কচি ও অসহায় মনে হয় মীরার। আর বিবাহিত জীবন সম্পর্কে ওর অনভিজ্ঞ অপক্ক মনের ধারণাগুলো প্রায় উপভোগ করার মতন। ওর মতামতগুলো নিজের মনের মধ্যে নাড়াচাড়া ক'রে দেখলো মীরা আর নিজের মনে হাসলো। তবু চক্রবর্তী এদিক থেকে ভালো, ভাবতে-ভাবতে ঠাণ্ডা-হ'য়ে-আসা চা-টুকু লম্বা চুমুক দিয়ে শেষ করলো ও।

নিশ্চয়ই, অমরেশ স্বামী হ'লে তার সন্তানপ্রীতির ঠেলায় অ্যাদ্দিনে যেটুকু স্বাস্থ্য ছিলো মীরার তা-ও থাকতো না, এতটুকু লাবণ্য।

মীরার স্বাস্থ্যের অবনতি দেখে আজ অমরেশ যেমন আঁৎকে উঠলো সেদিন উঠতো কি না আর না ভেবে দোকানের বিল মিটিয়ে এক-চিমটি ভাজা মশলা মুখে ফেলে মীরা উঠে দাঁড়ালো। প্রায় এগারোটা বাজে।

•

না, রাত বেশি হচ্ছে ভয়ে যে মীরা বাস ধরতে দোকান থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তায় ছুটে এলো তা নয়। বরং ভালো লাগছিলো তার রাত্রির ঠাণ্ডা ঝলক লাগা হাওয়া। গঙ্গার বুক থেকে উঠে এসেছে, গড়ের মাঠের বুক ছুঁয়ে এসেছে এই হাওয়া, ভাবলো সে। ভারি মোলায়েম মিষ্টি লাগছিলো মীরার। আরো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে বুক পুরে এই হাওয়া নিয়ে ঘরে ফিরলে ভালো হ'ত, ঘুমটা ভালো হ'ত, মাথা ঠাণ্ডা থাকতো। কিন্তু উপায় নেই। এর পর আর বাস না পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সঙ্গে আজ পয়সা নেই। অমরেশ চেক দিয়েছে। এবং ঘরে গিয়েও যে ট্যাক্সিওলাকে টাকা দিতে পারবে মীরা, তারও ভরসা নেই। সুতরাং বাসই সম্বল।

না-হ'লে—

না-ই বা হবে কেন। হামেসা হচ্ছে। কালও বেশ রাত হয়েছিলো মীরার ঘরে ফিরতে। ইচ্ছে করেই করেছিলো ও। কাল হাতে টাকা ছিলো। বাজার সওদা সেরে তাই ট্যাক্সি ক'রে ফিরেছিলো। আজ হাতে কিছু নেই। আজ সে কর্জ পায় নি।

তাই ভালো। তাই-বা মন্দ কি। যদি গিয়ে সে হীরেনকে বলে, 'অমরেশ, যার নামে তুমি আঁৎকে ওঠো, পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গে মেলামেশা করলাম কি না করলাম শুনে তোমার হৃদ্‌পিণ্ড অহর্নিশি কাঁপছে—কই, দেয় নি তো কিছু। কাল চেয়ে এনেছিলাম, আজ টাকা চাইতেই অমরেশ মুখ ঘুরিয়েছে। বুঝলে, ঘরে ব'সে তুমি যা ভাবছো তা নয়। সেই দিন নেই। বাজারের হালচাল এখন অন্যরকম। অমরেশ টের পেয়েছে তার টাকা আমি শোধ করতে পারবো না, কাজেই—'

'প্রেম ?'

হীরেন নির্লজ্জ হ'লে মীরাও জিহ্বা চোখা করবে। লজ্জা ত্যাগ করবে।

'তোমরা ভালো ছেলেরা প্রেমের কত মর্যাদা দিচ্ছ। রোঁলা রবীন্দ্রনাথ পড়া ধীমানেরা! ওরা চিরটা কাল খেলার মাঠে কাটিয়েছে, চায়ের দোকানে আড্ডা দিয়েছে। একছত্র বই না প'ড়ে কেবলই মেয়েদের পিছনে ছুটেছে। মেয়েরা শেষ পর্যন্ত ওদের দিকে তাকায় নি, ভালোছেলে বর জুটিয়ে সব স'রে গেছে। ওরা একদিকে করলো ক্লাশের পরীক্ষায় ফেল, অন্যদিকে ডাল থেকে সোনালী পাখিদের উড়ে যেতে দেখে লক্ষ্মীছাড়া গাছের মনের যা অবস্থা হয় তাই হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

'হ্যাঁ, কোনো মেয়ে আশ্রয় চাইতে গেলে সাহায্য চাইলে কি আর ফিরিয়ে দিচ্ছে, দেয় না। কিন্তু এবার প্রেমের মূল্য দিচ্ছে একটু হিসেব ক'রে। আগের বারের মতো লক্ষ্মীছাড়ারা এবার ঠকতে নারাজ।'

'কি বললে, কি বলছিলো অমরেশ শুনি, আজ আবার যখন তুমি টাকা চেয়েছিলে ?'

উৎসুক হীরেনের চোখের কাতরতা কণ্ঠস্বরের অসহায়তা মীরা এখানে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট শুনলো, দেখলো।

'কি আর বলবো', উত্তর করবে মীরা, 'ব্যাচেলার মানুষ। কোনো মেয়ে যদি বিয়ের পরে হঠাৎ একদিন গিয়ে বলে, সংসার চলছে না আমাদের, কাঠ চা'ল তেল নুন আটকে গেছে, এইবেলা কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করো বন্ধু। শুনে অমরেশ হাসছিলো—হেসে বলছিলো তাই, আমিও ভাবছি না-হ'লে মীরা দেবীর অভাগার হোটেলে পর-পর দু-দিন আবির্ভাব হবে কেন ? মন্দার বাজার, তাই মন্দ ছেলেকে মনে পড়লো। কিন্তু তোমার আগে আরো-অনেকে এসে গেছে যে। অনেকেরই এই অবস্থা। মাসের পনেরো দিন টাকায় কুলোয় না কারোর। সত্যি বড্ড ক্রাইসিস, মীরা, মেয়েদের চাকরিবাকরি জোটানোও এই বাজারে মুস্কিল হ'য়ে পড়ছে। কিন্তু, আমি; আমিই-বা আর কত দেবো, চিরটা কাল তো দিয়েই এলাম। এখন, এখন মনে-মনে ঠিক করেছি, সবাই যখন টাকা-আনা-পাই-এর সঙ্গে পা মিলিয়ে চলে আমিও চলবো। আমিও এখন থেকে কোনো সংসারের জন্যে খয়রাতি সাহায্য না ক'রে খয়রাতি ঋণ দেবো মেয়েদের ভেবেছি, যাতে ওরা ধীরেসুস্থে ঘরদরজা গ'ড়েপিটে তুলতে পারে, ভাঙাচোরা সারিয়ে। পরে আমার টাকা ফিরিয়ে দিক। আর সুদ। হ্যাঁ, আমি এখন পর। বাইরের লোক। তাই সুদ নিচ্ছি। যে-টাকা প্রথম যৌবনে তোমাদের মতো ভালো সুন্দরী মেয়েদের সিনেমা দেখিয়ে রেস্টুরেণ্টে খাইয়ে আংটি আর ইয়ারিং উপহার দিয়ে খুইয়েছি সেই টাকা আমি সুদে-আসলে ফিরিয়ে নেবো। না-হ'লে আমার লাভ কি থাকছে বলো ?'

'ডিমাণ্ড থেকে সাপ্লাইটা এখন বেশি হচ্ছে ব'লে প্রেমিক বুঝি সস্তায় আর ভালোবাসা দিতে চাইছে না।'

অধ্যাপকের চোখে এই প্রশ্ন লিকলিকিয়ে উঠবে মীরা জানে। তাই মীরাও তার যথাযোগ্য উত্তর দেবে। 'হ্যাঁ, সুদ, এবং সেটা সে জায়গায় দাঁড়িয়ে আগাম আদায় ক'রে নিতে চেয়েছিলো।'

'কি রকম?' হীরেনের ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ ক'রে তাকানো ও হাঁ ক'রে থাকার পেছনে কি ঝড় বইবে মীরা তা মনের চোখে দেখলো। তাই ঝড়ের মুখে আগুন ছুঁড়ে দেওয়ার মতো হেসে ও বলবে, 'একটা চুমু।'

অধ্যাপক আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠবে কি? তার চাউনির মধ্যে মীরার আপাদমস্তক তাকানোর ভিতর অপরিসীম হর্ষ ও কৃতজ্ঞতা ফুটিয়ে হালকা নিশ্বাস ছেড়ে বলবে, 'যাক্‌—তবু যে তুমি টাকা না নিয়ে সসম্মানে ফিরে এসেছো। হোটেল। দুপুরবেলা। বেশির ভাগ লোক হয়তো বাইরে ছিলো। হাম্বাগটা যদি জোর জবরদস্তি করতো তো সেখানে তোমার কিছু করবার ছিলো না।'

মীরা হয়তো কথা না ক'য়ে কাপড়-জামা ছাড়ছে তখন। হঠাৎ তার চুপ থাকার কারণ অনুধাবন করতে না পারলেও হীরেন নিজের মার্জিত মসৃণ রুচিবান গলাকে, মীরা শুনুক না শুনুক, অধিকতর সূক্ষ্ম ক'রে দেয়ালের দিকে চোখ রেখে বলবে, 'আশ্চর্য মানুষের রুচি মন, অমরেশ কি অন্যভাবে মেয়েদের ওপর প্রতিশোধ নিতে পারছে না! না, আমি ককৃখনো বিশ্বাস করি না, যদি ও রবীন্দ্রনাথ পড়তো, যদি একদিনও ও রোঁলাকে হাতে নিতো—ছি-ছি, আরে ক্রাইসিস তো সব সময়ই আসে, তোরও টাকা আছে স্বীকার করছি, কিন্তু তাই ব'লে কি মনটাকে এমন নরক ক'রে রাখবি। স্কাউণ্ড্রেল! যাকৃগে, তারপর কোথায় গেলে, শুনি?'

'কোথায়, আর যাবার জায়গা আছে কোথায় এই শহরে!' কাপড়-জামা ছেড়ে মীরা বাথরুমের দিকে যেতে-যেতে বলতে পারবে তখন, 'কে আর আমার জন্যে মুঠি ভ'রে টাকা নিয়ে ব'সে আছে যে চট্ ক'রে গিয়ে হাত পাতলে উপুড় ক'রে ঢেলে দেবে। পুষ্পর কাছে লজ্জায় যাই না। তোমায় কাল বলেছি। আর থাকেন দাদা। তা সে-সব তুমি জানো। সুতরাং—'

তারপর হীরেন আর প্রশ্নই করবে না।. আর-কোথাও গিয়ে মীরা টাকা পেলে কি না।

তখন মীরা বলবে। হীরেন চুপ ক'রে যাওয়ার পরেই মীরা মুখ খুলবে। কেননা, এতক্ষণ আলাপটা বেড়ানোর বেড়া বেয়ে চলছিলো, এবার কাজের পাথরে পা ঠেকলো।

'সুতরাং কাল আর রেশন আসছে না। রেশন কেন, তোমার সকালের দুধ পাউরুটির পয়সাও বোধহয় ঘরে নেই! আমি আর কাল থেকে বেরুচ্ছি না। বাব্বাঃ, পুরো একটা সেক্শন, তিন মাইল রাস্তা পয়সার অভাবে আজ আমাকে হাঁটতে হয়েছিলো। তাই-না রাত বারোটা বাজলো ঘরে ফিরতে।'

কে না জানে স্ত্রীর পায়ে হাঁটার কষ্ট লাঘব করতে স্বামীরা মৌখিক সান্ত্বনার প্রলেপ দেয়: 'দরকার নেই আর এ-ভাবে বেরিয়ে, সত্যি কষ্ট হচ্ছে তোমার।'

কিন্তু এখানে হীরেন নীরব। বলার কিছু থাকবে না। 'কাল থেকে আমি চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ছি, দুটো টাকাও মেলে কি না।' হীরেন বলবে কি?

ইজিচেয়ারে শুয়ে রুগ্ন অধ্যাপক নিজের অক্ষমতার লজ্জা ঢাকতে হলদে শীর্ণ হেসে (রাত্রে বাল্‌বের নিচে কতদিন এই অদ্ভুত হাসি লক্ষ্য

করেছে মীরা) যখন নতুন ক'রে স্ত্রীর স্তুতি আরম্ভ করবে মীরা কিছুতেই তা সহ্য করতে পারবে না। হাত মুখ ধুয়ে, হীরেন খাক না খাক, সেই প্রশ্নও না ক'রে মীরা যখন সারাদিনের ক্ষুধা মেটাতে দিদিমণির জন্যে আলাদা-ক'রে-রেঁধে-দেওয়া মালতীর হাতের তৈরি খাবারের ঢাকনাটি ব্যগ্র হাতে তুলতে যাবে ঠিক তখন হীরেন মুখ খুলবে। 'না, সেজন্যে আমি চিন্তা করছিলাম না, বরং আজ একটু ভালো ছিলাম। সন্ধ্যের পর 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিসমেণ্ট' নিয়ে বসেছিলাম। পড়া যদিও বিশেষ হয় নি—'

শীর্ণ হলুদ, বোতলে পচানো আচার রঙ-এর হাসি ঠোঁটের আগায় ঝুলিয়ে হীরেন বলবে, 'খুব বেশি না ঠেকলে কি আর তুমি অত রাত করছো, ভাবছিলাম। দেখলাম তা-ই সত্য হ'লো। দেখো, মীরা, আমি আমার হৃদয়ের সবচেয়ে তলাকার মহলের খবর বলছি, সেখানে আমার শান্তি, আমি ঘুমিয়ে আছি বললে চলে, এতটুকু ভাবনা নেই।'

'কি রকম ?'

খুঁচিয়ে কি-একটা বা'র করার চেষ্টায় মীরা যদি হঠাৎ ভ্রূযুগল ধারালো ও দৃষ্টিকে প্রখর ক'রে তোলে তো হীরেনের সেখানে করার কিছু থাকে না। কেননা নিজের অসুস্থতা এবং সংসারের শত অভাবের মধ্যেও স্বামী শান্তি ও আরাম পায়, কারণটা স্ত্রীকে জেনে রাখতে হয় বৈকি !

মীরা চোখ ফেরায় না।

হীরেন দেয়ালে চোখ রাখতে চেষ্টা করে যদিও।

'কি, খুলেই বলো না।' হীরেনকে ভীত দেখলে মীরা আরো অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠবে।

'তুমি, মীরা, তুমি।' ঠোঁটের আগায় আবার মোলায়েম আচার-রঙ

হাসি ফুটবে হীরেনের। 'তুমি যে চার আনার পয়সাও স্কাউণ্ড্রেলটার কাছ থেকে চেয়ে আনো নি, তোমার রুচি, সংযম—ওখানেই আমার শান্তি, আমার বড়ো সম্পদ। অনেকটা পথ হাঁটতে হয়েছিলো বুঝি ?'

মীরা আর কথা কইবে না। আঁচাবে, মুখ মুছবে। কিন্তু অধ্যাপক সেখানেই যদি থামতো। ঘরের আলো নিভবে, মীরা শোবে। হয়তো নিজে তখন বিছানায় না গিয়ে, মীরা যদি মশারিও ফেলে দেয়, বিছানার কাছে ইজিচেয়ারটি টেনে ব'সে হীরেন রাত একটার পর সিগারেট মুখে গুঁজে কথা শুরু করবে। বিশেষ, বেশিরাত্রে মীরার ঘরে ফেরার মহৎ কারণ আজ এ-ভাবে ঘটেছে অধ্যাপক যখন শুনলো। হীরেন মশারি তুলে মীরাকে চুমো খেয়ে অভিনন্দন জানাতে সাহস পাবে না ঠিক, সারাদিনের ছুটোছুটির পর ঘরে ফিরে মীরা এত বেশি ক্লান্ত বোধ করে যে রাত্রে একবার বিছানায় গেলে আর-একটাও কথা বলতে ইচ্ছে হয় না তার। হীরেন হাসপাতাল থেকে ফেরার পর থেকে এটা বেশি হয়েছে।

কিন্তু তা হ'লে হবে কি।

এ-সব ব্যাপারে একলা বকতেও হীরেনের জুড়ি নেই। অসম্ভব জোর পায় সে তখন। অসুখবিসুখ মনে থাকে না। রাত একটার পর ইজিচেয়ার ছেড়ে একলা ঘরে রীতিমতো পায়চারি আরম্ভ করবে। মীরা ঘুমিয়েছে টের পেলে হীরেন দেয়ালের সঙ্গে কথা বলবে। দেয়ালে মীরার ফটোর দিকে তাকিয়ে অধ্যাপক তার বাছা-বাছা নীতিগর্ভমূলক শব্দগুলি প্রয়োগ ক'রে বক্তৃতা করবে: 'তার চেয়ে উপোস থাকা ভালো, বললে না কেন স্কাউণ্ড্রেলটাকে—হোয়াট্ এ প্রোপোজাল—কেন, তিনি বিয়েটিয়ে না ক'রে বাপ টাকা রেখে গেছে ব'লে ওই কর্মই করছেন নাকি ? আর-একজনের বিয়ে-করা-বৌয়ের গালে—হাউ সিলি, কত বড়ো ক্রাইম ! আমি ভাবতেই পারি না—

'অথচ এই অমরেশের দল সমাজের একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে, মীরা। এরা কম ক্ষতি করছে? ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারকে চোরকে আমরা গালাগাল দিই, জেলে পুরি, খুনীকে ধ'রে ফাঁসি দিই, টি-বি ম্যালেরিয়ায় দেশ লোপাট হ'য়ে যাচ্ছে ব'লে হাহাকার করছি। কিন্তু এ-সমস্ত ক্রিমিন্যালকে কি করা উচিত কি ভাবে শাস্তি দিতে হয় আমি জানি না।'

রাত ছুটো বাজলেও হীরেন চুপ করবে না।

তার গলা গুমগুম করতে থাকবে দেওয়ালে-দেওয়ালে। 'তুমি যে ফিরে আসতে পেরেছো, তুমি যে রাস্কেলটার খপ্পরে পড়ো নি। স্রেফ্ গুলি ক'রে মারতে হয়। ব্যাক্টেরিয়া। সমাজ-দেহের আসল রোগবীজাণু এরা। চিরকাল, চিরটাকাল মানুষের শিক্ষা সংস্কৃতি সভ্যতা ধ্বংস ক'রে এসেছে। শুধুই অভাবে মেয়েরা আর নষ্ট হচ্ছে কত, নষ্ট হচ্ছে বেশি ওই ইতরগুলোর জন্যে। লোফার্স—

'তুমি ভাবছো রেশনের অভাবে আমরা মরবো, মরছি; আমি ভাবছি যে ক-টা দিন বাঁচলাম ছু-জনে সুন্দরভাবে বেঁচে গেলাম, মীরা।

'মরলাম, কিন্তু তোমাকে হারালুম না। এই আমার সন্তোষ। ওষুধ পথ্য আরামের অভাবে অকালে ম'রে গিয়েও মনে এই সান্ত্বনা থাকবে। সত্যি, তোমার অমর্যাদা হচ্ছিলো, শুচিতায় লাগছিলো, আজ ছুপুরবেলা বলতে গেলে আমার জন্যেই টাকা যোগাড় করতে বেরিয়ে একটা জানোয়ারের সামনে গিয়ে পড়েছিলে।' হীরেনের গলা গদগদ করতে থাকবে। 'না, আলিঙ্গন চুম্বন গায়ে দাগ রাখে না সবাই জানে।'

সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে হীরেন এক-সময় বলবে, 'ও-রকম একটা কিছুর এক্সচেঞ্জে অমরেশ, এক-শ' কেন, লাখ টাকা দিতে পারে তোমায়, দিতো! ভালোবাসা কী না করে, মীরা, বলো—উঃ ভালোবাসা।'

একবার চুপ থেকে, কতক্ষণ পায়চারি করার পর, মীরা ঘুমিয়ে পড়েছে টের পেলে হীরেন আর হাঁটবে না। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিতে-দিতে মশারির দিকে তাকাবে। মীরা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত এ-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'তে হীরেন নিশ্বাস বন্ধ ক'রে একবার ঘাড় সোজা ক'রে ধরবে। তারপর ক্লান্ত শরীর চেয়ারের ক্যানভাসে ছড়িয়ে দিয়ে অভ্রভেদী দীর্ঘশ্বাসে ঘরের অন্ধকার মথিত ক'রে আরম্ভ করবে, 'না, কিছুই করার থাকে না, একটা-কিছু ক'রে এসে তুমি যদি লুকোও, আমি কি ক'রে জানবো—অসম্ভব, তাই নয় কি মীরা ?

'লাখ টাকার একটা আনবিক অংশ খরচ করলে শুধু কমলালেবু কেন, আঙুর আপেল, দিশি ইনজেকশনে ভালো কাজ হচ্ছে না ব'লে বিলিতি ওষুধ, মাখন পাউরুটি, কয়েক রকমের ভিটামিন বড়ি, বাড়িতে ব'সে আছি সত্ত্বেও আমার আবার একসেট্ জামাকাপড় জুতো, সবে বেরিয়েছে নাম-করা বিলিতি বই ম্যাগাজিনের গাদা ও প্রকাণ্ড একটা রজনীগন্ধার ঝাড় নিয়ে আজ যদি দুপুর রাতে ঘরে ফিরতে, তোমার পাতিব্রত্য দেখে আমার দু-চোখ উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হ'ত মীরা, কিন্তু—'

যেন ঢোক গিলতে গিয়ে সেই ফাঁকে হীরেন ঈষৎ হাসবে। অন্ধকারে শিশিতে পচানো আচার-রঙ হাসিটা মীরা দেখতে পাবে না যদিও, আচারের অম্লমধুর ঝাল ও নুন মেশানো বাক্যগুলো শুনবে। রোগা লোকের কথার ঝাঁজ বেশি।

'ওষুধ খাবো রুটি-মাখন-ফলও খাবো ধোপদুরস্ত জামাকাপড় প'রে, কোথাও যখন বেরুবো না এই ইজিচেয়ারে শুয়ে-ব'সে কাল সকালে তোমার কিনে আনা নতুন বই পড়তে ও বুক ভ'রে রজনীগন্ধার সৌরভ নিতে আমার আটকাবে না মীরা, আটকাতো না যদিও, কিন্তু—

'তার আগেই হীরেন চক্রবর্তী শেষ হ'য়ে যেত, যাবে। আমি বিষ খাবো। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখতে ঠাণ্ডা নীল শক্ত হ'য়ে প'ড়ে আছি এখানে, এই চেয়ারে।

'চুম্বনে দোষ নেই, মীরা।'

আবার একটা দীর্ঘশ্বাসের ঝলক দিয়ে অন্ধকারের পেট চিরতে-চিরতে অধ্যাপক মশারির দিকে সন্তর্পনে মুখ ফেরাবে। 'দোষ প্রতারণার। দোষ সব-কিছু-দেওয়ার পিছনে কিছুই-না-দেওয়ার বঞ্চনার। এ আমি সহ্য করতে পারবো না। টের পাবো, আমি ঠিক টের পেয়ে যেতাম তুমি যদি এসে কিছু না-ও বলতে। কেন, কি ক'রে, তা বলা মুস্কিল যদিও, আর মুখ ফুটে কিছু বলতে পারবো না বলেই তো সব বলা অন্যভাবে শেষ করতাম তখন। মেয়েদের মধ্যে জিজ্ঞাসার কোনো চিহ্ন যখন খুঁজে পায় না পুরুষ তখনই সে সবচেয়ে বেশি দিশাহারা হয়, পাগল হয়, আত্মহত্যা করে।'

এত সব কথা।

লম্বা-লম্বা নিশ্বাসের করাত চালিয়ে হীরেন ব'লে শেষ করবে। না, বিষ খাবে না সে। ঘরে এক ফিনাইল ছাড়া অন্য কোনো বিষ বা বিষাক্ত ওষুধ নেই যদিও। মীরার চেয়ে হীরেন তা জানে বেশি। আর শত মান অভিমান রাগারাগির মধ্যেও রাস্তার ট্র্যাম-বাসের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা ক'রে চলতে মীরাকে যেমন সতর্ক হ'য়ে পা ফেলতে হয় তেমনি ফিনাইলের ড্রাম তো মোটা জিনিস, সাধারণ আয়োডিনের শিশি বেঞ্জিনের কৌটোটাও ভুলক্রমে খাবার ওষুধের সঙ্গে মিশবে ভয়ে হীরেন সর্বদা তটস্থ থাকে। ঘরে জায়গা কম। একটা শেল্‌ফেই ওর টুকিটাকি সব ধরাতে হয়। তাই দিনের বেলায় ভাবনার কিছু নেই, রাত্রে ওষুধ খেতে হ'লে পাঁচ বার আলোর নিচে ফাইলটা ধ'রে লেখাটা প'ড়ে

তবে সে ছিপি খোলে। অনেক রাত হ'য়ে যাচ্ছে মীরা ঘরে ফিরছে না। দুশ্চিন্তায় মাথা গরম হ'লেও। হীরেন কোনো সময় দিশা হারায় না। আর, এক সিগারেট খাওয়া ছাড়া কোনোরকম অনিয়মও পারতপক্ষে সে করে না। সুতরাং—

দীর্ঘশ্বাসের করাত চালিয়ে রাত্রির বাকি অন্ধকারটুকু চিরে ফালি-ফালি ক'রে হীরেন ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘরে সকাল এনে ফেলবে। আর মীরা ঘুম থেকে ওঠা মাত্র হেসে বলবে, 'বায়ু চড়া হয়েছিলো কাল, ঘুম আর এলো না। তা না হ'লেও আমার, আমি খারাপ বোধ করছি না, বরং অন্যদিন ঘুম না-হ'লে পেটে উইণ্ড হয়, আজ তা-ও না। বেশ ভালো বোধ করছি।'

এতটা—

এত প্রফুল্ল ও সজীব বোধ করবে হীরেন কাল মীরা একটি কপর্দকও অমরেশের কাছ থেকে গ্রহণ না ক'রে আজ হেঁটে ঘরে ফিরেছে শুনলে। মীরার তা-ও সহ্য হবে। সহ্য হবে না কাল দিনের বেলা থেকে-থেকে হীরেন যখন কথার ঘায়ে আর-একটি ছেলেকে ক্ষতবিক্ষত করতে থাকবে। 'ইডিয়ট—ইডিয়ট কি আর-কাউকে এই প্রোপোজাল দিতে পারলো না। শেষটায় তোমার মতো মেয়েকে—ননসেন্স। মুখে চাবুক মারতে হয়। আমি বলবো নিশ্চয় এই ধরনের কোনো মেয়ের, হয়তো বিয়েও হয়েছে, দেখা পেয়েছে সে। তাই ওর বুকের পাটা এত বড়ো হয়েছে। তাই-না ঝুপ্ ক'রে আজ তোমাকেও এমন প্রস্তাব—আরে সবাই তো একরকম না, সব কি তোর মতন।'

হয়তো মীরা তখন রেশনের চিন্তা করছে, বাড়িভাড়া ঝিয়ের মাইনের কথা ভাবছে।

'বুঝেছো মীরা, মানুষের আসল চেহারাটা বাইরে থেকে বোঝা কঠিন। কী ক'রে তুমি বুঝবে, কী ক'রে জানবে যে অমরেশের প্রকৃতি এই। আমাদের সমাজে সভ্যতার পলস্তারা লাগিয়ে এরা বেঁচে তো আছেই, ঘাড়েগর্দানে দিব্যি মোটা হচ্ছে, বাড়ছে, কেউ আটকাচ্ছে না। পাঁচজনের সঙ্গে হোটেলে বাস করছে, দশজনের সঙ্গে সমান আসনে পাশাপাশি ব'সে ট্র্যামে-বাসে চলছে, সভাসমিতি করছে, রাজনীতি করছে, ভোট দিচ্ছে। সমাজের কোনো ক্ষেত্রে এদের চেক্ করা হয় না, হচ্ছে না ব'লে এই সমাজের ধ্বংস অনিবার্য। প্রগতিতে আমি বিশ্বাস করি, আমিও প্রগতিবাদী, কিন্তু তার আগে এই কুকুরগুলোকে গুলি ক'রে—' ইত্যাদি।

দশ

ধর্মতলা স্ট্রীটের রাত এগারোটা।

পেভমেণ্টে লোকজন কম চলাফেরা করছিলো কি! রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা কমতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু তবু মীরার মনে হ'লো সে এই মুখর চলমান ফুরফুরে হাওয়ায় নাওয়া আলোর নিশান ওড়ানো সুন্দর পরিবেশে নেই। রাসবিহারী অ্যাভিনিউর দোতলার খুপ্‌রিতে হীরেনের কথা শুনছে, ঘরের গুমোটে ঘামছে।

এমন কি এখানে এই বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে মীরার কপালের রগ ছুটো টিপ্‌টিপ্‌ করছিলো। এত বিচিত্র গন্ধ ছাপিয়ে তার নাকে এসে লাগছে আচারের বোয়মের মধ্যে ধ'রে রাখা ঘরের টকো পচা পুরোনো গন্ধ।

সত্যি, কী অবিশ্বাস্য রকম খারাপ লাগে মীরার হীরেন যখন রোগা শরীরটা ইজিচেয়ারে ছড়িয়ে দিয়ে ফ্যাকাশে হেসে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমাজ সংসার নিয়ে বক্তৃতা করে। এত বড়ো বক্তৃতা মীরার শুনবার সময় কই। মীরার একটিও কথা না বলা দেখে কি হীরেন তা বুঝতে পারে না?

কিন্তু এত বড়ো বক্তৃতা, এত সব কথা হীরেনকে আজ বা কাল বলার সুযোগ মীরা দেবেই বা কেন। মীরা ছু-পায়ের ওপর শক্ত হ'য়ে দাঁড়ায়। ইঞ্জিনের শব্দের মতো ওর বুকের মধ্যে ধক্‌ধক্‌ শব্দ হয়।

ছি-ছি, যদি সত্যি সে এ-ধরনের একটা কথা গিয়ে বলে তো অমরেশ-সম্পর্কে মীরাই কি সবচেয়ে বেশি অবিচার করলো না?

অথচ মীরার সংসারখরচ বাবদ পাঁচ হাজার টাকার এই চেক বলতে গেলে একটি কথা বলার আগে অমরেশ লিখে দিয়েছিলো।

হ্যাঁ, হোটেল থেকে এক সঙ্গে দু-জনে বেড়াতে বেরোবার আগে। গঙ্গার পারে গিয়ে ঘাসের ওপর বসবার আগে। কার্জনপার্কের আধো-আলো ও অন্ধকারে দু-জনে হাত ধরাধরি ক'রে হাঁটছিলো না তখনও।

এই টাকার বিনিময়ে মীরা অমরেশকে কতটুকু দিলো, কি দিতে পেরেছে? বলতে গেলে কিছুই না। অথচ কোনো শর্ত বা সুদ রাখা দূরের কথা, চেকটা মীরার হাতে তুলে দিয়েই সে সকলের আগে বললো, 'ভালো ক'রে হীরেনের চিকিৎসা করিয়ো।'

ভাবতে-ভাবতে মীরার দু-চোখের কোনা চকচক্ ক'রে উঠলো।

'না, অমরেশ এত হীন নয়, অমরেশ নীচ নয়।' এখান থেকে স্বামীর কানে কথাগুলো ছুঁড়ে মারতে ইচ্ছে হ'লো মীরার। যদি সে তা পারতো।

বাসে উঠে মীরার মনে হ'লো, অমরেশের এটা বাড়াবাড়ি। 'দরকার হ'লে তুমি আমার হোটেলে তো না-ই, দিনকতক বাড়ি থেকে বেরোনোই বন্ধ ক'রে দাও।'

এ কি ক'রে সম্ভব মীরা ভেবে পেলে না। অমরেশের টাকা ভেঙে-ভেঙে খাবে, ইচ্ছে মতো সারাদিন ঘরে থেকে হীরেনকে সাহচর্য দেবে, আর, ইচ্ছে থাকলেও সে একদিন বেরোতে পারবে না একবার অমরেশকে গিয়ে দেখতে। একটা কঠিন আদেশ মাথার ওপর চাপিয়ে দিলে ব'লে মীরার অমরেশের ওপর কেমন রাগ হ'লো, অভিমান। বস্তুত মানুষের ভালোবাসার কত রূপ কত বিচিত্র এর অভিব্যক্তি মীরা তাও ভাবলো। আর সবচেয়ে মজার, একজনের সঙ্গে আর-একজনের ভালোবাসা মেলে না। মীরা সুখে থাকুক, মীরার স্বামী ভালো হ'য়ে উঠুক, দূর থেকে দেখেই অমরেশ সুখী।

আর কাছে পেয়ে, শরীরের নাগালের মধ্যে মীরাকে চব্বিশ ঘণ্টা আটকে রাখার লাইসেন্স নিয়ে হীরেন তার ভালোবাসার রঙকে দিন থেকে দিন কেমন গাঢ় ক'রে তুলছে, মনে করার চেষ্টা করলো ও। না, একদিনও আর অমরেশকে দেখতে যাবে না, একটা কথা নয়। অমরেশ মহৎ, মানুষ হিসেবে হীরেনের চেয়ে অনেক বড়ো, মীরার চেয়ে এ-কথা আর কেউ বেশি জানে না।

একগাদা যাত্রীর সামনেই মীরা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। এক-শ' জোড়া লোলুপ সতৃষ্ণ চোখ ওর সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে—শুধু এইটুকু উপলব্ধি ক'রে কোনার একটা সীটে ও চোখ বুজে চুপচাপ ব'সে রইলো। জানলার খড়খড়ির গায়ে ওর মাথা ঠেকানো।

না, মীরা শুধু এক জোড়া চোখই ভাবছিলো, একটি মুখ, একজনের শূন্য বুক, অমরেশের শূন্য ঘর। আর সেই নিঃসঙ্গ শূন্য বুকের ভিতর লুকোনো হীরার পিণ্ডের মতো ভালোবাসা।

যা-ই বলুক হীরেন, মীরা মনে-মনে স্থির করলো, দিন-রাত চব্বিশ-ঘণ্টার মধ্যে একবার অন্তত সে না বেরিয়ে পারবে না, অমরেশকে একটি বার না দেখে। অমরেশের নিষেধ শুনছে না ও। ছলছুতো ক'রে যে-কোনো একটা কাজের দরকার নিয়ে রোজ দুপুরে একবার তাকে হ্যারিসন রোডের দিকে আসতেই হচ্ছে।

চোখ বুজে মীরা তাই ভাবছিলো।

কখন সুবিধা হয়?

এমন কোন্ সময়টি তাদের জীবনে আসে যখন মীরাকে দিয়ে হীরেনের অন্তত তখনকার মতো আর-কিছুর দরকার থাকে না; এমন একটা ফাঁক। যাতে-না অমরেশের নির্দেশেরও অমান্য করা হ'লো।

স্বামীর সেবাশুশ্রূষা ভোগ সান্নিধ্যলিপ্সার পেয়ালাগুলো পূর্ণ ক'রে দিয়েই ও বাড়ির বাইরে পা বাড়াচ্ছে। হোটেলে এসেছে। 'তোমায় দেখতে এসেছি।' বলবে মীরা। না-হ'লে অমরেশ বেজায় ধমক দেবে।

একদিক থেকে সে হীরেনের চেয়েও বেশি গোঁড়া, কঠিন। মীরার মনে হ'লো। না-হ'লে ঘর থেকে চিরকালের মতো বেরিয়ে আসা ভোমরাকে ওই ক-টা টাকা দিয়ে বিদায় করবে, আর হীরেনের অসুখ শুনে বিয়ের পর থেকে মীরার অভাব যাচ্ছে শুনে ফস্ ক'রে এত টাকার একটা চেক কাটে সে?

মীরার কপালের রগ দুটো টিপ্‌টিপ্ করছিলো। ইঞ্জিনের শব্দের মতো বুকের ভিতর দুব্‌দুব্ আওয়াজ হচ্ছিলো; হীরেনের চেয়ে অনেক বেশি সেন্টিমেন্টাল অমরেশ। মীরা তার অভিজ্ঞতার কাঁটাকম্পাস দিয়ে আবার দুটি পুরুষ-চরিত্র জরিপ করলো। করতে হয় তা'কে। কেননা আজ শুধু দিয়ে-যাওয়ার মধ্যে যখন এত উৎসাহ, এই উত্তাপ—যদি কখনো পায়, যখন অমরেশ একটি মেয়ের কাছ থেকে পেতে শুরু করবে তখন তার চাওয়ার দাবিতে পাওয়ার অধিকারে সে কতটা উত্তাল হ'য়ে উঠবে মীরা তা কল্পনা করতে পারে না কি।

সেটা অবশ্য ভবিষ্যতের কথা। তখন মীরা তা'কে কি দিতে পারে!

কিন্তু এখন?

অমরেশকে ও কতটা দিয়ে এলো এই অপরাধ-বোধে মীরার বুকের ভিতর ভার-ভার ঠেকছিলো। কিছু না, কিছুই দেওয়া হয় নি।

তাই মীরা ঠিক করলো, ওর চেক রাখা চলবে না।

পুরুষ তার মর্জি মতো বলে, চলে। কিন্তু নারী হ'য়ে মীরা তা হ'তে দিচ্ছে কেন। একদিকের বিশ্বাস রাখতে কি আর-একদিকের বিশ্বাসকে

সে পুড়িয়ে মারছে না? অমরেশ ভেতরে-ভেতরে কতটা দগ্ধ হচ্ছে চিন্তা ক'রে মীরা শিউরে উঠলো।

না, কিছুতেই সে এই চেক ভাঙাবে না। 'আমি কিছু পাই নি। হেঁটে আজ বাড়ি ফিরেছি। অমরেশ কে আমি জানি না, চিনি না ওকে।' মীরা ঘরে ফিরে বলবে, 'কাল থেকে রেশন বন্ধ।'

কাল পরশু যেদিন হোক একটা সময় ক'রে ও চেকটা ফিরিয়ে দিয়ে আসবে। কথাটা চিন্তা ক'রে মীরার এখন ভালো লাগলো। ঘুণাক্ষরেও তার সংসারে অমরেশের প্রসঙ্গ উঠবে আর বেচারা এখন-তখন লাঞ্ছিত হবে, অপমানিত হবে, মীরা চায় না। তার সদিচ্ছা, শুভ্র আকাঙ্ক্ষা, মীরাকে স্বামীর ঘরে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে দেখার সোনালী বাসনার গায়েও হীরেন কাদা ছিটোতে থাকবে, মীরা তা হ'তে দিতে রাজি নয়। না, একটি কপর্দকও অমরেশের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না।

প্রতিদানে মীরা তাকে কিছু দিতে না পারুক, তার আকাশের মতো নীল সুন্দর প্রশস্ত ইচ্ছাকে রাসবিহারী অ্যাভিনিউর খুপ্‌রির মধ্যে টেনে এনে খামোকা একজোড়া চটির তলায় থ্যাত্‌লাতে দেওয়া কেন?

মীরার চোখের কোনা আবার চক্‌চক্ ক'রে উঠলো। বিয়ের পর অমরেশকে সে অনেকদিন দেখে নি। একরকম ভুলে ছিলো। আবার তাই হোক। আবার তা না-হ'লে মীরা স্বামীর সেবা শুশ্রূষা সান্নিধ্য-সুখের জন্যে শরীর পাত করতে পারবে কেন। সব না ভুললে!

কী ক'রে ভোলা যায়, কী করলে একেবারে ভুলে থাকতে পারবে, মীরা নতুন ক'রে ভাবতে লাগলো। ঘিঞ্জি বাসের গুমোট থেকে জানলার বাইরে মাথা রেখে যখন চিন্তা করছিলো ও, আর তার এই অসহায় অবস্থা থেকে রক্ষা করতে ঈশ্বরকে মনে-মনে ডাকছিলো, তখন হঠাৎ একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বাসটা দাঁড়িয়ে পড়লো। সঙ্গে-সঙ্গে

একটা সোরগোল শুনতে পেলে মীরা। বস্তুত গণ্ডগোলটা গাড়ি থামবার আগেই শুরু হয়েছে কি না অন্যমনস্ক থাকার দরুন ঠিক বুঝতে পারলো না ও।

চোখ মেলে যেন এই প্রথম দেখলো মীরা বেশ বড়োসড়ো গাড়ি। স্টেট-বাস। ডবল-ডেকার।

ভিতরে অনেকগুলো আলো।

অনেক লোকই তো এক সময় উঠেছিলো।

এতটা রাস্তা আসতে-আসতে অনেক যাত্রী নেমে গেছে। ভিতরটা তাই এখন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকছিলো। সবাই সবার মুখ দেখতে পারছে এমন।

মীরা চমকে উঠলো, মীরা একটি মুখ দেখে ভয় পেয়ে গেল, লজ্জায় তার দুই কর্ণমূল লাল হ'য়ে উঠলো।

সব ধোপদুরস্ত জামাকাপড়-পরা বাবু।

আর এত রাত্রে বাবুপাড়ামুখো বাসে বাবুরা ছাড়া অন্য যাত্রী বড়ো-একটা থাকে না, এ মীরা রোজই দেখছে।

কা'র পকেট যাচ্ছিলো তাই হৈচৈ।

'এমনি তো বেশ টাই-স্যুট-পরা ভদ্রলোক।' একজন চিৎকার ক'রে বললো।

'মশাই, শালারা বেজায় ধূর্ত। বাইরের চেহারা দেখে কিছু বুঝবেন না। চুরি ডাকাতি, মেয়ে বাগানো থেকে শুরু ক'রে যত শালা গুণ্ডা পিকপকেট স্যুট প'রে এখন ঘোরাফেরা করছে, টের পান না?'

'হ্যাঁ, যুদ্ধের পর বাঁদরগুলো সংখ্যায়ও বেড়েছে।' একজন বললো, 'রুজি-রোজগার নেই, লোকের পকেট কাটবে না তো কি, তাকিয়ে দেখছেন কি, দিন-না মশাই বেশ দু-ঘা বসিয়ে।'

'আর্টিস্ট, বলছেন উনি একজন শিল্পী। এই ধরনের জঘন্য কাজ ম'রে গেলেও তার দ্বারা সম্ভব হ'ত না।' কে-একজন দো-ভাষী হ'য়ে বললো।

'চুপ, স্কাউণ্ড্রেল! নিজের চোখে দেখলাম ভদ্রলোকের পকেটের মধ্যে হাত যাচ্ছিলো। আমার চোখকে ফাঁকি! আমি সি. আই. ডি-ইন্সপেক্টর নিবারণ গুপ্ত। একবার দেখেই মালুম করতে পারি কোন্‌টা ক্রিমিন্যাল।'

'পুলিসে হ্যাণ্ডোভার করুন।' রাশভারী গলায় পিছনের এক ভদ্রলোক বললো, 'খেতে না পাস রিক্সা টান্‌গে। হেডিং-ফেডিং ক'রে লোকের চোখে ধোঁকা লাগিয়ে ইতরোমো ক'রে বেঁচে থাকার শখ কেন।'

'আগে দু-ঘা দিন-না বসিয়ে আপনারা, আগে তো হাতের সুখটা করুন। তা তিনি ছবি আঁকেন কি পকেটমারের দলের সর্দার সে-বিচার পরে হবে। আমার তো মনে হয় ওই শালার পিছনেও মস্তবড়ো একটা গ্যাঙ রয়েছে। চোর গুণ্ডা বদমায়েস পিকপকেট শহরে বড়ো বেশি বেড়ে গেছে।'

'এখানে আপনার বাড়ির নম্বর কত, রাস্তার নাম কি?' সি. আই. ডি. নিবারণ গুপ্ত মুখ খিঁচিয়ে উঠলো।

মৃগাঙ্ক মজুমদার বাড়ির নম্বর বললো, রাস্তার নাম। তারপর সকলের চোখে পড়ে এ-ভাবে মীরার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো।

গাড়িতে আর যাত্রিণী ছিলো না। এমনি এক-একজন লক্ষ বার ক'রে মীরাকে দেখছিলো, এই চুরির হামলা সামনে রেখেই। এবার চোর ঘন-ঘন মীরার দিকে তাকাতে সবাইর চোখ গোল ও গলা নীরব হ'য়ে গেল।

মীরা ঘেমে উঠলো।

নিবারণ গুপ্ত বেশ কায়দা ক'রে মীরাকে প্রশ্ন করলো, 'আপনি কি মনে করেন যে-ভাবে ওর হাতটা বুড়ো ভদ্রলোকের পকেটের দিকে যাচ্ছিলো তাতে—আপনার কি ধারণা?'

'না, এঁকে আমি চিনি। আমার পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন। আর্টিস্ট। অতি সৎ লোক উনি।'

'তো আপনি এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিলেন কেন, অনেকক্ষণ আগেই এ-কথা বলা উচিত ছিলো। প্রতিবেশী বিপন্ন হ'লে সামাজিক কর্তব্য হিসেবে এখানে সকলের আগে আপনাকেই তাকে রক্ষা করতে হবে। সৎ অসৎ আমরা জানি কি।' যার পকেট মারা যাচ্ছিলো সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক মীরার মুখের কাছে মুখ বাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলো। যেন বিরক্তি ও বিদ্রূপ দুই-ই ছিলো তার কথায়। আর-একজন মীরার কানের কাছে মুখ নিয়ে এলো। 'নিশ্চয়, বুড়ো মানুষ। চোখের ভ্রম হ'তে পারে। তা ট্র্যামে-বাসে কে কা'কে চিনছে বলুন। চোর সাধু বাইরে থেকে আজকাল বোঝা যায় কিছু?'

মীরা চোখ নামালো।

কিন্তু নামিয়ে রাখবে কোথায়।

বিশ জোড়া জুতো ও চটি তার পায়ের কাছে গিস্‌গিস্ করছিলো। চোখ তুলতে এবার নিবারণ গুপ্তর সঙ্গে মীরার চোখোচোখি হ'লো। একটা নোট-বই হাতে সি. আই. ডি. মীরার বুকের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়বার চেষ্টায় ছিলো। তার দুই জুল্‌পি বেয়ে দর্‌দর্ ক'রে ঘাম ঝরছে।

'যাকগে, যা হবার হয়েছে। আপনি কিছু মনে করবেন না। নিতান্তই পুলিশের লোক উপস্থিত আছি ব'লে কয়েকটা ফরম্যালিটিজ

আমাকে সারতে হচ্ছে, যদি—' গুপ্তর মুখের জর্দা-পানের গন্ধটাও মীরার নাকে এসে লাগছিলো।

মাথাটা পিছনের দিকে সরিয়ে নিলে মীরা। গলার স্বর ও মুখের রঙ যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা ক'রে বললো, 'আপনার যা প্রশ্ন করার করুন।'

'আপনাদের বাড়ির রাস্তার নাম কি ?'

মীরা রাস্তার নাম বললো।

'বাড়ির নম্বর ?'

মীরা নম্বর বললো।

'আপনি—মানে ওই বাড়িতে আপনার সঙ্গে আর কে আছে ?' গুপ্তর কপালে কুঞ্চন।

'স্বামী। নাম শ্রীহীরেন চক্রবর্তী।' রুদ্ধস্বরে মীরা বললো।

'ব্যস্, আর-কিছু লাগবে না, আর দরকার নেই।' বত্রিশটা দাঁত বা'র ক'রে অফুরন্ত জর্দা-পানের গন্ধে গাড়ির বাতাস আমোদিত ক'রে সি. আই. ডি. হাসলো। 'মানে ছিটেফোঁটা সংশয় থাকা পর্যন্ত আমরা কেস্ হাতছাড়া করি না। তা আপনার কথার চেয়ে আর সত্য এখানে কিছু হ'তে পারে না, মানে হওয়া উচিত নয়। যাক্‌গে, আপনি না বাঁচালে অর্থাৎ মুখ না খুললে আর্টিস্ট ভদ্দরলোকের আজ কী দুর্ভোগ পোহাতে হ'ত, ছি-ছি।' গাড়িশুদ্ধু লোক হেঁ-হেঁ ক'রে উঠলো।

বাতাস পাত্‌লা হ'য়ে গেছে, মামলার রসতসও আর রইলো না কিছু টের পেয়ে কণ্ডাক্টর এবার ঘণ্টি বাজিয়ে চিৎকার ক'রে বললো, 'তব্ উতার যাইয়ে মাঈজী; আপকো স্টপেজ আ গিয়া।'

বস্তুত স্টপেজ এসে গেছে টের পেয়ে চোর চুরি করতে উদ্যত

হয়েছিলো কিনা মীরা ঠিক বলতে পারলে না, তবে নিজের স্টপেজের নাম শুনে ও চমকে উঠলো। এতক্ষণ খেয়াল করে নি।

গাড়ি থেকে মীরা আগে মজুমদারকে নামতে দিলে, পিছনে নামলো ও। আর-কেউ নামলো না।

একটু জ্যোৎস্না, একটু বিজলী আলো, ফুরফুরে হাওয়া ও কৃষ্ণচূড়ার সুন্দর ঝিলমিলে ছায়াভরা নির্জন পেভ্‌মেণ্টের পটভূমিকায় দু-জনের দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্যটা উপভোগ করতে বাসের যাত্রীরা জানলার বাইরে এক সঙ্গে গলা বাড়িয়ে দিয়েছিলো, মীরা লক্ষ্য করলো। ঝুলন্ত অনেকগুলো মুখ বোঝাই হ'য়ে সরকারি ডবল-ডেকার রাত্রির অন্ধকারে সাঁতার কাটতে-কাটতে দূরে মিলিয়ে গেল।

'আপনি এত রাত্রে?' মজুমদার প্রথম কথা বললো এবং ঈষৎ হাসতে চেষ্টা করলো।

মীরা গম্ভীর হ'য়ে রইলো।

একটা ট্যাক্সি চ'লে গেল সামনে দিয়ে। উল্টো দিকের ফুটপাথ ধ'রে দুটি ছেলে শিস দিতে-দিতে যাচ্ছিলো।

'এত রাত কি, এগারোটা পঞ্চাশ। লাস্ট্‌ বাসে রোজই তো ক-দিন ধ'রে বাড়ি ফিরছি।'

'তা আমি লক্ষ্য করি। প্রায়ই দেখছি বেশ রাত হয় আপনার বাড়ি ফিরতে।' মজুমদার অল্প শব্দ ক'রে হেসে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করলো। মীরা তেমনি গম্ভীর। গম্ভীর থেকে পরে প্রশ্ন করলো, 'আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?'

'বৌবাজার, এক বন্ধুর কাছে।' আর্টিস্ট এবার আর হাসলো না।

ট্র্যামের শব্দ হ'লো যেন হঠাৎ দূরে।

ট্র্যামে উঠবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলো দু-জন। এখনো ট্র্যাম চলে কি?

দু-জনই নিশ্বাস ফেলার শব্দ করলো। আর সেই শব্দ শেষ হ'তে না হ'তে দেখা গেল লাল আলোর ডুম ঝুলিয়ে ঘণ্টা বাজাতে-বাজাতে ট্র্যামের তার মেরামতের গাড়ি এসে গেছে। অর্থাৎ অনেকক্ষণ তার ছিঁড়ে আছে এ-লাইনের। মই খাটিয়ে এবার ছেঁড়া তার জোড়া দিতে এসেছে মিস্ত্রি।

'ট্র্যামের আশা গেল।' আক্ষেপের সুরে মীরা বললো।

কিন্তু উৎসাহের সুরে মজুমদার তৎক্ষণাৎ বললো, 'এইটুকু তো রাস্তা, মন্দ কি হেঁটে কথা বলতে-বলতে যাওয়া যাবে দু-জনে, চলুন। এসে তো প্রায় গেছি।'

'এইটুকু রাস্তা হাঁটতেও আমি টায়ার্ড ফীল্ করছি।' মীরা অসম্ভব গম্ভীর হ'তে চেষ্টা করলো। রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলো ও। রিক্সাগুলোকে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিলো না।

'সবাই বলে এ-পাড়ায় এখন প্রাইভেট-কারের ছড়াছড়ি, তাই এ দুর্দশা।' গলা পরিষ্কার ক'রে মৃগাঙ্ক বললো, 'ট্যাক্সি রিক্সা কিছু চোখে পড়ছে না।'

'না, ট্যাক্সি ডেকে আমার পোষাবেও না। পয়সা নেই।' শুকনো উদাসীন গলা মীরার এবং একটু বিরক্তিও ছিলো।

'আমার অবস্থা আরো কাহিল।' মজুমদার আবার হাসতে চেষ্টা করলো। 'আজ ব'লে নয়, রোজ আমি এই মোড় থেকে হেঁটে চ'লে যাই। অভ্যেস হ'য়ে গেছে। তাই বলছিলাম আপনার যদি—'

মীরা কথা কইলো না।

'তার চেয়ে বরং এক কাজ করা যাক। আসুন, ঐ একটা চা-এর দোকান খোলা আছে। দু-কাপ তো আগে খেয়ে বিশ্রাম করি। চাই-কি ইতিমধ্যে যদি এক-আধটা রিক্সা এসে যায়।'

প্রস্তাবটা মীরার মন্দ লাগলো না।

চোর গুণ্ডা বদমায়েস পিক্‌পকেট না কি আসলেই শিল্পী এই নিয়ে প্রতিবেশীর চরিত্র সমালোচনা করার সময় ছিলো না ওর। আর-একটি মানবচরিত্র তাকে সেই কঠিন মুহূর্তে আবার ভাবিয়ে তুলেছে।

হীরেন ঘুমোবে না। কিছুতেই ঘুমোতে পারে না মীরা যতক্ষণ না ঘরে ফিরছে। রাত বা দিনদুপুর সকল সময়েই এক অবস্থা। জানলায় উঁকি দিয়ে হাজার বার রাস্তা দেখবে আর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবে টেবিলের ঘড়ি। ছবিটা মীরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। এখন এই মধ্যরাত্রে ঘরে ফেরার সময় যদি পাশের ঘরের 'হাম্বাগ'টা থাকে তো মীরাকে, অত্যন্ত করুণ গলায় যদিও, জেরা ক'রে-ক'রে হীরেন রাত ভোর ক'রে ফেলবে।

আর মীরা ঘুমিয়ে পড়লে অন্ধকার দেওয়ালের সঙ্গে কথা শুরু হবে।

'বুঝি না কি ক'রে মানুষ এত নির্লজ্জ হয়। না, আমি একটু সেরে উঠি। ঠিক ইজেক্টমেণ্টের নোটিশ আনবো। ছাট্ উইল বি মাই ফার্স্ট ডিউটি। দেখতে পাচ্ছিস ভদ্রমহিলার সঙ্গে কেউ নেই। কোন্ লজ্জায় তুই তাঁর পিছু-পিছু হেঁটে বাড়িতে ঢুকছিলি। আমি জানি তোর সঙ্গে মীরা একটাও কথা বলে নি। আমার ওয়াইফ মনে-মনে তোকে ঘৃণা করে। কারণ ভদ্রতার মাথা খেয়ে তুই একটা ফ্যামিলি-কোয়ার্টারে এসে বাসা বেঁধেছিস। পাড়ার আর-দশটা লোক ওপ্‌ন এয়ারের জন্যে জানলায় নাক জাগিয়ে ব'সে থাকে। তারা নিশ্চয় দৃশ্যটা দেখেছে। তোর সম্বন্ধে তাদের কি রকম ধারণা জন্মাবে? আর্টের দোহাই দিয়ে তুই সব ফর্সা করতে পারিস, কিন্তু, কিন্তু আর-দশটা লোক আমাকে মীরাকেও ক্ষমা করবে না। তারা দেখবে বাস্তব দিকটা। মানুষ হিসেবে তুই কতটা কাণ্ডজ্ঞান রাখিস?'

কিন্তু শুধুই দেওয়ালের সঙ্গে কথা ব'লে কবে হীরেন নিবৃত্ত হয়েছে।

পরদিন সকালে তার প্রথম প্রশ্ন হবে, 'বাসে কোথায় তোমার সঙ্গে

রাস্কেলটার দেখা হয়েছিলো? কি বলছিলো? গাড়ি থেকে নেমেও সারাক্ষণ বকর-বকর করছিলো? আর্ট, মডার্ন ছবির কথা?'

মীরা চুপ থাকবে। কিন্তু হীরেন থামবে না।

ঘরময় পায়চারি করবে আর দেওয়ালের সঙ্গে কথা বলবে। 'তুমি একটিও কথা বলো নি আমি জানি। কিন্তু, কিন্তু তাতে এ-সব লোক লজ্জা অপমান বোধ করে না, তুমি ঠিক জেনো। এদের শিক্ষা দিতে একমাত্র চাবুক, চাবুক। পুলিশে ধরিয়ে দিও আর-একদিন এমন অভদ্র ব্যবহার দেখলে।' বাতাসের গায়ে ধারালো ছুরি চালাবার মতন জিহ্বার হিস্-হিস্ শব্দ তুলে অধ্যাপক রাত্রির প্রসঙ্গটাকে পরদিন দুপুর পর্যন্ত টেনে নিতে কসুর করবে না। মীরা যতই চুপ থাক। রেশনের চিন্তায় যতই সে ছিন্নভিন্ন হোক।

এখন, একসঙ্গে এত রাত্রে শুধু ঘরে ফেরাই নয়, এইমাত্র পকেট-মারের মামলা থেকে শিল্পীকে মীরা বাঁচিয়ে এনেছে।

আবার বাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এখুনি না বেচারাকে আর-একটা মামলায় পড়তে হয় সেজন্যে মীরা ভাবছে কি ব'লে আগে ওকে ঘরের দিকে পাঠায় বা নিজে আগে যায়। প্রস্তাবটা ভদ্রতার বাইরে। ভাবতে-ভাবতে ভয়ানক বিব্রত বোধ করতে চায়ের দোকানের প্রস্তাব হঠাৎ মীরার ভালো লাগলো।

বাড়ির কাছে এসে এত রাত্রে পেভমেণ্টের ওপর এ-ভাবে দু-জনের দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে অন্তত ভালো।

•

'আজ সারাদিন চায়ের মুখ দেখি নি।'

দোকানে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে মজুমদার ব'সে পড়লো। মীরা উল্টোদিকের চেয়ারে বসলো। চুপ ছিলো ও।

'আপনাকে বলতে বাধা নেই মিসেস চক্রবর্তী ক-টা দিন ভীষণ অভাবের মধ্যে আছি।'

মীরা এবারও কথা বললো না। আর্টিস্ট লম্বা আঙুল দিয়ে কপালের লালচে ঝাঁকড়া চুল পিছনের দিকে সরিয়ে দিতে-দিতে করুণভাবে মীরার মুখের দিকে তাকায়।

মীরার বুকের মধ্যে কেমন খুট্ ক'রে ওঠে।

একটু আগে গাড়িতে যা ঘটতে চেয়েছিলো তার সঙ্গে এর যোগাযোগ আছে কি। ভাবলো ও। বয় এসে দাঁড়াতে মীরা দুটো চা-এর অর্ডার দিলে।

'কোথায় গিয়েছিলেন ?' মীরা আবার প্রশ্ন করলো।

'বৌবাজারে এক বন্ধুর কাছে।' আর্টিস্ট স্থির অপলক চোখে মীরাকে দেখছিলো। 'কিছু টাকার জন্য যেতে হয়েছিলো, পাই নি যদিও।' কথা শেষ ক'রে একটা পোড়া সিগারেট পকেট থেকে বা'র ক'রে যেন সিগারেট ধরাতে হঠাৎ উঠে কোন্ দিকে গেল।

মীরা আজ এই প্রথম লক্ষ্য করলো প্রতিবেশীর গায়ের কোটটা পিঠের দিকে অনেকটা ছেঁড়া। ঐ একটা প্যাণ্টুলন যেন মাসাধিক পরছে কোথাও বেরুচ্ছে যখন। গোড়ালি ক্ষ'য়ে গিয়ে জুতো দুটো চ্যাপ্টা মেরে গেছে। বেশ দুর্দশায় পড়েছে মজুমদার, মীরার বুঝতে কষ্ট হ'লো না।

মজুমদার সিগারেট ধরিয়ে ফিরে এলো। ইতিমধ্যে চা এসে গেছে। মুখের ভার ডুবিয়ে দিয়ে চোখেমুখে এবার প্রফুল্লতা আনতে চেষ্টা করলো মীরা। মেধাবী হাসি ফুটলো ওর সুন্দর দুই ঠোঁটে।

'আর্টিস্ট, শিল্পী আপনি। মনের আনন্দে আঁকবেন আর দুই হাতে পয়সা লুটবেন। অভাব কেন ?'

মজুমদার নীরব।

'চা খান।' ব'লে মীরা নিজের বাটিতে একটা চুমুক দিয়ে পরে চোখ তুললো।

'আমাদের বাঁধা-মাইনের চাকরি। তা-ও মিস্টার চক্রবর্তী দু-মাসের ওপর অসুস্থ হ'য়ে ঘরে বসা। অভাবটা যে আমাদের কানের কাছে বেশি সাঁই-সাঁই করছে।'

একচুমুক চা গিলে মৃগাঙ্ক মাথা নাড়লো।

'হ্যাঁ, বলছেন ঠিক কথাই। মনের সবটুকু আনন্দ ঢেলে দিয়ে উৎসাহের সঙ্গে যদি আঁকতে পারতুম অর্থাভাব হ'ত না।' কথা শেষ ক'রে হাত-দিয়ে-ধরা-যাচ্ছে-না সিগারেটের টুকরোটায় দ্রুত দুটো টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে মীরার চোখে চোখ রাখলো।

'তবে আঁকুন।' মীরা বললো, 'আপনার ঝঞ্ঝাট নেই, একলা মানুষ, সারাদিন ব'সে কত ছবি আঁকতে পারেন। তা ছাড়া এ যখন পরের চাকরি নয়। যত ছবি তত পয়সা।'

'কিন্তু ছবি যদি বিক্রি না হয়?' মৃগাঙ্ক বাঁকা হাসলো।

'ভালো ছবি আঁকলে বিক্রি হবেই।' যেন অন্যমনস্কের মতো কথাটা ব'লে মীরা হঠাৎ চুপ করলো। কেননা সেই মুহূর্তে আবার তার মন খারাপ হ'য়ে গেছে। ছক্ ক'রে কথাটা মনে হয়েছে। এখানে চা খেতে গল্প করতেই মীরা আসে নি। একটা বড়ো বিশ্রী অভদ্র কাপুরুষোচিত প্রস্তাব শেষ ক'রে এখুনি তাকে বাড়ি ফিরতে হবে।

কিন্তু তথাপি মীরা হাতের ঘড়ি দেখলো না।

এ-ধরনের একটা প্রস্তাব কোনো ভদ্রলোককে দেওয়া যায় না। বলা যায় না যেহেতু এত রাতে আমি ও আপনি এক সঙ্গে বাড়িতে ঢুকলে আমার স্বামী অন্যরকম কিছু ভাববেন সুতরাং আগে পিছনে আমাদের

যেতে হচ্ছে। ঘৃণা ও অপমান বোধে মীরার দুই কান লাল হ'তে লাগলো। বুকের ভিতর কেমন জ্বলছিলো।

ঘড়ি দেখলো না সে এই কারণে দেরি হওয়াকে সে ভয় করছে না। ধর্মতলা থেকে হেঁটে বাড়ি ফিরতে রাত ক-টা বাজতে পারে ঘরে ব'সে তা অনুমান করা চলে না। তা ছাড়া আজই তার বাইরে যাওয়া শেষ। কাল থেকে ঘর আর ঘর। আর উপোস।

ধারকর্জ চাওয়ার মতো জানাশোনা লোক কলকাতায় তার ফুরিয়েছে। যাদের কাছ থেকে কর্জ করা যায় তাদের টাকা মীরা ঘরে আনবে না নানা কারণে।

কালই অমরেশের চেকটাকে ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত মনে পাকাপাকি ক'রে মীরা মৃগাঙ্কর চোখের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ হাসলো।

'ভালো ক'রে আঁকুন। আপনার অভাব থাকবে না।'

'মুস্কিল হচ্ছে এই ভালো ক'রে আঁকতেই পারছি না। অনুপ্রেরণার অভাব। মাঝে-মাঝে ভিতরে আশা জাগে, শক্তি টের পাই। মনে হয়, ভালো একটা মডেল পেলে এমন ছবি আঁকবো যা বিক্রি ক'রে লক্ষ রজতমুদ্রা আমি ঘরে আনতে পারবো। সুন্দর ছবির মূল্য দিতে এ-শহরে লক্ষপতির অভাব নেই।'

'তবে আঁকছেন না কেন,' মীরা বলতে পারলো না। ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ চোখে আর্টিস্টের চোখের রক্তের ছিটা দেখতে লাগলো।

'আমার একটা মডেল ছিলো মিসেস চক্রবর্তী। কিন্তু যখন আঁকলাম দেখা গেল তার প্রত্যেকটা রেখা আমাকে বিট্রে করেছে। রূপের পরিবর্তে ফুটেছে বিদ্রূপ, লাবণ্য এনে দিয়েছে বীভৎসতা। সেই ছবি দেখেই মানুষ আঁৎকে উঠছে, কিনে নিয়ে ঘরের দেয়ালে টাঙাবে কি?'

মীরা কথা কইলো না।

'তাই আমার দারিদ্র্য। না-হ'লে—না-হ'লে রঙ তুলি উদ্যম ইচ্ছে কোনোটার অভাব ছিলো না।' ব'লে চুপ ক'রে পেয়ালার চা-টুকু শেষ করলো মৃগাঙ্ক।

'আর চা খাবেন?' মীরা প্রশ্ন করলো।

মৃগাঙ্ক মাথা নাড়লো।

'বাসে সি. আই. ডি-র লোকটা কেমন কড়াভাবে আমার দিকে তাকিয়েছিলো আপনার মনে পড়ে?'

মীরা মাথা নাড়লো। বাস্-এর কোনো কথাই এখন তার মনে নেই। বার-বার মনে হচ্ছে আর-একজোড়া কঠিন চোখ। হাতের পেয়ালা নামিয়ে রেখে বললো, 'ভালো সুন্দর একটা মডেল কি কোথাও পাওয়া যায় না?'

'যায়, মীরা দেবী, কিন্তু কম, লাখে একটি পাওয়া কঠিন। সত্যি-কারের সুন্দর মডেল বলতে যা বোঝায়। তাই-না আমাদের আঁকিয়েদের এই দুর্দশা। চা আর দরকার নেই। আপনি বরং আমায় একটা সিগারেট আনিয়ে দিন।'

মীরা তৎক্ষণাৎ বয়কে ডেকে সিগারেটের কথা ব'লে দিলে। তারপর ক্লান্ত বিষণ্ণ ভঙ্গিতে টেবিলের কোনায় দুটি কনুইয়ের ভর রেখে হাতের তেলোয় চিবুক ঠেকিয়ে আস্তে-আস্তে বললো, 'সুন্দর মডেল আপনি কা'কে বলছেন?'

'আপনার দেরি হচ্ছে খুব, মিসেস চক্রবর্তী। তা ছাড়া বাড়িতে কর্তা অসুস্থ। রিক্সা-টিক্সা কিছু বুঝি আর আসবে না। দেখবো একবার উঠে গিয়ে?'

'আপনি ব্যস্ত হবেন না।' মীরা বললো, 'দেরি আমার রোজই হচ্ছে। হবে। একলা মানুষ বাইরের দশটা কাজ সেরে সন্ধ্যেয় ঘরে ফিরবো, এ আমি তো নয়ই, তিনিও আশা করেন না।'

'রোজ দেখি অনেক রাত ক'রে আপনার ঘরে ফেরা। রাস্তার দিকের জানলাটায় আমি চুপ ক'রে ব'সে থাকি তখন। উঃ, কী কষ্টসহিষ্ণু আপনি!'

মীরা চুপ।

বয় এক প্যাকেট সিগারেট ও একটা দেশলাই টেবিলে রেখে গেল।

মৃগাঙ্ক নতুন সিগারেট ধরিয়ে বললো, 'সত্যি, সুন্দর মডেল লাগে একটা মেলে মীরা দেবী। তা-ও না।'

'রাত্রে একলা জানলায় ব'সে কেবল ছবির কথা ভাবেন বুঝি?'

মজুমদার তার উত্তর দিলে না। বললো, 'আপনি সুন্দর। আপনাকে দেখে যে-কোনো শিল্পী স্বীকার করবে, এই হ'লো রূপ, আসল রূপের মডেল।'

মীরার দুই কান লাল হ'য়ে উঠলো।

'না, আর-একটু চা খাওয়া যাক, আমি ভয়ানক টায়ার্ড, মৃগাঙ্কবাবু। সারাদিন কী ভীষণ ঘুরতে হয়েছে আজ।'

মৃগাঙ্ক চুপ।

মীরা আরো দু-কাপ চা আনালে।

'আমার মধ্যে আপনি এত কি রূপ দেখলেন?' নিজের এবং মৃগাঙ্কর বাটিতে আরো এক চামচ চিনি বেশি মিশিয়ে মীরা বললো, 'সব শিল্পী যে আপনার সঙ্গে একমত হবে তা-ই বা জানছেন কি ক'রে, চা খান।'

মৃগাঙ্ক চায়ে চুমুক দিয়ে মীরার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। অমরেশ ও হীরেন ছাড়া তৃতীয় এক পুরুষের চোখে নিজেকে এই প্রথম দেখে মীরার কেমন-একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। তাই সে আর মডেলের কথা তুললো না। না-তুলে, যেন তখনও তার পেয়ালার

চিনি গললো না, চামচটা আস্তে-আস্তে নাড়তে লাগলো। তারপর এক-সময়ে আস্তে-আস্তে বললো, 'না, গাড়ির আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি। আপনি আঁকুন। আমি বলছি। আপনার এ-অবস্থা থাকবে না।'

মৃগাঙ্ক তেমনি চুপ থেকে সিগারেট টানতে-টানতে মীরাকে দেখছিলো। রেস্টুরেণ্টে আর দ্বিতীয় খদ্দের নেই। সামনের প্রকাণ্ড দরজা দুটো দিয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ভিতরে ঢুকলো। এলো খানিকটা ফুলের সৌরভ। কা'দের বাগানে এরি মধ্যে যেন হাস্নুহানা ফুটেছে। মীরা ভাবলো।

'আপনি বিশ্বাস করবেন না মিসেস চক্রবর্তী, যখন বাস্-এ সবাই আমাকে মারতে উদ্যত, পুলিশে হ্যাণ্ডোভার করার কথা হচ্ছে, আমি অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে আপনাকে দেখছিলাম। রিয়েলী!'

মীরা কথা কইলো না।

'রূপ, রূপ। আর সেই রূপের মন্দিরের মধ্যে জ্বলছে ত্যাগ তিতিক্ষা সংযম সেবা স্নেহ প্রেম মমতার মোমবাতিগুলো। আমি চোখ ফেরাতে পারি না।'

'চা খান।'

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠস্বর মীরার। আর-কোনো কথা বলতে পারলো না ও। কপালের রগ দুটো আবার বিশ্রীরকম টিপ্‌টিপ্ করছিলো।

'ইউ আর বিউটি অব বিউটিজ। ভিতর ও বাইরের রূপের এই সমন্বয় আমি আর-কোনো মেয়েতে দেখবো না। কী আশ্চর্যভাবে টিউন্ড হ'য়ে আছে।' মৃগাঙ্কর গলা গুমগুম ক'রে উঠলো।

'কি রকম?' প্রশ্ন করতে গিয়ে মীরা থেমে যায়। ঘড়িও আর অবশ্য দেখলো না ও। চুপ ক'রে শুনলো প্রতিবেশী চিত্রকরের কথা। খোঁপাটা হাওয়ার ঠেলায় খুলে গিয়ে কালো ফুলের তোড়া হ'য়ে ওর কাঁধের ওপর ঝুলছিলো।

'যে-মেয়ের মন সুন্দর না, লাখ মন সৌন্দর্য প্রকৃতি থেকে চুরি ক'রে আনলেও পুরুষ তাকে ঘৃণা করে এটা স্বীকার করেন তো?' আমি করি। আমার মডেলটা জঘন্যরকম ফাঁকি দিয়েছিলো। তাই এমন গরিব হ'য়ে আছি মিসেস চক্রবর্তী।'

মীরা হাত দিয়ে খোঁপা ঠিক করলো।

'আপনার হৃদয়ের সুষমাই শরীরের সবগুলো রেখাকে এমন সুন্দর সিমেট্রিক্যাল ক'রে দিয়েছে। মনের গাঢ় রং গায়ের রঙে বুলিয়েছে গ্রীষ্মের চাঁপার উজ্জ্বলতা।'

'আপনি কি আমায় আগে দেখেছিলেন, বিয়ের আগে?' মীরার গলায় বেহালার ছড়্ টানার সুন্দর একটা শব্দ হয়।

'নিশ্চয়, হাণ্ড্রেড টাইমস।' মৃগাঙ্ক আর-একটা তাজা সিগারেট বা'র ক'রে ঠোঁটে গুঁজলো। সিগারেট ধরিয়ে দুই চোখ আধবোজা রেখে ধোঁয়াটা গলাধঃকরণ ক'রে বললো, 'শিল্পীর চোখ সবাইর দিকে থাকে। সব-মেয়ের আগে-পিছনে তার দৃষ্টি। বিফোর অ্যাণ্ড আফটার ম্যারেজ। অ্যাণ্ড ইউ আর দি বেস্ট্।'

একটা সুন্দর শিহরণ মীরার কাঁধ ও মেরুদাঁড়া বেয়ে পায়ের দিকে নেমে গেল।

'কী চোখ নাক চিবুক পা বাহু গলা! আমরা তরুণ শিল্পীরা তখন আপনার নাম দিয়েছিলাম মিস ক্যাল্‌কাটা।' মজুমদার টেবিলের ওপর থুঁত্‌নিটা বাড়িয়ে দিলে। 'এ গার্ল অব এক্সকুইজিট বিউটি, অ্যাণ্ড নাউ এ বিউটিফুল লেডি।' কথা শেষ ক'রে মৃগাঙ্ক ক্ষীণ হাসলো।

মন্দিরের ঘণ্টা বাজলো মীরার বুকের মধ্যে। পুরুষের মুখে শিল্পীর মুখে রূপস্তুতি শুনে কোন্ মেয়ে আছে মীরার বয়সের যে সারা গায়ে রোমাঞ্চ অনুভব করে না! মীরা টেবিলের কাছে ঘন হ'য়ে

এলো। কথা বলতে পারলো না যদিও। যেমন পারছিলো না ও হাত তুলে ঘড়ি দেখতে।

'তার ওপর এসে মিশেছে প্রেম মমতা সেবা। অপূর্ব!'

রূপমুগ্ধ শিল্পী মৃগাঙ্কর চোখে লাল মশাল জ্বালিয়েছিলো। সেই মশালের আলোয় চুপ ক'রে ব'সে মীরা ঘামতে লাগলো। কাঁপছিলো ও একটু-একটু। আর অভিমানের নিঃশব্দ ফেনা বুকের মধ্যে ফুলে-ফুলে গলা পর্যন্ত ছাপিয়ে উঠলো।

মৃগাঙ্ক মীরার রূপ সম্পর্কে আরো কি বলছিলো, মীরা কান দিলে না কতকটা সময়। ভাবছিলো ও রূপের ব্যর্থতা।

'মিথ্যে কথা।' চিৎকার ক'রে তার বলতে ইচ্ছে হচ্ছিলো, 'যে প্রেম সেবা ও মমতার আলোয় উদ্ভাসিত উজ্জ্বল কল্যাণীরূপ আমার দেখছো, সে আমার আসল রূপ নয় শিল্পী, এগুলো আমার অনেকদিন খ'সে পড়েছে। এগুলো ছাড়া অমনি আমি রূপসী—প্রেম মমতা ও সেবাপরায়ণতার কোনো মূল্য দেয় নি ব'লে মীরাও এগুলোর আর দাম দিচ্ছে না এখন। সুতরাং এ-সব বাদ দিয়ে তোমার মডেল হিসেবে আমি কতদূর কাজে লাগবো বলো।' বলতে পারলো কই মীরা।

'যখন ভিড়ের মধ্যে প্রায় মার খেয়ে মরছিলাম হঠাৎ এক এঞ্জেল এসে আমাকে রক্ষা করলো। কেন, তার সার্থকতাটা কি এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছি।'

'কি সার্থকতা?' খসখসে গলায় এক-সময় মীরা প্রশ্ন করলো।

'তোমার দেবীমূর্তি।' খসখসে গলায় উত্তর করলো মৃগাঙ্ক।

'অদ্ভুত, অদ্ভুত। রোজ ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে যত দেখছি ভাবছি, আঃ, এই মডেল আঁকবো, এই ছবি তুলির টানে ফুটিয়ে তুলতে পারলে আমি গরিব থাকবো না।' যেন শিল্পীর চোখের সেই গাঢ় রক্তিম

আলো ক্রমশ নিস্তেজ হ'য়ে এলো। দৃষ্টিটা রোদ-লাগা জলের মতো এখন ঝলমল টলমল করছিলো মৃগাঙ্কর।

মীরা এবার স্বাভাবিক গলায় বলতে পারলো, 'আঁকুন। ভালো মডেল আঁকলে আপনার ছবি কাটবেই।'

'আমার আগের মডেলটা কে ছিলো আপনি কিন্তু একবারও প্রশ্ন করলেন না।'

'কে ?' চমকে চোখ তুললো মীরা।

'আমার স্ত্রী।' মৃগাঙ্ক নিঃশব্দে হাসলো।

যেন হঠাৎ কা'র কথা মনে প'ড়ে মীরা চুপ ক'রে রইলো।

'অবশ্য মিস্টার চক্রবর্তীকেও কম ঈর্ষা করি না সেজন্যে।' মজুমদার এবার চোখে নয় দাঁত বের ক'রে কুটিল হাসলো। 'কী রাইট আছে হীরেন চক্রবর্তীর শতেক শিল্পীর ধ্যানের ছবি ঘরে ধ'রে রাখার, একলা ইন্দ্রের সহস্র সুখ ভোগ করার ?'

মীরা কথা কইতে পারলো না। চোখ নামালো।

'অবশ্য এই ঈর্ষাও আমাদের ভুল।' গলায় একটা বড়ো হাসি টেনে শিল্পী নিজেকে সংশোধন করলো। 'হীরেন ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড আছে ব'লেই তো মীরা এত সুন্দর।'

মীরা গম্ভীর।

'ভোমরাকে তো আপনি চেনেন ?'

মৃগাঙ্কর প্রশ্নের জবাব দিলে মীরা শুধু মাথা নেড়ে।

'একজনের অ্যাম্বিশনের সঙ্গে আর-একজনের অ্যাম্বিশনের কত তফাৎ সেটাই দেখছি।' লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মজুমদার কড়িকাঠের দিকে তাকায় : 'রূপের বিকৃতি এঁকে হাত কালো করছিলাম, এই বেলা তার মহীয়সী মূর্তি এঁকে পাপস্খালন করবো।'

মীরা সত্যি তখন অপ্রস্তুত হ'য়ে গেছে। নার্ভাস বোধ করছিলো। মহীয়সী···সেবা···প্রেম···। কিন্তু এ যে কত ভঙ্গুর কত ক্ষীণায়ু!

মীরা অসহায় বোধ করছিলো এই ভেবে যে কি ক'রে এখন এই জঘন্য প্রস্তাবটা সে মৃগাঙ্কর কানে তোলে: একসঙ্গে দু-জন বাড়িতে ঢুকবো না। তা হ'লে বেচারা হীরেনের রাত্রের ঘুম চ'টে যাবে। সুতরাং—

রাগে দুঃখে মীরার কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছিলো। মনে-মনে সে ঈশ্বরকে ডাকলো।

আর সঙ্গে-সঙ্গে কালান্তক যমের মতো কোথা থেকে রেস্টুরেণ্টে এসে ঢুকলো বিপদ উকিল।

তারও দোষ নেই। রেস্টুরেণ্টের মালিক নিরাপদ তার বন্ধু। ঘরে একটু কণ্ট্রোলের চিনি জমেছিলো। তাই বেশি রাত ক'রে একটা মুনাফা রেখে চিনিটা সে বন্ধুকে ছেড়ে দিতে এসেছে।

মীরা দেবী ও মজুমদার একটা টেবিলে মুখোমুখি ব'সে আছে দেখতে পেয়েই বিপদ যেন সেদিকে তাকাবে না ঠিক ক'রে কড়িকাঠের দিকে চোখ রাখলো। একটু পরে টেবিলের ওপর শূন্য চায়ের বাটি রুটি ও ডিমের টুকরো এবং ছাইদানি ভরতি পোড়া সিগারেটের দিকে বক্র-দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিপদ, মৃগাঙ্ককে না, মীরাকে প্রশ্ন করলো, 'গাড়ি-টাড়ি আর পেলেন না বুঝি?'

তাকাবার মতো ক'রে চেয়ে হাতের ব্যাগটা ঠিক করতে-করতে মীরা বললো, 'আপনি, এখানে এত রাত্রে?'

'হ্যাঁ, আমি যে এর পিছনটাতে থাকি মিসেস চক্রবর্তী? এই এলুম খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু হাওয়া খেতে, ম্যানেজার আমার ফ্রেণ্ড কিনা।'

ব'লে খুঁত্নি নেড়ে অদূরে ক্যাশবাক্সের ওপর হুমড়ি খেয়ে ব'সে থাকা নিরাপদকে দেখিয়ে দিয়ে বিপদ বললো, 'পর-পর দু-দিন ভবনে গিয়ে ঘুরে এসেছি, মিসেসের সাক্ষাৎ পাই নি।'

'হ্যাঁ, বড়ো বেশি ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে আমাকে। ওর শরীরটা সারছে না আর চোখেমুখে আমি চারদিক অন্ধকার দেখছি।'

'হুঁ, তা কি আর বুঝি না, তা কি আর বোঝাতে হবে আমাকে।' ব'লে উকিল কুটিল দৃষ্টিটা একটু মোলায়েম করার চেষ্টায় ঈষৎ হাসলো, 'তা—তবু তো আপনি চালাচ্ছেন, চালিয়ে নিচ্ছেন যাহোক ক'রে কেন ভালোভাবেই। বিকেলে হীরেনভায়াকে বার-বার সে-কথাই বলছিলাম, আমাদের বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে তুই হ'লি সবচেয়ে লাকি হীরেন।'

মীরা শব্দ করলো না।

পরনে একটা লুঙ্গি, উলঙ্গগাত্র, পান খাওয়া ঠোঁটের কিনারে রস জমেছিলো বিপদের। জিভ দিয়ে রসটা চেখে নিয়ে বললো, 'তা কদ্দুর, কোথায় গিয়েছিলেন?'

'দাদার কাছে। ওর আবার ইনজেক্‌শন কিনতে হচ্ছে কাল।' ব'লে মীরা ভুরু দুটো একটু রুষ্ট করলো। এবং উকিলকে আর-কোনো প্রশ্ন করতে না দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে মৃগাঙ্ককে বললো, 'আমি উঠি, আপনি তো আপনার সেই বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করবেন?'

'কোন্ বন্ধু?' চমকে উঠলো মৃগাঙ্ক। মীরার চোখে চোখ রাখলো। তারপর চোখে নয় মীরার ঠোঁটের বাঁক দেখে সে ধাঁধার অর্থ বুঝতে পারলো। অল্প হেসে বললো, 'হ্যাঁ, ও ব্যাটা যদি মডেলটা না নিয়ে আসে কালও আর ছবি আঁকা হবে না। তার অর্থ কালও উপোস।'

মীরা গম্ভীরভাবে বললো, 'আচ্ছা আমি চলি, আমার হাতে টাকা নেই, বেরিয়েছিলাম, কেউ একটা আধুলি কর্জ দেয় নি।'

আর্টিস্ট তেমনি মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে বললো, 'তা কি আর আমি বুঝি না মিসেস চক্রবর্তী। হার্ড ডেজ্। আচ্ছা থাক, দেখি, আর-কারো কাছে পাই কি না।'

আর বাক্য ব্যয় না ক'রে এবং স্বামীর বন্ধু দণ্ডায়মান বিপদবরণের দিকে আর একবারও কটাক্ষপাত না ক'রে মীরা কাউণ্টারে গিয়ে বিলের টাকা মিটিয়ে দেয় ও আস্তে-আস্তে দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে যায়। মৃগাঙ্ক গম্ভীরভাবে সিগারেট ধরায়। এবং টাকা কর্জ না পেয়ে যেন অন্য-কিছু পেয়েছি চোখমুখের এমনি প্রফুল্ল ভাব ক'রে শিস দিয়ে ধোঁয়াটা মুখ থেকে ঠেলে বের ক'রে দেওয়ার চেষ্টায় সে যখন বিপদ উকিলের দিকে তাকায়, দেখা যায়, রাগে কট্‌মট্‌ করছে উকিল।

অর্থাৎ এ-ভাবে দু-জনের সহসা পৃথক হ'য়ে যাওয়া এবং বন্ধুপত্নীর শিষ্টাচার জনোচিত 'আচ্ছা চললাম, বিপদবাবু,' সম্বোধনটা না ক'রে মীরাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে জালে বাড়ি খাওয়া বোয়াল মাছের মতো বিপদের মাথার ভিতরটা বোঁ-বোঁ করছিলো।

ফ্যাল্‌ফ্যাল্ চোখে উকিল ফের টেবিলের বাসনকোসন ছাইদানির ছাই ও রুটি ডিমের টুকরোগুলোর দিকে তাকালো।

একটু পরিহাসের সুরে মৃগাঙ্ক প্রশ্ন করলো, 'দাদার খাওয়া-দাওয়া হ'য়ে গেছে? বৌদি এ-বেলা কি রান্না করেছিলেন?'

উকিল তৎক্ষণাৎ কথা বললো না। কেননা এই ধরনের জীবগুলোকে সে ঘৃণা ভয় দুই-ই করে।

'কেন, আমরা বাড়িতে বৌয়ের হাতের তৈরি পুঁই ছাঁচিকুমড়োর চচ্চড়ি দিয়ে ভাত খাই ব'লে ঠাট্টা করছেন নাকি? আপনারা না-হয় রেস্টুরেণ্টে স্টাইল ক'রে ব'সে কারি কাবাব কোর্মা কোপ্তা খাচ্ছেন।'

যেন অনেকদিক থেকে ঘা খেয়ে খিঁচড়ে গিয়ে উকিল তেরছাভাবে

কথার জবাব দিলে। কিন্তু উল্লুকটার মাথায় এই খোচাটুকু ঢুকলো না, মজুমদারের চেহারা দেখেই বিপদ বুঝলো।

কাপ-ডিসের মাঝখানে জুতোশুদ্ধ পা তুলে দিয়ে তেমনি শিস দিতে-দিতে রবীন্দ্রসংগীত ভাঁজছে। দেখে উকিল আরো জ্ব'লে উঠলো। হৈ-হৈ ক'রে বললো, 'আছেন আনন্দে। চক্রবর্তীর গিন্নি বুঝি খাইয়ে গেলেন।'

মৃগাঙ্ক এবার একটু গম্ভীর দেখাবার চেষ্টা করলো।

'বলি কদ্দূর যাওয়া হয়েছিলো দু-জনের?' উকিল আর-এক পা এগিয়ে টেবিল ঘেঁষে দাঁড়ায়।

মৃগাঙ্ক পা নামিয়ে সোজা হ'য়ে বসলো। 'বাস্-এ ওঁর সঙ্গে দেখা।'

'হুঁ, তা আমি দেখেই বুঝতে পেরেছি।' উকিল চোখ দুটো আরো গোল করলো। 'তা কেমন চলছে আপনার ব্যবসা। কি রকম বিক্রি-টিক্রি হচ্ছে ছবি?'

'কোথায় আর!' হাই তুলে মৃগাঙ্ক উঠে দাঁড়ায়। 'ছবির বাজার মন্দা।'

উকিল খলখল হেসে উঠলো। 'বাজার মন্দা! বলি মশাই, আপনারা সব আকাশে থেকে ছবি আঁকবেন, যা-খুশি-তা, সে-সব লোকে কিনবে কেন। যা বোঝে না পাব্লিক তা কিনে পয়সা নষ্ট করে না। এটা সর্বদা মনে রেখে ছবি আঁকবেন।'

মৃগাঙ্ক সকৌতুকে হীরেনের বন্ধু বিপদ উকিলকে দেখছিলো। উকিলের চোখের তারা দুটো গুলতির গুলি হ'য়ে ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছিলো।

একগাল হেসে উকিল বললো, 'মশাই, মডেল-মডেল ক'রে আকাশ-পাতাল হাতড়ান তরুণ শিল্পীর দল আর উপোস থাকেন। আরে প্র্যাক্‌টিক্যাল জিনিস আঁকুন। হাতের কাছে যেমনটি দেখেন, রোজ

আপনার পাশের ঘরে দেখছেন। তাই আঁকুন, কাটবে খুব।' ব'লে বিপদ উচ্চরবে না, এবার নীরবে ঠোঁট কাঁপিয়ে এবং উলঙ্গ রোমশ ভুঁড়ি-খানা নাচিয়ে-নাচিয়ে হাসতে লাগলো। 'কি, মিথ্যে বলছি আমি, খারাপ প্রস্তাব ?'

মৃগাঙ্ক অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলো।

'কি, মিথ্যে বললাম ?' ব'লে অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করতে উকিল মজুমদারের ঘাড়ের ওপর হাত রাখলো।

'হাতটা নামিয়ে নিন।' মৃগাঙ্ক চোখ লাল করলো। হাসি বন্ধ হ'লো বিপদের এবং ভুঁড়ি নড়া থামলো।

'আপনি যেন কেমন চ'টে গেলেন।'

'নিশ্চয়।' রুক্ষ গলায় মৃগাঙ্ক উত্তর করলো, 'একজন ভদ্র-মহিলাকে ইন্‌সাল্ট করছেন আপনি।'

'কে ভদ্রমহিলা, কা'কে আবার ইন্‌সাল্ট করলাম!' বিপদ আকাশ থেকে পড়লো। 'আপনি কি বলতে চাইছেন দয়া ক'রে একবার খুলে বলুন না।'

'ঐ যে মডেল, এই মডেল আঁকুন—'

'তাই বলুন।' সেয়ানা সুরে উকিল হাসলো। 'হীরেনের স্ত্রী আমাদের বন্ধুপত্নী। আপনি তাঁর সঙ্গে নিরিবিলি এখানে ব'সে একটু চা খেয়েছেন ব'লে আমি যাচ্ছে-তাই বলবো আর এই নিয়ে ঠাট্টামস্করা করবো আমায় এমন অপদার্থ ঠাওরাবেন না।'

মৃগাঙ্ক চুপ।

'কেন, রবিবাবুর গান গাই-না ব'লে বাব্‌রি রাখি না ব'লে হাওয়াই শার্ট গায়ে চড়াই না ব'লে কি আর্ট সম্পর্কে দুটো কথা বলার অধিকার নেই আমাদের।' উল্টো চাপ দিয়ে উকিল আবার চাপা হেসে নতুন

ক'রে ঠোঁট ও ভুঁড়ি কাঁপাতে শুরু করলো। 'আরে মশাই এক-বাড়িতে থাকছেন, রাতদিন দেখছেন, হীরেনের বৌ কেমন একখানা ঝি জুটিয়েছে লক্ষ্য করেছেন কি? ইয়েস্, মহিলার রুচির সুখ্যাতি করছিলাম বরং এতক্ষণ। আপনারা অজন্তা ইলোরার গর্ত হাঁট্‌কে মরছেন। বলি, ঘরের পাশে কি আছে একবার চোখ মেলে তাকান। ঐ প্র্যাক্‌টিক্যাল মালতীকে এবার তুলির টানে গানের লাইনে নাচের ঠমকে গল্পের খাতায় ফুঠিয়ে তুলুন। তবে তো লোকে তা গ্রহণ করবে। সাধারণ লোক ছবির মধ্যে সাধারণ মেয়ে মালতীকে দেখতে চায়।' তারপর ফস্ ক'রে বিপদ মুখটা মৃগাঙ্কর কানের কাছে সরিয়ে নিয়ে বললো, 'এক নম্বর রাসবিহারী অ্যাভিনিউ থেকে শুরু ক'রে তিন-শ' বাষট্টি নম্বরের বাড়ি খুঁজে দেখুন—পাবেন না। টাস্‌ল বাঁধনে ওয়ালী রঙিন শাড়ি পরা চটি পায়ে পান খাওয়া লাল ঠোঁট টাপুসটুপুস মালতী এ-পাড়ায় দুটি নেই। তাই বলছিলাম, ঝি চাকর কুলি মজুরকে শিল্পের উপজীব্য ক'রে তুলুন, আপনাদেরও পয়সা হবে আর প্রকৃত গণ-শিল্পের পুনর্জাগরণ হবে।'

বিপদের কম্পমান ভুঁড়ি চকচকে চোখ ঠোঁটের বিস্ফার আর বত্রিশ-পাটি দাঁতের বিরাট নিঃশব্দ হাসি দেখে মৃগাঙ্কর বুকের মধ্যে ধুপ্ ক'রে উঠলো।

তথাপি উকিলের হাসি থেকেই যেন খানিকটা হাসি ধার ক'রে নিয়ে মৃগাঙ্ক বললো, 'আপনার অব্‌জার্ভেশন চমৎকার। ঠিক বলেছেন। চেষ্টা করবো। কিন্তু জানেন কি—'

'কি, কি?' উকিল চোখ পাকালো।

বিপদ মৃগাঙ্কর চেয়ে অনেক বেঁটে। থুঁত্‌নি তুলে প্রশ্ন করলো, 'আপনি অধ্যাপক-পরিবার সম্পর্কে অনেক বেশি ওয়াকেফহাল। নেক্স্‌ট-ডোর নেবার ওদের। আপত্তি করে নাকি হীরেন? কিছু বলেছে?'

মৃগাঙ্ক কথা বলার আগে বিপদ, যেন কি-একটা ধরতে পেরেছে, ঘনঘন মাথা নাড়লো।

'ও-সব হ'লো গিয়ে বুর্জোয়া মেণ্টালিটি, মশাই। তা আর আপনি আমায় বলবেন কি, আমি জানি না? অধ্যাপক হয়েছেন, দশ পাঁচখানা জ্ঞানীগুণীর বই পড়ছেন অস্বীকার করছি না। স্থনীতি বোঝেন, স্থনীতির চর্চা করেন। ভালো। কিন্তু সেটা খাটাতে গেলে চলবে কেন। মালতী বেচারা আপনার ঘরে মানে স্টুডিওতে গিয়ে কিছুটা সময় ব'সে দু-চারখানা ভালো মডেল দিয়ে যদি দুটো পয়সা উপ্‌রি রোজগার করে তো তোর তাতে আপত্তি করার আছে কি উল্লুক।' উকিল কুপিত হ'য়ে অদৃশ্য হীরেনকে ধমক দিলে।

'তোর ঘরের স্ত্রীলোকের রূপ আর-একজন নিতে পারবে না এই আব্দার তুই তোর বৌয়ের ওপর খাটা। ঝি-র ওপর কেন। কি বলেন?'

মৃগাঙ্ক এবার বেশ রসানুভব করছিলো। হেসে মাথা নেড়ে বললো, 'নিশ্চয়।'

'আরে মশাই, সাইকলজি কি আমরা বুঝি না। ওটাও হ'লো এক ভাবের এক্সপ্লয়টেশন। স্থনীতির নামে নিজে একলা দুনিয়ার বেবাক রূপরসগন্ধ ভোগের বাসনা। কেন, মালতী আপনার ঘরে গেলে, ও নিজে থেকে আপনাকে যদি ওর ছবি আঁকতে দেয় তো তুই বাধা দিস কেন। নীতি খসবে? তুই কি করছিস? কাজ করাচ্ছিস আর সারাদিন ইজিচেয়ারে শুয়ে-শুয়ে মেয়েটার রূপযৌবন চোখ দিয়ে চাটছিস, হ্যাঁ, আমরা বুঝি না, দেখি না এ-সব?'

উকিল মধ্যরাত্রে রাসবিহারী অ্যাভিনিউর চায়ের দোকানের সীলিং কাঁপিয়ে বক্তৃতা শুরু করলো।

'এরা হ'লো আসল জ্ঞান-পাপী মশাই, সমাজের বড়ো শত্রু। জ্ঞানের

আড়াল দিয়ে সর্বপ্রকারের পাপ স্বার্থপরতা সেরে নিচ্ছে। অথচ ধরতে ছুঁতে পাচ্ছেন না। এদের আগে গুলি ক'রে মারুন। সুনীতি!'

রেস্টুরেন্ট-মালিক নিরাপদ চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে উত্তপ্ত বিপদের কাঁধে হাত রাখলো। বিপদ তা ভ্রূক্ষেপ না ক'রে মৃগাঙ্ককে বললো, 'মশাই, আপনি আলাদাভাবে মালতীর সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট করুন। চক্রবর্তীর ঝি হিসেবে না। আমরা দশজন আছি মালতীর ক্যাণ্ডিডেট, বুঝেছেন। দশজন ওর ছবি কিনবো। আঁকুন। টু-পাইস আপনারও থাকবে।'

'আঁকবো।' মৃগাঙ্ক ঘাড় নাড়লো। মীরা চক্রবর্তীর দাসী সম্পর্কে বিপদ উকিলের এই উৎসাহ তাকে মুগ্ধ করলো। 'গুড্ আইডিয়া।'

কিন্তু সেই রসের আসরে জল ঢেলে দিতে এসেছে নিরাপদ। বিপদের কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলছে, 'এটা দোকান। ও-সব নোংরা আলাপ করতে তোকে এখানে কে ডেকেছে। এর বাড়ির ঝি আর ওর বাড়ির বৌ ছাড়া কি তোর গল্প জমে না। দিন-দিন বুড়ো হচ্ছিস আর মেয়ে-মানুষের নামে ক্ষেপে উঠছিস।'

ধমক খেয়ে বিপদ মুখ নামালো।

গলার স্বর তেমনি চড়া রেখে নিরাপদ মৃগাঙ্ককে বললো, 'আপনাদের বিল চুকিয়ে দিয়ে তিনি তো কখোন বেরিয়ে গেছেন। খামোকা আর ব'সে আছেন কেন আপনি। উঠুন এইবেলা, আমি দরজা বন্ধ করবো।'

মৃগাঙ্ক উঠে বেরিয়ে যেতে নিরাপদ বললো, 'কি বলছিলি এতক্ষণ বক্‌বক্ ক'রে?'

'আর বলবো কি।' যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে বিপদ থুঁত্নি নামালো। 'আমরা ক্ষেপে উঠি, আর এই যে এতক্ষণ ব'সে থেকে খাইয়ে গেল!'

যেন নিরাপদর কাছ থেকে কৈফিয়ৎ আদায়ের চেষ্টায় উকিল কটমট

ক'রে নিরাপদর মুখের দিকে তাকায়। 'এ-ব্যাপারে তুমি কি মন্তব্য করছো বন্ধু, শুনি? এ-পাড়ার ঝি ও-পাড়ার ধোবানীর জন্যে গরিবদের জিভে জল আসে মাঝে-মাঝে স্বীকার করি, কিন্তু তোর কফিখানায় দেখছি রাত বারোটার পর মিলন-বাসর বসে।'

'তা তোর অত বুক টাটায় কেন।' নিরাপদ এবার না-হেসে পারে না। 'যার যা খুশি করুক। খরচ করেছে, খাইয়েছে, তা তুইও একটা জোটা না। খুব খরচ ক'রে এই চেয়ার টেবিলে ব'সে খাবি দু-জনে। পারিস না?'

'না রে দাদা, আমাদের জীবনে হবে না।' মর্মান্তিক করুণ গলায় বিপদ উত্তর করলো প্রথমটায়, তারপর যেন হঠাৎ কি মনে পড়তে হো-হো ক'রে হেসে উঠলো।

'তোর মাথা খারাপ হ'য়ে গেল নাকি?' নিরাপদ প্রশ্ন করলো।

'একদম, বিলকুল খারাপ হয়েছে।' উকিল হঠাৎ বন্ধুর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে উঠলো, 'একদিকে কনকচাঁপা অন্যদিকে রজনীগন্ধা। দরজায় জানলায় রঙিন পর্দার বাহার, আহা তুই যদি দেখতিস নিরাপদ। আর স্বয়ং তিনি নিশ্চিন্তে লম্বা হ'য়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে রুটি মাখন ওভালটিন দুধ বিস্কুট টাট্‌কা মাছের ঝোলটি সব্‌জিটি খাচ্ছেন। মাথা আমার খারাপ হয়েছে বৈকি নিরাপদ। তোরা দশজন আমার মাথাটা খারাপ ক'রে দিলি।'

'বেশ তো, তুইও এমন-বৌ জোটা-না। মজা ক'রে ইজিচেয়ারে শুয়ে বিস্কুট ওভালটিন খাবি।'

'কোন্ দুঃখে? আমার কি পেটে আলসার হয়েছে, যে বিস্কুট মাখন! দেখ্ নিরাপদ—' বিপদের গলা আরো চ'ড়ে গেল, চোখ গোল-গোল। 'যদি বৌ রোজ এনে মাংস মিহিদানা খাওয়াবারও লোভ দেখায় আমি গলি না, টলি না।'

'মানে বৌকে ঘর থেকে বাইরে ছাড়িস না, এই তো ?'

'আলবৎ !' আঙুল দিয়ে বিপদ মীরা ও মৃগাঙ্কর পরিত্যক্ত শূন্য বাসনকোসন রুটি ও ডিমের গুঁড়ো ছড়ানো টেবিলটা দেখিয়ে দাঁত বা'র ক'রে ঠোঁট কাঁপিয়ে, ভুঁড়ি নাচিয়ে একটু আগে যেমন গুজ্‌গুজ্‌ ক'রে হেসে উঠেছিলো তেমনি হেসে উঠলো।

'দেখছো তো ব্যাপার-স্যাপার, বলি কতক্ষণ ছিলো, কত টাকার খাওয়ালো ?'

'তা তোর সেই খবরে কাজ কি ?'

ব্যবসায়ী নিরাপদ গম্ভীর হ'য়ে বললো, 'কতটা চিনি এনেছিস বা'র কর্।'

গুজগুজে হাসি থামিয়ে উকিল বললো, 'তুই পাকা ক্যাপিট্যালিস্ট ব'নে গেছিস নিরাপদ; এমন রসের বুকে ছুরি চালিয়ে নিজের চিনির কথাটা আগে তুলছিস। আরে, ভয় নেই, হীরেনের কানে আমি তুলতে যাচ্ছি না এ-সব। আমার দরকার কি পরের বেড়ার ফুটোয় নাক ঢুকিয়ে। রোজ দু-জনে এসে তোর দোকানে ফাউল মটন চালাক, যতো খুশি।' একটু থেমে পরে বললো, 'আইনের বইগুলো মুখস্থ ক'রে শালা কিচ্ছু হ'লো না, তাই বে-আইনী রসের গল্পগুলো শুনে এবং পাঁচজনকে শুনিয়ে প্রাণটা তাজা রাখি, বুঝলি না।'

উকিলের কথায় কান না দিয়ে নিরাপদ টপাটপ পাখা বন্ধ ক'রে সামনের দিকের প্রায় সব ক-টা আলো নিভিয়ে দিলে। বিপদ একদৃষ্টে টেবিলের শূন্য বাসনকোসনগুলির দিকে তাকিয়ে রইলো। তার পুরু কালো ঠোঁটে নিঃশব্দ কুটিল হাসি।

এগারো

মীরা আস্তে পা ফেলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলো। প্যাসেজটা অন্ধকার। রাত দশটা বাজতে এ-বাড়ির নিচের ভাড়াটেরা আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে এবং অধিকাংশ দিন নিজেদের ঘরের দরজায় খিল দেবার আগে ওপরে যাবার রাস্তার আলোও নিভিয়ে দেয়।

মীরা সিঁড়ির গোড়ায় এসে রোজ আলোটা জ্বেলে নেয় এবং তখন বেশ বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করে জিহ্বা ও ঠোঁট দিয়ে। 'অভদ্র।' নিচের ভাড়াটেদের মনে-মনে গালাগাল দিয়ে ও সিঁড়ি ভাঙে।

আজ সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলো।

আজ আলোটা জ্বলছিলো না দেখে ওর বরং ভালো লাগছিলো। ভয়ানক ক্লান্ত সে। কোনোরকমে ওপরে গিয়ে বিছানা নিতে পারলে বাঁচে।

কিন্তু সিঁড়ি ক-টা ডিঙিয়ে দোতলার বারান্দায় পৌঁছে মীরা চমকে উঠলো। এ-বাড়িতে এসে এই দৃশ্য আর ও দেখেছে মনে করতে পারলে না।

মীরা ঘরে না থাকলে হীরেন আলো নিভিয়ে দিয়ে আরাম-কেদারায় ব'সে অপেক্ষা করে, কি পায়চারি করে। ঘুমোয় না। বিছানা তো নয়ই, ইজিচেয়ারে শুয়ে কোনো-কোনো দিন ঘুমের ভান করে মাত্র। মীরার পায়ের শব্দে চোখ মেলে তাকায়, হাই তোলে, তারপর, অভ্যাস অনুযায়ী দুই হাতের তেলো দিয়ে চোখ রগড়াতে-রগড়াতে প্রশ্ন করে, 'ক-টা বাজে, ক-টা বাজলো? ব'সে থেকে-থেকে আমি যেন এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

অপেক্ষমান স্বামীর এটা অভিযোগ না ঘুমজড়িত গলার চমক মীরাকে হীরেন হঠাৎ বুঝতে দেবে না।

মীরাও এ-সম্বন্ধে কিছু চিন্তা না ক'রে ঘরে ঢুকেই আগে সুইচ্ টিপে আলো জ্বালবে।

অর্থাৎ মীরার হাত-ঘড়িতে রাত এখন ক-টা না ব'লে চেয়ারের পাশে টেবিলে রক্ষিত ঘরের ঘড়িতে সময় কত দেখুক, যেন হীরেনকে ইঙ্গিতে তা জানিয়ে দিয়ে মীরা হাতের ব্যাগটা নামিয়ে রাখবে। তারপর জুতো খুলবে, শাড়ি ছাড়বে। সকলের শেষে জামা।

হলদে শীর্ণ হাসি ঠোঁটে জিইয়ে রেখে হীরেন টেবিলের ঘড়ি ও মীরাকে প্রায় একসঙ্গে দেখতে চেষ্টা করবে।

পরবর্তী কোন্ প্রশ্নের জন্যে হীরেন তৈরি হচ্ছে মীরা তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তোয়ালে ও সাবান হাতে বাথরুমের দিকে যাবে। কেননা স্বামীর পরের প্রশ্নও তার অজানা ছিলো না, এবং প্রশ্নের সঙ্গে শুকনো হলদে হাসি।

'না, তুমি ফেরো নি ব'লে যে আমি খাই নি তা নয়, এমনি, পেটটা ভার-ভার ঠেকছে, তুমি খাবে তো ?'

বাথরুম থেকে মীরা শুনবে স্বামীর খণ্ড-খণ্ড হ'য়ে ভেসে আসা ভাঙা দীর্ণ গলার আলাপন। 'দেখছো, সারাদিন একরকম ঠাণ্ডা থাকার পর সন্ধ্যে থেকে কেমন গুমোট চালাচ্ছে। আজ বিছানায় পিঠ ছোঁয়ানো দায়, আমি ভাবছি এই চেয়ারে শুয়ে কাটাবো। তুমি বুঝি স্নান করছো মীরা ? রাত বেশি হয়েছে, অত জল ঢাললে শেষটায়-না একটা-কিছু অসুখ-বিসুখ—'

হীরেনের কথা একেবারে শোনা যাবে না ব'লে বালতি উপুড় ক'রে মীরা হুড়হুড় জল ঢালে মাথায় ঘাড়ে গলায় পিঠে বুকে উরুতে দুধের মতো শাদা ঈষৎ উত্তুঙ্গ নরম নাভিদেশে।

সারাদিনের পরিশ্রমের যন্ত্রণায় পেশীগুলো নিস্তেজ হয়েছিলো,

ঠাণ্ডা জলের আদরে আবার সব সতেজ প্রফুল্ল হ'য়ে উঠছে দেখে মীরার ভালো লাগে। ভালো লাগে এবং বাথরুমে ব'সে রোজ সে অনেকক্ষণ ধ'রে নিজের সুন্দর উলঙ্গ বিস্ফারিত পেশীগুলো দেখে। একটা কথা মনে পড়ে মীরার তখন, হীরেনই মনে করিয়ে দেয়। তার ক্ষুব্ধ ম্রিয়মাণ ভাঙা গলার স্বর বাথরুমের শ্যাওলা-ধরা-দরজায় এসে আস্তে-আস্তে মাথা ঠোকে। 'ইস্, কতক্ষণ চান করছো তুমি মীরা, কত জল ঢালছো, এত রাত ক'রে পুরো দুই ড্রাম জল ঢেলেও তোমার অসুখ করে না, তোমার কি একদিনও অসুখ করবে না, এমন নিটোল দীপ্ত স্বাস্থ্য আমি আবার কবে ফিরে পাবো কে জানে।'

তোয়ালে দিয়ে ঘাড় মুছতে-মুছতে মীরা অনেকদিন স্নানের ঘরের পাতলা প্লাইউডের দরজার ওপর আছাড়-খেয়ে-পড়া-দীর্ঘশ্বাসের একটা কাঁপুনি শুনেছে।

কিন্তু সবচেয়ে খারাপ লাগে স্নান সেরে মীরা যখন ঘরে ঢোকে।

আধশোয়া হীরেন তৎক্ষণাৎ মাথাটা তুলে ধরে।

'সবচেয়ে সুন্দর লাগে তোমাকে স্নানের পর। অদ্ভুত। দৃষ্টি ফেরানো যায় না। বৃষ্টিধোয়া রজনীগন্ধাকে মনে পড়ে।'

মীরার তখন আরো-বেশি রাগ হয়।

এই ইনটেলেক্‌চুয়্যাল জীবটি মনের ভাব গোপন করতে রাতদিন কত চেষ্টাই না করছে।

তাই রজনীগন্ধার মতো ফুল্ল বিকশিত মুখ কালো রেখেই মীরা উত্তর করে, 'তবে আর কি। সারাদিন ঘরে থেকে এখন যখন-তখন স্নান ক'রে কাটানো যাবে। কিন্তু তাতে পেট ভরবে না। কাল রেশন আসছে না জেনে রেখো। একটা আধুলি কর্জ দিলে না কেউ। মিছিমিছি ট্র্যামেবাসে ঘুরে হাতের শেষ সম্বল কয়েক আনা পয়সাও ফুরোলো।'

হীরেন যেমন মনের ভাব লুকোবে মীরাও তেমনি সারাদুপুর, দুপুর থেকে রাত বারোটা অবধি যা-কিছু তার বাইরের জীবনে ঘটলো অক্লেশে গোপন রেখে বলবে, 'আমিও আর পারছি না। কাল থেকে আমাকেও আতুর হ'য়ে ঘরে ব'সে থাকতে হচ্ছে। মন্দ হ'লো না। দেখা যাক ঈশ্বর যদি এবার এই সংসার চালায়। মানুষ যখন ইচ্ছে করলেই চালাতে পারে না, চেষ্টা করলেও তাতে বাধা আসে তখন ঈশ্বরের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে হাত পা গুটিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। মনে-মনে এই ঠিক ক'রে আজ হেঁটে বাড়ি ফিরেছি।'

এ-কথার পর হীরেনের চেহারা কেমন হয় দেখবার অধীর আগ্রহ নিয়ে মীরা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছিলো। প্রায় দুপ্‌দাপ্‌ শব্দ ক'রে।

আর, মিথ্যে কি।

হীরেন ছলনা জানে।

মীরার ছলনা নেই।

অমরেশের দেওয়া এই পাঁচ হাজার টাকাই কাল দুপুরে এক ফাঁকে হ্যারিসন রোডে ওর হোটেলে গিয়ে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে মীরা দুপুর রাতে ঘরে ফিরলো।

•

কিন্তু সে-সব কিছুই বলা হ'লো না।

উপযুক্ত সময়ে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে বাধা পেলে মানুষ যেমন বিমূঢ় বিব্রত হয়, তেমন, ততটা না হ'লেও, মীরা বেশ একটু অবাক ও আড়ষ্ট হ'য়ে গেল।

সিঁড়ির দুটো ধাপ বাকি থাকতেই ও বেশ দেখতে পেলে ঘরের দরজার একটা পাল্লা খোলা, একটা বন্ধ করা। খোলা এক পাল্লার

দৌলতেই মীরার দক্ষিণ খোলা ঘরে হু-হু হাওয়া ঢুকছিলো। নৌকোর পালের মতন মশারির পেটটা ফুলে-ফুলে উঠছে। হীরেন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, মীরা বুঝতে পারলো।

কিন্তু অস্থির হ'লো না ও।

বরং ধীর স্থির পায়ে বাকি সিঁড়িগুলো ভেঙে বারান্দায় এবং বারান্দা পার হ'য়ে পরে ঘরে ঢুকলো। আলো জ্বাললো। হীরেন-সম্পর্কে মীরার নিশ্চিন্ত থাকার প্রচুর কারণ ছিলো। আলো জ্বেলে সকলের আগে টেবিলটার দিকে এক-নজর তাকিয়ে ও আরো-বেশি নিশ্চিন্ত হয়।

মীরার অনুমান মিথ্যে হয় নি।

ঘুমের ওষুধের ফাইলটা টেবিলের ওপর এমন জায়গায় দাঁড় করানো যে সকলের আগে সেটা চোখে পড়ে।

রাগ হ'লো মীরার এই জন্যেই।

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ও চোখ সরিয়ে নিলে সেদিক থেকে এবং তারপর সোজা আলনার কাছে চ'লে গেল। পাশে একটা স্যুটকেসের মধ্যে ব্যাগটা রাখলো ও। তারপর এক টানে পরনের শাড়ি খুললো, ব্লাউজ। রইলো শুধু শায়া আর ব্রেসিয়ার। এই বেশে ঘরের ভিতর একটু হাঁটতে ইচ্ছে করছিলো মীরার। এই অবস্থায় অনেকদিন সে হাঁটে না। এ-ভাবে নিজের বেডরুমে স্বাধীনভাবে পায়চারি করার মধ্যে যে প্রগলভতা ফোটে, জীবন যৌবনের ছন্দ হঠাৎ বাইরে থেকে ঘুরে এসে মীরার মধ্যে তা জাগলো দেখে ঈর্ষায় হীরেনের চোখ ছোটো হ'য়ে যায়। অনেকদিন গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফ্যাকাসে হেসে কালিদাস বিদ্যাপতি উপুড় ক'রে দিয়ে অর্ধনগ্না মীরার রূপ বর্ণনায় হীরেন যখন উচ্ছ্বাস দেখাতে আরম্ভ করে, দাঁড়িয়ে দেখার ধৈর্য থাকে না মীরার।

তাড়াতাড়ি তোয়ালে আর সাবান হাতে ও বাথরুমে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

আজও সে হাঁটলো না।

ঘুমিয়ে থেকেও হীরেন টেবিলে, যাতে আলো জ্বাললে সকলের আগে চোখে পড়ে, একটা আলপিন উঁচিয়ে রেখেছে। যাতে ঘরে ঢোকামাত্র মীরার খোঁচা লাগে।

হাঁটলো না, কিন্তু কতকাল পরে আজ নিশ্চিন্তমনে ও আয়নায় নিজের বসনমুক্ত সুন্দর শরীরটা দেখতে পারতো। দেখা উচিত ছিলো। হ'লো না। পারলো না। যতবার আয়নায় চোখ রাখতে গেল, চোখ স'রে গেল টেবিলে। আলোর নিচে দাঁড় করানো ঘুমের ওষুধের শিশি।

ঘুমের জন্য ডাক্তাররা রুগীদের পারতপক্ষে এই ওষুধ খেতে নিষেধ করেন।

কিন্তু তা হ'লেও এর বিষের মাত্রা এমন অঙ্ক ক'ষে মাপা যে ভোর পাঁচটায় কাক ডাকার সঙ্গে-সঙ্গে রুগী চোখ মেলে তাকাবে, বলবে, 'খিদে পেয়েছে, খেতে দাও আমায়।'

বিষের পরিমাণ যতই কম থাক শিশিটা টেবিলে এমন প্রকাশ্যভাবে সব ওষুধ থেকে সরিয়ে আলাদা ক'রে রাখার অর্থ বুঝতে মীরার কষ্ট হ'লো না।

কষ্ট হ'লো না, আর রাগে তার দুই কানের মূল লাল হ'য়ে উঠলো। এ যেন শুকনো এক চিল্‌তে ঘাস গলায় জড়িয়ে ফাঁসি পরার ভয় দেখানো। ইনটেলেক্‌চুয়াল হীরেন চক্রবর্তী অধিকরাত্রে স্ত্রীর ঘরে ফেরার দুঃখ প্রতিবাদ ও কোপ প্রকাশ করতে আজ এ-রকম একটা স্থূল জিনিসের আশ্রয় নিয়েছে ভাবতে-ভাবতে এক-সময় রাগ প'ড়ে গিয়ে মীরার কেমন হাসি পেলো, অনুকম্পা হ'লো। 'চিরকালের মতো ঘুম পাড়িয়ে রাখার

ক্ষমতা এই ওষুধের নেই, তাই।' ঘর ছেড়ে বাথরুমে যেতে-যেতে মীরা মনে-মনে বললো।

হীরেন জেগে ইজিচেয়ারে ব'সে থাকলে নগ্নদেহে আয়নায় দাঁড়ানো তার পক্ষে যেমন অসম্ভব হ'ত, ঘুমন্ত হীরেনের জায়গায় এখন টেবিলে শিশিটা সেই কাজ করছে। উপায় নেই, কোনোমতেই অনেকক্ষণ এ-ঘরে থাকা সম্ভব না। মীরার দুই কান দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছিলো। তাই আরো-বেশি ত্রস্ত পায়ে অস্থির চিত্তে ও ছুটে গেল স্নানের ঘরে। ভিতর থেকে পাতলা প্লাইউডের দরজায় খিল এঁটে দিলে। আলুলায়িত-কুন্তলা হ'য়ে ট্যাঙ্কের ট্যাপ্-এর নিচে মাথা রেখে চুপচাপ ব'সে ও নিজেকে এবার ভালো ক'রে দেখতে লাগলো, ভাবলো।

না, এ কী ক'রে সম্ভব!

ঠাণ্ডা জলের ধারা ওর শরীর বেয়ে নামলো, প্রত্যেকটি রোমকূপের মধ্যে সাবানের ফেনাগুলো ঢুকে প'ড়ে শরীরকে কোমল পেশীগুলোকে মোলায়েম ক'রে দিলো। শ্রান্তি দূর হ'তে উত্তেজনা কমতে স্থির স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়ে মীরা আবার সবটা বিচার ক'রে দেখলো।

না, কোনোরকমেই তা ভালো দেখাবে না।

টাকা ফিরিয়ে দিতে গেলে অমরেশ ভীষণ শক্ পাবে। এবং চট্‌বে। মীরা যা একেবারেই চায় না।

পেয়ে নয়, দিয়ে, ত্যাগ ক'রে অমরেশের সুখ।

মীরা স্বামী নিয়ে সুখে থাকুক এই দেখেই অমরেশ তৃপ্ত? কোনো পুরুষ এ-ভাবে চিরকাল তৃপ্ত থাকতে পেরেছে কি না ট্যাপ্-এর নিচে থেকে উঠে তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে-মুছতে মীরা চিন্তা ক'রে বিচলিত হ'লো বটে কিন্তু তার চেয়ে বেশি মুহ্যমান হ'লো ও, দুঃখ পেলো, যখন

মনে পড়লো চেক ফিরিয়ে দেওয়ার সময় অমরেশ কী ভাববে। কেমন হবে তার চাউনি।

এ কি দু-জনের সম্পর্কটাকেই চিরদিনের মতো আবার ছিঁড়ে দেওয়ার মতো কাজ করতে যাচ্ছে না মীরা!

অমরেশ তখন ভাববে না, যেহেতু মীরা তার সঙ্গে বঞ্চনা করতে চাইছে না ব'লে সবটা টাকা ফিরিয়ে দিতে এলো। ভাববে মীরার পাতিব্রত্য এতই প্রবল যে ওর থেকে একটি পয়সা গ্রহণ করা পাপ, চেকটা এক রাত ও একটি দুপুর ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে রেখে চিন্তা ক'রে পরে মীরা এখন তা ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

এর কতটা সত্য ?

স্বামী তার পাতিব্রত্যের কতটা দাম দিলে আজ অবধি? তোয়ালের জল নিঃশেষে নিংড়ে বা'র ক'রে দিয়ে মীরা সেটা খোঁপায় জড়ালো। না, দরকার নেই, অমরেশের হোটেলে ক-দিন ও না যায় না যাবে, কিন্তু চেক ফিরিয়ে দিয়ে এতটা অন্ধ বিশ্বাসের মধ্যে আর যাকেই রাখুক, অমরেশকে সে রাখতে চায় না।

হ্যাঁ, মিথ্যে কথাই বলতে হবে এখানে মীরার। জীবনের একটা মিথ্যের ফাটল ভরাট করতে মানুষকে ছোটো-ছোটো মিথ্যের কত নুড়ি কুড়িয়ে চলতে হয় মীরা ভাবলো, আর এখন চিন্তা ক'রে সে অবাক হ'লো কী ক'রে রাস্তায় চেকটা ফিরিয়ে দেবে ভাবতে-ভাবতে এসেছিলো ও। তা হয় না, মীরা তা হ'তে দিতে পারে না।

বারো

ভারি মনোরম একটি সকাল।

শীতের দুরন্তপনা শুরু হয় নি, অথচ রৌদ্রে ঈষৎ হালকা ঈষৎ মধুর আধপাকা কমলালেবুর মনোহর রঙ লেগেছে।

যেন সেই কমলা রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে মীরা আটপৌরে ধনেখালি পরলো।

আর ওর কমলা-রঙ ব্লাউজ। হাতায় দুটি ক'রে কচি সবুজ পাতা।

'একটা কথা বললে তুমি রাগ করবে?'

'কি কথা।' মীরা গম্ভীর হ'য়ে হরলিক্‌সের বাটি হীরেনের সামনে টিপয়ের ওপর রাখলো।

যেন কথাটা হীরেন হঠাৎ বলতে সাহস পেলো না। মীরাকে আবার অতিরিক্ত গম্ভীর দেখে প্রসঙ্গ উত্থাপনের প্রাথমিক উচ্ছ্বাসটা সে গোপন করলো।

'বলো, আমার কাজ আছে।'

ঠিক অসহিষ্ণু না হ'লেও মীরা গলায় একটু ধার আনলো।

কথাটা না বললে মীরা আরো-বেশি বিরক্ত হবে অনুমান ক'রে হীরেন হরলিক্‌সে চুমুক দিয়েই মুখচোখ আবার হাসি-হাসি ক'রে বললো, 'অর্ডিনারি শাড়ি ব্লাউজে মাঝে-মাঝে এত ভালো দেখায় তোমাকে, ব্রিলিয়ান্ট লাগছে এখন।'

মীরা ততোধিক গম্ভীর গলায় বললো, 'অর্ডিনারিকে অর্ডিনারিতেই তো ভালো দেখাবে, রোজ আর তা ব'লে লাভ কি।'

আবার হীরেনের হাসি নিভলো। যেন আশ্রয়-স্বরূপ বাটিতে দীর্ঘ-সময়ের জন্যে একটা চুমুক দিতে চুপ ক'রে রইলো সে।

মীরা বললো, 'আটপৌরে কাপড়ে ভালো দেখায়, তা আটপৌরে হবার বাকি আছে কি। বলো, চুপ ক'রে গেলে কেন।'

হীরেন বাটি থেকে সভয়ে মুখ তুললো।

'না কি এসপ্লানেড থেকে গভীর রাত্রে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু তুমি দেখতে পাচ্ছো, তা-ও দুঃসাহসিকতার পরীক্ষা ব'লে ধ'রে নিতে পারতে যদি অলিম্পিকে হাঁটার কম্পিটিশনে নাম পাঠাতুম। দুঃখের বিষয় নিতান্তই পয়সার অভাবে বেকার ভিক্ষুণীর মতো গাড়ির আশা বাদ দিয়ে কাজটি করতে হয়েছিলো, কাজেই অর্ডিনারি ছাড়া—'

মীরা থামলো।

হীরেনের দু-কান দিয়ে গরম বাতাস বেরুচ্ছিলো। হেমন্তের যে-সকালটি ঘুম থেকে উঠেই মীরার কথা শোনার পর থেকে হীরেনের চোখে এত ভালো লাগছিলো এখন আবার যেন কেমন কালো ঝাপসা হ'য়ে এলো।

'সে তো শুনলাম, সেজন্যে কি আমি, আমার কষ্ট হচ্ছে না মীরা?' হীরেন যথাসম্ভব গলা মোলায়েম করলো। 'তুমি যে কেন এ-রকম করতে গেলে, দাদার বাসায় রাত্রে থেকে গেলে এবং সকালে ফিরে এলে কি যে মহাভারত অশুদ্ধ হ'ত। আমি তো—'

মীরা সম্পূর্ণ পিছন ফিরে বাকি দুটো জানলার পর্দা সরিয়ে সবটা রোদ ঘরের মধ্যে ঢুকতে দিতে অকস্মাৎ কেমন ব্যস্ত হ'য়ে গেল। যেন হীরেনের কথা ভালো ক'রে শুনলো না।

জানলা থেকে যখন ফিরে এলো মীরার মুখাবয়ব সম্পূর্ণ অন্যরকম হ'য়ে গেছে।

'কেন আবার দাদার বাসায় ফিরে যাই নি, সামান্য দু-আনিও

আমার কাছে নেই, বা দাদা বৌদির কাছ থেকে ট্র্যামের পয়সা কর্জ ক'রে আনি নি, চাইতে বাধলো, সে তুমি বুঝবে না—তা ছাড়া রাত্রে স্ত্রীর ফিরতে দেরি হওয়ার অসহ্য যন্ত্রণা ভুলতে তুমি ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে, সারারাত না-ফিরলে সকালে এসে দেখতুম অন্য-কিছু খেয়ে—খেতে কি ?'

ঝকঝকে হাসির আভায় চোখমুখ বিচ্ছুরিত মীরার। কণ্ঠস্বরে কপট ক্রোধ যদিও।

যেন ক্ষমা চাওয়ার মতো তৎক্ষণাৎ গলার স্বর ক'রে অধ্যাপক বললো, 'ভুল মীরা, সত্যি তুমি আমায় ভুল বোঝো, ঘুম আসছিলো না ব'লেই একটা বড়ি—তা ছাড়া, তুমি যে খুব বেশি দূরে গিয়েছিলে কারো কাছে টাকার জন্যে আমি কি তা—আমি কি তা—'

মীরার কণ্ঠস্বরে আর ক্রোধ নেই।

'সত্যি তোমার মনে হয়েছিলো, কোথাও টাকা না-পেলে শেষ পর্যন্ত আমি দাদার কাছে যাবো ?'

'যদি তা মনে না করতুম তো তোমার কথাই যে ঠিক হ'ত। ছ-ঘণ্টা কেন ছ-হাজার বছর ঘুমোনো যায় সেই ওষুধই খেতুম। আমি জানতাম শেষ অবধি অঞ্জনবাবুর কাছেই আমাদের যেতে হবে। তিনি ছাড়া আমাদের আর আছে কে যে—'

মীরা শূন্য হরলিক্সের বাটিটা তুলে নেওয়ার ব্যস্ততায় যেন হঠাৎ কথা বলতে পারলো না।

'যাকগে, শেষ পর্যন্ত যে কিছু পাওয়া গেল।' পরম নিশ্চিন্ততায় ইজিচেয়ারে পিঠ ঢেলে দিতে-দিতে হীরেন হরলিক্সের একটা ছোট্ট ঢেকুর তুললো। 'কখন যেতে বললেন তোমাকে টাকাটা আনতে।'

'দুপুরবেলা। বোধহয় ব্যাঙ্ক থেকে তুলে দেবেন।'

'তাই হবে।' হীরেন ঘড়ির দিকে তাকালো। 'পৌনে সাতটা,

মালতীর এতক্ষণে ফিরে আসা উচিত ছিলো—উনুনে আঁচ দিয়ে বাজারে যাবে, দুপুরে খেয়ে একটু বিশ্রাম না ক'রে অমনি বেরুবেই বা কি ক'রে—' হীরেন ঘড়ি থেকে চোখ তুলে স্ত্রীর চোখের দিকে তাকায়, মীরা চোখ সরিয়ে নেয় বাইরে, দূরে, আকাশের গায়ে। শাদা মেঘের টুকরো হ'য়ে বি.ও.এ.সি-র প্লেন যাচ্ছে কি ওটা। শব্দের একটা সুর যেন চোখ দিয়ে দেখতে-দেখতে মীরা ছোট্ট নিশ্বাস ফেললো।

'বাজার-বাজার করছো, ঘরে আর একটা আধুলি নেই তুমি জানো না বোধহয়।'

মীরা হাসছিলো।

হীরেনকে আবার অল্প-অল্প চিন্তিত হ'তে দেখে হাসিটাকে ঈষৎ মদির ও একটু বক্র ক'রে তুললো ও।

'পারবে নাকি চেয়ে-চিন্তে কা'রো কাছ থেকে একটা দুটো টাকা যোগাড় করতে? এখনকার মতো চালিয়ে দাও। আমি বিকেলে এসে ফিরিয়ে দিচ্ছি। পারো তুমি? আছে কেউ জানাশোনা ওপরে বা নিচে?'

হীরেনের ওপর হঠাৎ এ-কাজের দায়িত্ব চাপাতে অসহায়ভাবে সে হাসলো। এবং ইজিচেয়ারের ক্যানভাস থেকে মাথাটা না তুলে আস্তে-আস্তে নাড়লো।

'নিচে যা'রা আছে তাদের কাছে চাওয়া যায় না।' মীরা বললো, 'আজ পর্যন্ত এ-বাড়ির কারো সঙ্গে পরিচয় করতে পারলাম না। ধারে-কাছের লোকের সঙ্গে জানাশোনা না থাকার এই বিপদ।' ব'লে মীরা আবার টেবিল পরিষ্কার করতে আলনা গুছোতে লাগলো।

হীরেনকে বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকতে দেখে, অথবা চুপ থাকতে দিয়ে মীরা আঙুল দিয়ে পাশের ঘরের দরজা দেখাবার ইঙ্গিত ক'রে বললো, 'ওঁর কাছে একবার চাইলে হয় না?'

'কে ?' হীরেন প্রথমটায় চমকে উঠলো, তারপর বিমর্ষ হেসে ধীরে-ধীরে বললো, 'কাল তুমি বাড়ি ছিলে না। আর্টিস্ট আমার কাছে টাকার জন্যে এসেছিলো। ছবি-টবি মোটে বিক্রি হচ্ছে না বললো। অবস্থা তার আরও কাহিল।' কথার শেষে একটু টেনে-টেনে হাসবারই চেষ্টা করলো হীরেন।

প্রতিবেশীর দুরবস্থার আরো দু-একটা বিবরণ হীরেন নিশ্চয় দেবে কিন্তু তা শোনার ধৈর্য সময় ও উৎসাহ নেই মীরার, চোখের এমন ভাব ক'রে একটা মৃদু নিশ্বাস ফেলে বললো, 'তা দেখি কি করা যায়—একটা-কিছু করতে তো হবে।'

বলতে-বলতে ও দরজার চৌকাঠ পার হ'য়ে ভিতর-বারান্দার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। হীরেন ডাকলো, 'শোনো।'

'কি ?'

মীরা আধখানা হ'য়ে ঘুরে দাঁড়ায়।

'মালতীর কাছে চেয়ে দেখতে পারো, একটা দুটো দিয়েও চালাতে পারবে। ও এখুনি এসে যাবে।'

নিঃশব্দে মীরা একবার মাথা নাড়লো শুধু।

তার দুই কানের ডগা লাল হ'য়ে গেছে, তাড়াতাড়ি বারান্দায় চ'লে গেল ব'লে হীরেন আর দেখতে পেলে না।

টাকা চাইতেই মালতী আঁচল খুলে পাঁচ টাকার একটা নোট দাদাবাবু বা দিদিমণি কারুর হাতে না দিয়ে টেবিলের ওপর রাখলো।

দু-পাঁচ টাকা সর্বদাই তার আঁচলে বাঁধা থাকে। এমন হাস্য ও লাস্যভরে কথাটা ঘোষণা ক'রে ঝি টাকাটা টেবিলের ওপর রাখছিলো যে অন্যদিন হ'লে হীরেনের চেহারার কি রঙ ধরতো মীরা ঠিক মনে করতে

না পারলেও এখন বুঝলো, এই মুহূর্তে হীরেনের চেয়ে সরল কৃতজ্ঞ ও দরদী মানুষ খুব বেশি পৃথিবীতে নেই।

'তুমি ব'লে দাও মীরা কি আনতে হবে বাজার থেকে। মালতী বরং এখুনি চ'লে যাক। আমার শাকসব্‌জি যে খুব একটা আজ বাছাবাছি ক'রে আনার দরকার তা মনে করি না। কাল ডিম খেয়েছো, বরং তোমার জন্যে একটু ভালো মাছ নিয়ে আসুক—কি বলো ?'

বৈজ্ঞানিক চুলকে সহস্রভাগে চিরতে পারে। নারী পারে চুলচেরা হাসির লক্ষ ভাগের একটা চির ঠোঁটে ফোটাতে।

ঘরে বসেই পাঁচ টাকা ধার পাওয়াতে একটু বেশি আনন্দিত হওয়ায় মীরার ঠোঁটের সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হাসি হীরেনের চোখে ঠেকলো না।

'বেশ তো দু-জনের জন্যে এ-বেলা মাছ আসুক।' মীরা প্রস্তাব দিতে হীরেন বললো, 'আমার আপত্তি নেই। খামোকা কতকগুলো রান্নাবান্নায় না ওদিকে বেলা হ'য়ে যায়, তোমাকে যেতে হচ্ছে আবার সেই আলিপুর।'

মীরা একবার সীলিং-এর দিকে তাকালো।

'তা না-হয় দাদার কাছে কাল যাবো। কালকের এত হাঁটার পর আজ আর আমি খাওয়া-দাওয়ার পর ছুটোছুটি করতে পারবো ব'লে মনে হয় না।'

'আজ তুমি বিশ্রাম করো মীরা, আজ সারাদিন তোমার রেস্ট্ নেওয়া উচিত।' অতিরিক্ত উৎসাহে হীরেন চেয়ার ছেড়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো এবং একটু পায়চারি করলো।

'বলেছেন যখন, টাকা দেবেনই। যেখান থেকে হোক নিশ্চয়ই যোগাড় ক'রে রাখবেন। আর, সত্যি, তোমার দাদা অঞ্জনবাবুর মতো হার্ট কারোর হয় না। অবিশ্যি বলতে পারো মা-র পেটেরই

বোন তুমি, তোমার অসুবিধেটা তাঁর বুকে যতখানি লাগবে অন্যের লাগবে না। কিন্তু তা হ'লেও এ-দিনে বিয়ের পরও টাকা পয়সা দিয়ে—বুঝতে পারছো না?'

মীরা কথা বললো না।

'কাল যেয়ো।' হীরেন হাত নেড়ে বললো, 'মালতী যখন পাঁচ টাকা দিয়েছে দু-দিন আমরা খুব চালিয়ে নিতে পারবো। পোনামাছ, মানে পুকুরের যেটা, কত এখন দর মালতী?'

'কাটা সাড়ে তিন, গোটা তিন টাকা।'

'কৈ?'

'চার।'

'গুল্‌সা মাছ ওঠে? বরফচাপা নয়, বেশ নড়ছে এমন?' হীরেন হাত নেড়ে মালতীকে বোঝালো। 'অত্যন্ত ভালো মাছ। রুগীর পক্ষে খুবই উপকারী, আবার এমনিতেও সকলেরই প্রিয়।'

হীরেন মীরার দিকে তাকিয়ে এবার একটু ফ্যাকাসে রকম হাসলো।

'আঃ, কত দিন বাজারে যাই না। বাজারে কিন্তু, একটু খেয়াল রাখলে, পুকুর থেকে সবে তুলে এনেছে এমন মাছও পাওয়া যায় মীরা।'

'তা তুমি বরং যাও, দেখে-শুনে আনতে পারবে। বলছো ঘুম থেকে উঠে অন্যদিনের চেয়েও ভালো বোধ করছো। বরং একটা রিক্সা ডেকে নাও না-হয়।'

হাসিটা আরও একটু ফ্যাকাসে হ'য়ে গেল হীরেনের। 'তুমি আমার কথা বিশ্বাস করো মীরা, ভয় হচ্ছিলো পীলটা খাওয়ার দরুন সকালে অসুবিধেয় পড়বো। কিচ্ছু না, আমি অত্যন্ত ফ্রেস্‌ বোধ করছি, ইচ্ছেও হচ্ছে একটু বাইরে যাই।'

'যাও।' মীরা গম্ভীর হ'য়ে বললো, 'এক টুকরো কাগজ-টাগজ

নিয়ে যাও। শুধু মাছই এনো, খামোকা ভারী কিছু বইতে যেও না। বাজার সেরে রিক্সা ক'রে ফিরে এসো।'

'তা দেখা যাবে।' হীরেন উৎসাহভরে মাথা নেড়ে বললো, 'তুমি আমার পাঞ্জাবি পাম্পশু বা'র ক'রে দাও।'

মীরা জুতো জামা নিয়ে এলো।

'সকালে উঠে তোমার বেজার মুখ দেখে মনটা এমন খারাপ হ'য়ে গিয়েছিলো আমার!' হীরেন জামার বোতাম আঁটতে-আঁটতে বললো, 'খুব সহজেই তুমি মন খারাপ ক'রে ফেলো।'

'যে-ওষুধ তোমার পক্ষে অনিষ্টকর তা খেতে দেখলে মন খারাপ না হবার আছে কি।' মীরা হীরেনের দিকে না তাকিয়ে পুরোনো খবরকাগজের খানিকটা ছিঁড়ে ভাঁজ করতে লাগলো।

'অনিষ্ট করে নি, মীরা, তাই তো বলছিলাম সব-সময় তুমি আমার কথা বিশ্বাস করো না। তুমি আমায় মাঝে-মাঝে এমন অবিশ্বাস করো দেখে আমার মন এক-এক সময় খুব খারাপ হ'য়ে যায়।'

'ভুল, ভুল।' ভাঁজ-করা কাগজটা হীরেনের হাতে তুলে দিয়ে দুই চোখ আধবোজা ক'রে মীরা মদির একটুখানি হাসলো, 'বরং উল্টো, তুমি, তুমিই আমায় মুহুর্মুহু—'

মীরাকে কথা শেষ করতে না দিতে হীরেন ব্যস্ত হ'য়ে হাত বাড়িয়েছিলো স্ত্রীর মুখ চেপে ধরতে।

মীরা স'রে গেল।

'না সত্যি, সত্যি বলছি, তোমার এই রকম ধারণা পোষণ করা খারাপ মীরা, অন্যায়, অন্যায়।'

উত্তেজনায় অধ্যাপক কাঁপছিলো। আবেগ-আচ্ছন্ন গলার স্বর।

'হ্যাঁ, বিশ্বাস করি।' জলতরঙ্গের মতো শব্দ ক'রে অনেকদিন

পরে মীরা আনন্দে হাসলো, 'বিশ্বাস করি যে তুমি আমায় অবিশ্বাস করো না—যাও, দেরি কোরো না, রোদ চড়ছে।'

অপরিমেয় স্বস্তি হীরেনের চোখে মুখে ফুটলো। আর রুগী নয়, সতেজ সুস্থ মানুষের মতো পা বাড়িয়ে চৌকাঠ পার হ'য়ে সে কতকাল পরে বাইরে বেরুলো।

হেমন্তের রৌদ্রে হেলেদুলে রিক্সায় চেপে বাজার করতে চললো হীরেন।

দৃশ্যটা দেখবার জন্যই মীরা বাইরের বারান্দার রেলিং-এ ঝুঁকে কতক্ষণ নিচের দিকে চেয়ে রইলো।

অঞ্জনবাবুর টাকা এনেছে মীরা।

আনে নি, আনতে যাবে।

আজ যাবে না, কাল দুপুরে যাবে।

আজ বাড়ির ঝি দু-টাকার জায়গায় পাঁচ টাকা ধার দিয়েছে। সুতরাং অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও বাজারে যাওয়া তাজা মাছ কিনে আনা এবং বাড়িতে ঢুকেই দু-পদের জায়গায় তিন পদ রান্নার ফরমায়েস করা এক হীরেনকে দিয়েই সম্ভব। স্বামীর চরিত্র নিয়ে আর আলোচনা করা নিরর্থক ভেবে মীরা অন্য ভাবনা ভাবতে লাগলো।

কেন, আজও সে একবার বেরুতে পারে।

চেক ভাঙিয়ে ব্যাঙ্কে সবটা রেখে হাত-খরচের দু-দশ টাকা নিয়ে এসে বলবে, মাত্র ক-টা টাকা যোগাড় করতে পেরেছিলো দাদা, আবার কাল যেতে বললো।

মীরা কাল দুপুরে আবার পাড়ি দেবে আলিপুর।

পরশু।

রোজই দাদা কিছু-কিছু ক'রে দিতে পারছে।

এক সঙ্গে ছ-মাস ব'সে খাবে এমন যে একটা চালু উকিল অঞ্জন মুখার্জি, তাকেও আজকাল কেউ ধার দিচ্ছে না।

সুতরাং—

মীরা অনায়াসে রোজ একবার ক'রে অমরেশকে গিয়ে দেখে আসতে পারে।

বাড়ির সব কর্তব্য সারা ক'রে ও বেড়াতে এসেছে হোটেলে। স্বামীর সেবা-যত্ন শুশ্রূষা কোনোটার ত্রুটি রেখে ও বাড়ি থেকে বেরোয় নি। অমরেশকে বুঝিয়ে বলবে ও। যদি বিশ্বাস না করে অমরেশ একবার চলুক রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। গিয়ে দেখবে দিবানিদ্রার পর হীরেন এখন ইজিচেয়ারে ব'সে টোস্ট ওভালটিন খাচ্ছে, টলস্টয় পড়ছে, আর মাঝে-মাঝে জানলার বাইরে শান্ত নিরুদ্বিগ্ন চোখ রেখে পরিতৃপ্তির ঘন নিশ্বাস ফেলে কল্পনায় দেখছে মীরা দাদার কাছে আরো-কিছু টাকা পেয়ে পরদিনের বাজার নিয়ে ঘরে ফিরছে। নিজের এবং স্বামীর জন্যে অতিরিক্ত টুকিটাকি সব জিনিস নিয়ে ঘরে ফিরতে মীরার একদিন ভুল হয় না। রোজ রাত্রে গাওয়া-ঘিয়ে ভাজা গরম পরটা ফুলকপি ভাজা ও সবে-বেরুনো মটরশুটি দিয়ে নামমাত্র মশলায় তৈরি আলুর দম। হাল্কা অথচ স্বাদু ও পুষ্টিকর। হীরেন যা চাইছে মীরা তাই নিয়ে যাচ্ছে, দিচ্ছে, খাওয়াচ্ছে। সব দাবি পূরণ হবার পর স্বামী যদি স্ত্রীকে সানন্দে বাইরে বেরুনোর অনুমতি দেন এবং সেই সুযোগ নিয়ে মীরা দুপুরে একটি বার ক'রে অমরেশকে দেখতে আসে দোষ নেই তাতে।

কিন্তু তবু, মীরা দেখতে পাচ্ছে যেন, অমরেশ তাকে গালমন্দ করছে। 'প্রথম থেকেই নিয়ম ভাঙছো, ভেঙে আমার কাছে আসছো, তার অর্থ সন্দেহটা তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর জীবনে গা-সওয়া হ'য়ে গেছে। বাড়ি ফিরে গিয়ে মিথ্যে বলো আর সত্যি বলো হীরেনবাবু জানছেন দিনের শেষে তুমি

ঘরে ফিরে যেতে ভুল করবে না, কাল দুপুরে বেরোবার আগে একটি আলো-নেভানো ঘরের নিভৃতিতে দু-জনের আবার একটা রাত কাটবে।'

অভিমানী অমরেশ, একগুঁয়ে অমরেশ।

মীরা জানে স্বামীকে-ফাঁকি-দিয়ে-এসেছিলো ভালোবাসায় অমরেশের আস্থা কম।

একেবারে ছেড়ে চ'লে এসো।

চিরকালের মতো বন্ধন টেকে কিনা পরীক্ষা করতে যে তোমায়, তোমাদের এতগুলো টাকা দিলাম।

'আমি অপেক্ষা করবো। ছ-মাস, এক বছর। যদ্দিন-না হীরেনবাবু সম্পূর্ণ সুস্থ ও কর্মক্ষম হবেন। তার আগে ঝুপ্ ক'রে একটা-কিছু করার পক্ষপাতী আমি নই।'

বারান্দায় রেলিঙের গায়ে গাল ঠেকিয়ে মীরা আজই অমরেশের হোটেলে যাওয়ার বাসনা অগত্যা ত্যাগ করলো। বলতে কি, মীরার ইনটেলেকচুয়্যাল মনের বিশ্লেষণীতে দুই পুরুষ-চরিত্র হঠাৎ একরকম হ'য়ে ফুটে উঠলো। হীরেন এক অর্থে গোঁড়া, অমরেশ অন্যভাবে।

ঈর্ষা, সন্দেহ ও হীনতার আঁকসি দিয়ে ঘরের প্রেমকে ঘরোয়া করবার জন্যে অতিমাত্রায় ব্যগ্র হীরেন।

অর্থ, উদারতাও এক অতি মানবীয় ত্যাগের দাঁড়িপাল্লায় রেখে মীরার প্রেমকে ওজন করতে তেমনি অমরেশেরও আগ্রহ কম না। দু-জনই সমান।

যেন দু-জনই তা'রা মীরাকে দেখছে না, দেখছে তার অন্য-কিছু। দু'য়ের প্রেমের বিচারে রক্তমাংসের মীরা অনুপস্থিত।

ভাবলো, হীরেন বেরিয়ে যেতে ঘরের সামনের বারান্দায় পায়চারি করতে-করতে একটা অস্বস্তির আলপিনের খোঁচা খেয়ে মীরা ক্ষত-

বিক্ষত হ'য়ে ভেবে যখন সারা হচ্ছিলো তার সামনে এসে দাঁড়ালো মৃগাঙ্ক।

ফোলা-ফোলা চোখ। চুল উস্কুখুস্কু।

ইংরেজিতে যাকে bow করা বলে সে-ভাবে শরীরটাকে একটু সামনের দিকে বাড়িয়ে মৃদু হেসে মৃগাঙ্ক অভিবাদন জানালো। 'গুড মর্নিং, মিসেস চক্রবর্তী।'

সুস্মিত হেসে যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে মীরা বললো, 'নমস্কার, এই আপনার ঘুম ভাঙলো বুঝি?'

'ভেঙেছে অনেকক্ষণ।' মৃগাঙ্ক সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো। 'বিছানায় শুয়ে-শুয়ে আপনার কালকের দেওয়া সিগারেটগুলো টানছিলাম।'

'ভারি তো এক প্যাকেট সিগারেট।' অত্যন্ত নিম্ন ও ক্ষীণকণ্ঠে অভিযোগ ক'রে পরে স্বচ্ছতর গলায় মীরা হাসলো, 'চা খেয়েছেন?'

'না খাই নি, স্টোভে তেল ছিলো না—'

মীরা এবার মৃদুমন্দ গলায় হাসলো।

'তা, স্টোভের তেল আনবেন তারপর চা হবে, বেলা দশটা বাজবে সকালের চা খেতে-খেতে।'

'অনেকটা সেইরকম।' মজুমদারও মৃদুমন্দ হাসলো।

খোঁপা থেকে আঁচলটা খ'সে গিয়েছিলো অনেকক্ষণ। মীরা বাঁ-হাতের দুই আঙুল দিয়ে ওটা যথাস্থানে দু-বার তুলে দেবার চেষ্টা করলো, আবার প'ড়ে গেল!

'শুয়ে-শুয়ে আপনার কথা শুনছিলাম।'

'কখন, কি কথা?'

'এই তো এখন, একটু আগে বারান্দায় দাঁড়িয়ে হীরেনবাবুকে যখন বাজারের ফর্দ মুখে-মুখে ব'লে দিচ্ছিলেন।'

'অ, মস্ত কথা!' মীরা সুন্দর ভ্রভঙ্গি ক'রে হাসলো। 'তা হ'লে ঘুম ভেঙেছে অনেকক্ষণ, জেগে শুয়েছিলেন।'

হ্যাঁ, ঘরে তেল নেই মনে পড়তে আর উঠতে ইচ্ছে করছিলো না।'

'শিল্পীরা এমনি হন।' সূক্ষ্ম ক্ষীণতর কণ্ঠে মীরা আবার অভিযোগ করলো। 'কেন, কাল রাত্রেই তো আপনার ওটি যোগাড় ক'রে রাখা উচিত ছিলো।'

'ছিলো এবং ঘরে আরো কি ছিলো না ছিলো সেই সম্পর্কে কাল বিকেলের পর থেকে একটু বেশি সচেতন ও চিন্তিত হয়েছিলাম ব'লে রাত্রে বন্ধুর কাছ থেকে ফেরার পথে বাস্-এ ওই কুকাণ্ডটি করেছিলাম।' ক্ষীণকণ্ঠে হাসছিলো মৃগাঙ্ক।

মীরার দুই কান লাল হ'য়ে উঠলো। কিন্তু বেশি ও তা হ'তে দিলে না। মীরা যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি অদ্ভুত সুন্দর ওর মনের ভাব গোপন করার কৌশলটুকু। হাসিকে আরো মদিরায়ত ক'রে বললো ও, 'কী বুদ্ধি আপনার! টুকিটাকি দুটো-একটা জিনিস ঘরে না থাকলে আমাদের কাছে চাইতে পারেন। এতে এতটুকু লজ্জা করা উচিত না। তবে আর প্রতিবেশী বলা কেন। আমার দু-বোতল কেরোসিন এখনো ঘরে জমা আছে। আমি এ-সব আগে থাকতেই যোগাড় ক'রে রাখি।'

চুপ থেকে লাল ফোলা-ফোলা চোখে মৃগাঙ্ক মীরাকে দেখছিলো, মীরার দাঁত, ঠোঁট, কুটিল প্রসন্ন বঙ্কিম বিলসিত সুন্দর ভ্রূযুগল। ভ্রূযুগলের ভর্ৎসনা।

'আপনার কথা আলাদা, আপনি ম্যাগ্‌নেনিমাস মীরা। প্রথম থেকে লক্ষ্য করছি। বলেছি কাল। বলতে কি, আপনি না থাকলে মিস্টার চক্রবর্তী যেমন অসুস্থ হ'য়ে হাসপাতাল থেকে ফিরেছিলেন, এত সকাল-সকাল সেরে উঠতে পারতেন না। স্টোভের তেল তো বটেই,

এই ক্রাইসিসের বাজারে আপনি একটা স্টীমারকে একলা হাতে চালিয়ে নিচ্ছেন দেখে অবাক, মুগ্ধ আমরা।'

মীরা কথা কইলো না।

বাইরে হেমন্তের আশ্চর্য সুন্দর রৌদ্রে একটা প্রজাপতি অবিশ্রাম ঘুরে-ঘুরে নেচে-নেচে মনে হয় যেন নতুন আইভি লতাটার সঙ্গে প্রেম করছিলো।

'ভেতরে আসুন, চা খাবেন।'

ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশীর চা-তৈরি করা নিয়ে এত কথার পর তাকে চা খেতে না বলা যে-কোনো শিক্ষিতা ও সুরুচিসম্পন্না গৃহিণীর চরিত্রের কলঙ্কস্বরূপ। অন্তত মীরা তাই মনে করে।

পর্দাটা বাঁ-হাতে সরিয়ে মীরা মৃগাঙ্ককে ডাকলো।

'আপনার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে চট্ ক'রে আমার হ'য়ে যাবে, দেরি হবে না।' একটা চেয়ার বাড়িয়ে দিলে মীরা, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে বললো, 'মালতী, উনুনে কেট্‌লি চাপা, দু-কাপ জল দিবি।'

প্রতিবেশী পুরুষকে ঘরে ঢুকতে দেখে মালতী খোঁপায় আঁচল তুলে দিয়েছে। কিন্তু তা হ'লেও হীরেন ঘরে না থাকাতে ওকে বেশ চটপটে প্রগলভ দেখাচ্ছিলো। হাতে একটা ঝাড়ন। হীরেনের রুটি হরলিক্‌স খাওয়া বাসন সরিয়ে টি-পয় মুছতে এসেছে।

'ওটা এখন রেখে দে।' মীরা বললো, 'জল চাপিয়ে দিয়ে তুই চট্ ক'রে দুটো সিঙাড়া নিয়ে আয়। মোড়ে যেতে হবে না। সামনের দোকান থেকে নিয়ে আয়।'

ব্যাগ থেকে নিজের মুখ-মোছা ছোট্ট গোলাপী রুমাল বা'র ক'রে মীরা একটা সিকি খুললো।

'দুটো সিঙাড়া আর দুটো ভালো সিগারেট আনবি।'

'আপনি একটা অনুষ্ঠান আরম্ভ ক'রে দিলেন, মিসেস চক্রবর্তী।'

'যা, দেরি করিস নি।' যেন মৃগাঙ্কর কথা কানে তুলতে ইচ্ছে নেই মীরার, চৌকাঠ পর্যন্ত ঝি-র পিছু ধাওয়া করলো। 'ছুটে যাবি আর আসবি।'

'ভয় নেই দিদিমণি। আজ তুমি সারাদিন বাড়িতে আছো, নিজের হাতে রান্নাবান্না করছো শুনেই দাদাবাবুর মনমেজাজ খুলে গেছে, অসুখ-বিসুখ নেই। বেলা দশটা অবধি বাজারে ঘুরে জ্যান্ত মাছ আর টাটকা শাকসব্জি কিনবে।'

'যা বলেছিস।' পলকে মৃগাঙ্ককে দেখে মীরা আবার মালতীর দিকে তাকায়। 'রোগা লোক চলতে-ফিরতে এমনিও একটু দেরি হবে, আর কোনো জিনিসের তো দাম জানে না—তা হ'লেও চা-এর জল নামিয়ে ভাত চাপাতে হবে বলছি, তোর আবার রাস্তায় দোকানে মেলা বন্ধু কিনা। একবার বাইরে পা বাড়ালে আর বাড়ি ফেরার নাম করিস না।'

'হ্যাঁ, আমার বদনাম তো তোমার মুখে লেগেই আছে, উপকারীকে বাঘে খায়, তোমার জন্যে এত করছি কিনা।' রাগের স্বর মালতীর। 'তা বন্ধুর মতো বন্ধুর যদি দেখা পাই এই চাকরি ছেড়ে দেবো। রোজ তো বড়ো গলায় জানিয়ে দিচ্ছি তোমাদের। মালতীর বয়সের এখনো ভরদুপুর।'

'তা যাস চ'লে।' সুন্দর মসৃণ গলায় হেসে মালতীকে বিদায় ক'রে দিয়ে মীরা মৃগাঙ্কর কাছে ফিরে এলো।

'বাবুরা বাড়িতে না থাকলে সমবয়সী ঝি মনিবানীর সখী হয়।'

মীরার কথায় মৃগাঙ্ক অন্যমনস্কের মতো একটু হাসলো আর স্থির চোখে মীরাকে দেখলো।

'আপনার ছবির মডেল হিসেবে মালতী মন্দ কি।' মীরা বললো।

এবার আর অন্যমনস্কের মতো শুধু মীরাকে না দেখে মৃগাঙ্ক ঘরের ভিতরের চারদিক দেখলো।

'হেভ্‌ন হেভ্‌ন! আপনি স্বর্গ গ'ড়ে রেখেছেন চক্রবর্তীর জন্য, মীরা।' মীরার দিকে চোখ ফেরায় শিল্পী। গত রাত্রির রেস্টুরেণ্টের কথাগুলো মনে হ'লো মীরার।

'আপনি বসুন, আমি জলটা দেখে আসছি।' ব'লে আর-একটা টিপয় মৃগাঙ্কর সামনে টেনে এনে লণ্ড্রি থেকে আসা একটা সবুজ ঢাকনা পাট ভেঙে তার ওপর বিছিয়ে দিয়ে মীরা রান্নাঘরের দিকে গেল।

রূপ, রূপ, আর সেই রূপের মন্দিরের মধ্যে জ্বলছে সেবা মমতা সংযম ও প্রেমের মোমবাতিগুলো।

রূপের এই অদ্ভুত ব্যাখ্যা মীরা আর-কোনোদিন কারুর মুখে শোনে নি। কাল দুপুরে অমরেশও হোটেলে তার রূপের ব্যাখ্যা করছিলো। কিন্তু তাতে আর এতে আকাশপাতাল তফাৎ। তাই কি। উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে মীরা তার চুলচেরা হিসেব করলে না যদিও। কেবল অমরেশের চোখের রঙ আর মৃগাঙ্কর চোখের রঙটা পাশাপাশি মনে প'ড়ে গেল তার।

একটা লালচে, একটা পিঙ্গল।

মেয়েরা, সব মেয়েই পুরুষের মুখে রূপের স্তুতি শুনলে তাদের চোখের রঙ কি দাঁড়ায় আগে তা দেখে তারপর দেখে পুরুষের হাসি। আর পুরুষ, মেয়ের চোখ দেখার আগে ঠোঁট দেখে। পুরুষ চিরকালই অন্ধ কিনা!

কেট্‌লির জল ফুটছে। মীরা আরও খানিকটা জল ঢেলে দেয় তাতে। তারপর ভাবে, একটা চেক-এর দাম বেশি না তুলির একটা আঁচড়। কোন্‌টাতে হৃদয় ফোটে বেশি?

চার কাপ জল মীরা গরম হ'তে দিলে। দেরি হোক। ইচ্ছে ক'রে

মৃগাঙ্ককে দেরি ক'রে চা দেওয়ার কারণ, মীরা চাইছে না চোরের মতো কাজটা সম্পন্ন হোক।

বাজার ক'রে ঘরে ফিরে হীরেন দেখুক দাদার দেওয়া টাকা হাতে আসছে ব'লে মীরার দিনকতক বাইরে বেরুনো বন্ধ হ'লেও ঘরের নিয়মকানুন ও শৃঙ্খলাগুলো সে যে-ভাবেই হোক বজায় রাখছে, এ-ক্ষেত্রে হীরেনের বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হওয়া নিতান্তই মূর্খতা।

পাশের ঘরে থাকেন ভদ্রলোক।

শিল্পী বাউণ্ডুলে ব'লে যতই নাক-সিঁটকানি থাক হীরেনের, একজন মানুষ তো বটে। ওপরের এই একজন।

আর আছে নিচে দু-চার ঘর বাসিন্দা।

বলতে কি, এই একটি মানুষের সঙ্গেও যদি তা'রা পরিচয় ও মেলা-মেশা না রাখতে পারে তো তাদের, মীরা ও হীরেনের, অরণ্যে আশ্রয় নেওয়া উচিত।

হ্যাঁ, ভদ্রলোক ঠেকেছেন।

যেমন মীরা ঠেকেছে।

পাঁচটা টাকা কর্জ চাইতে এসেছেন মজুমদার মীরার কাছে। তা মীরার হাতে তো আজ টাকা নেই, বলেছে কাল দিতে পারবে। এবং এই সকালে প্রতিবেশী যখন তাদের ঘরে এসেছেন তখন তাঁকে বসতে ও একটু চা খেতে বলা একজন শিক্ষিতা আধুনিক গৃহিণীর ধর্ম।

হীরেন মহা অস্বস্তিবোধ করলেও মীরাকে তা পালন ক'রে যেতেই হবে। এ-সব পালন না করার পিছনে যে অশ্রদ্ধা শ্লেষ ও ঘৃণা আছে তা পেতে মীরাকেই পাবে, হীরেনকে ছোঁবে না। এরা বলবে এমন একজন কৃতবিদ্য মার্জিতরুচিসম্পন্ন অধ্যাপকের এ কি জংলি মূর্খ স্ত্রী! কেউ বলবে অহংকার—মারাত্মক রকম অসামাজিক জীব।

আবার, এ-সব ভাববার পর হয়তো সবাই বলাবলি করবে, আসলে তলা একেবারে ফুটো হ'য়ে গেছে, ইজিচেয়ারে চেপেচুপে ব'সে সকালে-বিকেলে হরলিক্স খাওয়া ফুলের গন্ধ শোঁকা ও রবীন্দ্রনাথ টলস্টয় পড়া আর বেশিদিন চলছে না। ডুববে। আমাদের চেয়েও সাংঘাতিকভাবে ডুবতে বসেছে এই পরিবারটা, এক-কাপ চা দিয়েও বাড়ির লোকগুলোকে একদিন সমাদর করতে পারে না। এমন লক্ষ্মীছাড়া!

তা ছাড়া আর কি।

ভাগ্যে যখন-তখন আবার আগুন লাগতে পারে মীরার, এটা ও ভালোরকম জেনে রেখেছে বলেই অন্তত এদের দু-একজনের সঙ্গে একটু পরিচয় ও কথাবার্তা রাখার রেওয়াজ রেখেছে। রাত দুপুরে হীরেনের পেটে পেন্ আরম্ভ হ'তে পারে। এ-বাড়ির কারো ঘরে টেলিফোন নেই। অথবা ফোন ক'রে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে হীরেনকে হাসপাতালে পাঠাবার সময় না-ও থাকতে পারে। তখন ট্যাক্সি ডাকো, মুমূর্ষু রুগীকে গাড়িতে তোলো, এ-সব কাজ একলা হাতে মীরা সামাল দিতে পারবে এই ভয়ংকর বিশ্বাসই হীরেনের মৃত্যুর কারণ হবে।

মৃগাঙ্কর জন্য চা তৈরি করতে-করতে মীরা আজ এ-সম্পর্কে কোনো-রকম কথাবার্তা উঠলেই এই কথাগুলি বলবে ঠিক ক'রে রাখলো।

'আরো খান, আরো দুটো সিঙ্গাড়া নিয়ে আয়, মালতী।'

'আশ্চর্য, এ আপনি করছেন কি!'

মৃগাঙ্ক শিশুর মতো সরল সুন্দর চোখে মীরাকে দেখছিলো না। তা দেখতো অমরেশ। এই অবস্থায় অমরেশের দৃষ্টি বিকেলের পড়ন্ত রোদের মতো ঝিলমিল করতো, যদি এমনি এ-ঘরে দু-জন মুখোমুখি চা খেতে বসতো।

মৃগাঙ্কর চোখের রক্তের ছিটেগুলোকে রক্তমুখী ছোটো-ছোটো অসংখ্য চোখের মতো মনে হচ্ছিলো মীরার।

এতগুলো চোখের আগুনের সামনে চিরকালের রূপসীরা পতঙ্গের মতো পাখা বাড়িয়ে দিয়েছে। দিতে চেষ্টা করেছে, না দিতে পারলে ব্যর্থ মনে করেছে নিজেদের।

কাপে চিনি ঢালবার সময় মীরার দুধের মতো শাদা ধবধবে কনুইটা মৃগাঙ্কর থুঁত্নির কাছে চ'লে গেল।

'আপনি আবার আরম্ভ করুন। হবে। সব ফিরে পাবেন। একটা মডেল নষ্ট হ'য়ে গেলে জীবনের সব ছন্দ চ'লে গেল এ আমি বিশ্বাস করি না মৃগাঙ্কবাবু।'

'কিন্তু এমনটি হবে না, এই রকম পাবো না।' জানলার দিকে মজুমদার চোখ ফেরালো।

মীরা বললো, 'নিন্, সিগারেট ধরান।'

শিল্পী ঠোঁটে সিগারেট গুঁজলো, মীরা তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে। 'সত্যি, জীবনকে যে-ভাবে চাওয়া যায় সে-ভাবে জীবন না এলে বুক মরুভূমি মনে হয়, আর, কা'রও যদি কবি ও শিল্পীমন হয় তো সে সিনিক হ'তে বাধ্য।' ব'লে ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে মীরা জানলার প্রজাপতিটার লাফালাফি দেখতে লাগলো।

'হীরেনবাবুকে আঁকা-মডেলটা দেখিয়েছি। ওর অ্যাম্বিশন আমার জন্য এনেছিলো আগ্নেয়গিরির গর্ভনিঃসৃত লাভা, আপনার অ্যাম্বিশন আনলো মন্দাকিনীর ধারা। তা ছাড়া ভোমরার চেয়ে কত বেশি রূপসী আপনি, মীরা।'

গল্পটা শুনে ক্ষুণ্ণ ও ঈষৎ কাঁপা গলায় মীরা বললো, 'অথচ ভোমরাটাকে চিরকালই আমরা খুব বুদ্ধিমতী ব'লে জানতাম।'

'বুদ্ধি ছিলো, হৃদয় ছিলো না।' মৃগাঙ্ক স্বচ্ছতর গলায় বললো, 'ও যখন জানতো পান্না সিন্ধিয়ার সঙ্গে মেলামেশা আমি পছন্দ করি না। আমরা যে-অবস্থায় ছিলাম তাতেই কি সুখী ছিলাম না, মিসেস চক্রবর্তী। সেখানেই তো স্বর্গ গড়া যেত।'

মীরা কথা কইলো না। পলকহীন চোখে জানলার দিকে তাকিয়ে ও।

'তাই বলছিলাম, রূপ ও হৃদয় দিয়ে গড়া তাজমহল আছে হীরেনবাবুর ঘরে।' অনেকটা নিজের মনে কথা বলতে-বলতে সামনের দিকে ঝুঁকে একেবারে ঠাণ্ডা হ'য়ে যাওয়া চা-এর কাপটা মৃগাঙ্ক ঠোঁটের কাছে তুললো।

'আর-একটু চা ক'রে দিই আপনাকে?' মীরা আদরের স্বরে বললো।

মাথার লম্বা লাল চুলে মৃদু ঝাঁকুনি লাগলো, হাসলো মৃগাঙ্ক। 'আর না, সারাদিন চা-এর জল ফুটলে আপনার ভাত-তরকারি আর রান্না হবে না মীরা দেবী।' শিল্পী উঠে দাঁড়ালো, মীরাও উঠলো।

'তা হয়, হ'য়ে যাচ্ছে। কতবার রান্না করতে-করতে হরলিক্স ওভালটিনের জল গরম হয় আমার ঘরে।'

'সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। কি বলবো? এঞ্জেল-টেঞ্জেল ব'লে বাঙালির ঘরের রূপবতী গৃহিণীর বর্ণনা ঠিক হয় না।'

মীরা কিছু বললো না। শাদা সুন্দর দাঁতে হাসলো একটু।

'তার ওপর এত বিদ্যাবুদ্ধি এমন আশ্চর্য রুচি। আহা, বিশ্বকর্মা কোনোটার খুঁত রাখে নি।'

'কিন্তু পারছি কই, তেমন ক'রে পারলাম কোথায়, ইচ্ছে ছিলো ভালো ক'রে সংসারটাকে সাজাবো, কিন্তু ঈশ্বর—'

'হবে, হ'য়ে যাবে।' মৃগাঙ্ক সিগারেটের টুকরোটা ছাইদানিতে ফেললো। 'ইচ্ছে করলে সব পারা যায়—এই বাণী আপনিই আমায় একটু আগে শুনিয়েছেন।'

'বলছেন ডিগ্রী আছে ব'লে তোমায় আমি আপিসে ঠেলে পাঠাবো অন্নের জন্যে, বেঁচে থাকতে তা আমি দেখতে চাই না। চিরকাল তো আর আমি অসুস্থ প'ড়ে থাকবো না।'

'কে? মিস্টার চক্রবর্তী?' মৃগাঙ্ক ক্ষীণ হাসলো, 'অবশ্য দেখলে তাঁকে মনে হয় না যে এ-সব বিষয়ে তিনি এতটা—'

'ভয়ানক, ভীষণ গোঁড়া।' মীরা বললো, 'অথচ এ-দিকে সংসার-খরচ—'

'কোথাও কোনো স্কুলে—' মৃগাঙ্ক ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেশলাই খুঁজছিলো।

মাথা নেড়ে মীরা বললো, 'না, এখনো পাই নি। সাধারণ একটা স্কুলের মাস্টারির জন্যে কি হাঁটাহাঁটি করছি কম। দুটো প্রাইভেট টুইশ্যানি আছে।'

'কী নিষ্ঠা, কী সংযম!' অস্পষ্ট গলায় নিজের মনে কথাগুলি ব'লে পরে মৃগাঙ্ক জানলার বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে শিস দিতে লাগলো। বনের পাখিকে আদর ক'রে ডাকতে গিয়ে মানুষ যেমন শিস দেয় সেই সুর। মীরা পরিষ্কার দেখলো, মৃগাঙ্কর দুই চোখ ছলছল করছে। ভোমরাকে মনে পড়ছে?

'ভোমরাটা কী বোকা!' মৃগাঙ্ক চ'লে যেতে মীরা ভাবলো। 'কি পেতে গিয়ে কী হারালে ও। তুচ্ছ গাড়ি বাড়ির জন্যে এই চোখ—' চোখে রক্তের ছিটে আর কোন্ শিল্পীর ছিলো মীরা হঠাৎ মনে করতে পারলে না এখন। হ্যাঁ, এই সেই রক্তচক্ষু শিল্পী-সন্ন্যাসীর রূপপিপাসা। প্রেমিক? প্রেমিকের চেয়েও শিল্পীদের উঁচুতে স্থান দেয় মীরা। এদের

গলায় সব মেয়ের বরমাল্য পরানো উচিত। মীরার ইচ্ছে করছিলো ভোমরাকে এখন হাতের কাছে পেলে বেশ দু-কথা শুনিয়ে দেয়। মিথ্যুক।

ঘটা ক'রে মীরা রান্নাঘরে ঢুকলো। অমরেশের এই ইচ্ছে। ছ-মাস, ছ-টা মাস চোখমুখ বুজে আর-একবার সে চেষ্টা ক'রে দেখুক। যেমনটি করলে হীরেনবাবু সুখী হ'ন। এবং তাতে যদি তাঁর মনের কালো দূর হয়।

খুশি বই কি। আহ্লাদে হীরেন উথ্‌লে উঠছিলো। রান্নাঘরের চৌকাঠ ছেড়ে আজ আর উঠতে তার মন নেই।

'বুঝলে মীরা, মেয়েদের উনুনের গোড়ায় বসতে দেখলে আমার ছোটোবেলার কথা মনে প'ড়ে যায়—মা'কে দেখতুম। গৌরবর্ণ মুখ আগুনের আভায় দেবীর মুখের মতো জ্বলতো। ছুটির দিন এলেই বাবা নিজের হাতে বাজার ক'রে এনে সেই যে মোড়া পেতে হুঁকো হাতে বসতেন মা-র রান্না শেষ না হওয়া তক উনুনের কাছ থেকে নড়তেন না।'

উত্তরে একটুখানি শুধু 'হুঁ' করলো মীরা। কেননা তার কড়াই তেতে গেছে। হলুদ লঙ্কা মেখে মাছটা তাড়াতাড়ি না ছেড়ে দিলে তেলে আগুন লাগে।

কাজটি শেষ ক'রে মীরা আবার ঘুরে বসলো আনাজ কুটতে।

'কী অদ্ভুত, কী আশ্চর্য সুন্দর লাগছে তোমার আঙুলগুলো সবুজ শাকের মধ্যে।'

'তাই কি?' হীরেনের কথায় মীরা হলুদ-ছোপানো নিজের আঙুলগুলো দেখলো। সোনালি বর্শা। সোনালি বর্শারা কচি পলতে পাতার বুক চিরছে।

'মাছ হ'য়ে গেলে আমার শুক্তো চাপাবে বুঝি?' হীরেন প্রশ্ন করলো।

একটু থেমে পরে বললো, 'এই আঙুল, আঙুলের এমন রঙ ও ছন্দ টাইপরাইটারের চাবির ওপর কি ক'রে মানায় আমি ভেবে পাই না।'

বুঝি অমরেশও তা পায় না, তাই ইচ্ছে ক'রে মীরাকে চাকরিতে না দিয়ে হেঁসেলে পাঠালো। আশ্চর্য, এরা দু-জনই একরকম। কিন্তু সব অবস্থায়ই মেয়েদের আঙুল সুন্দর দেখে কে, কা'র সেই দিব্য চোখ? শুক্তো চাপিয়ে মীরা ভাবতে লাগলো।

মালতী ছুটে এসে বললো বিপদ উকিল দেখা করতে এসেছে।

হীরেনের মাথায় বাড়ি পড়লো।

'এই অবেলায় এসেছে, কমসে-কম দুটো ঘণ্টা বকর-বকর ক'রে কানের মাথা খাবে।'

অসময়ে লোকটার আবির্ভাব হয়েছে শুনে মীরাও খুব বিরক্ত হ'লো। 'ব'লে আয় মালতী, বাবু এইমাত্র ঢুকেছেন বাথরুমে। স্নান করবেন খাবেন বিশ্রাম করবেন। অতক্ষণ কি তিনি বসতে পারবেন? দিদিমণি রান্নাঘরে ব্যস্ত। তার চেয়ে আপনি ও-বেলায় আসুন।'

'দুঃখিত হবে উকিল।' হীরেন অল্প হাসলো।

'হোক দুঃখিত।' মীরা ভুরু কোঁচকালো। 'আমি চাই না এখন-তখন বাড়িতে এত লোকের আনাগোনা। কোথায় খাবো-দাবো শোবো দু-জনে ব'সে একটু বেশিক্ষণ গল্প করবো—জেনেশুনে পাজি এসেছে সব পণ্ড করতে।'

হীরেন চুপ ক'রে রইলো।

'যা ব'লে আয় বিকেলেও দেখা হবে না, দু-জনে আজ সিনেমায় যাচ্ছি, সুতরাং দেখা পেতে-পেতে সেই কাল বিকেল।'

মালতী মীরার আদেশ নিয়ে নিচে চ'লে গেল।

'কী ভীষণ আড্ডাবাজ তোমার উকিল বন্ধুটি।'

মীরার অভিযোগে হীরেন রুষ্ট হ'লো না, বরং ভালো লাগলো তার কথাগুলি। অল্প মাথা নাড়লো।

দু-জনে ব'সে একটু বেশি সময় কতকাল গল্প করা হয় না। হীরেন মনে-মনে দুপুরগুলির হিসেব নিচ্ছিলো।

মীরা বললো, 'এইবেলা তুমি ওঠো, আমার রান্না খতম। বাকি কাজ এখন সেরে ফেলা যাক।'

স্নানের জন্য হীরেনকে উঠতে হয়।

এত কাছে বসেছিলো ব'লে মীরার সদ্য সাবান ধোয়া গায়ের গন্ধ চুলের গন্ধ শাড়িশায়ার গন্ধটা যেন অনেকক্ষণ হীরেনের বুকের মধ্যে আটকে রইলো। বাথরুমে ঢুকে চার বালতি জল ঢেলেও সে-গন্ধটা দূর করতে পারলো না। কি ক'রে পারবে, হীরেন আবার ভাবলো, মীরা যে-তেল মাথায় দিচ্ছে হীরেনও তা-ই মাথায় ঘসেছে, একই সোপ-কেসের সাবান মাখছে দু-জন। এমন কি, এমন কি—গভীর এক সুখানুভূতিতে হীরেন মীরার তোয়ালে দিয়ে চেপে-চেপে ঘাড় মুছলো, মাথা মুছলো, সমস্ত শরীর মুছলো।

'ভিজে কাপড় গামছা ফেলে রেখে তুমি চ'লে এসো, মালতী ধুয়ে দেবে।'

মীরার ডাকে হীরেন বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো।

হীরেন যখন চুল আঁচড়ায় মীরা সেই ফাঁকে আলুকপির ডালনাটা উনুন থেকে নামিয়ে রান্না শেষ করে।

নতুন ফুলকপির ডালনার গন্ধ ভিজে চুলের গন্ধ চুড়ির নিক্কণ আর মীরা ও মালতীর হাস্যালাপ ঘরের ভিতর উৎসব ডেকে এনেছিলো।

খেতে-খেতে হীরেন এক-সময় ভাবলো, আজকের এই মধুর মধ্যাহ্ন জীবনে চিরকাল লেগে থাকে না কেন। কেন আপিস আদালত কারখানা—

'শুনছো, মালতীর কথা!' জল খেয়ে ভাতের গ্রাস গলা থেকে নিচে নামিয়ে মীরা হীরেনকে ডাকলো, 'তোমার বিপদবন্ধু বিশেষ সুবিধের লোক নন্।'

'না, আমিও ওকে অ্যাভয়েড করতে চাইছি। না-ডাকলেও আসছে, না-বললেও ব'সে থাকে, কী বোরিং!'

এক-একটা পুরুষ কি ক'রে চোখ দিয়ে মেয়েদের গায়ের মাংস কুরে খায় মালতী তা রান্নাঘরে দিদিমণিকে বুঝিয়ে এসেছে।

মীরা এখন সেই ইঙ্গিতটা করতেই ওর বেদম হাসি পেয়েছে। দাদাবাবুর সামনে সব ক-টা সুন্দর দাঁত বেরিয়ে পড়ে তাই গোপন করতে হাসিতে ওর আঁচল-চাপা।

হাসিটা মুখ দিয়ে বেরুতে না পেরে যেন শরীর বেয়ে নদীর ঢেউ হ'য়ে নিচে নামছিলো। মালতী তাই কাঁপছে।

হঠাৎ এই আনন্দঘন এক মুহূর্তে হীরেন আবিষ্কার করলো মীরা প্রায় কিছুই খাচ্ছে না।

'ব্যাপার কি?' হীরেন মীরার পাতের দিকে তাকালো।

'ভীষণ অম্বল হচ্ছে। তুমি বাজারে গেছো পর দু-বার চা খেয়েছি।'

হীরেন কথা না ক'য়ে নিজের খাওয়ায় মনোযোগ দিলে।

মীরা বললো, 'তা দাদা হয়তো একটু মোটারকমের লোন নেবার ব্যবস্থা করছেন আমাদের দেবেন ব'লে। রোজ দুপুরে তাঁর কাছে গিয়ে হাত পাতার লজ্জা আমার না থাকুক, দু-দিন একদিন পর-পর দু-চার-পাঁচ টাকা ক'রে তাঁর পক্ষে দেওয়াও মুস্কিল।'

হীরেন কথা বললো না, কিন্তু তার চোখ আগের চেয়ে উজ্জ্বল। মাথা নাড়লো। মীরা তাতেই সন্তুষ্ট।

'মুখ ধোব, জল দে মালতী।'

মালতী মগ থেকে জল ঢেলে দেয় দিদিমণির গ্লাসে। মীরা মুখ ধুয়ে নিঃশব্দে উঠে পড়লো।

আবহাওয়াটা হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেছে, হীরেনও বুঝলো, কিন্তু তৎক্ষণাৎ হাতের কাছে সুবিধা মতো কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে অগত্যা নীরবে হাতমুখ ধোয়া শেষ করলো।

পরে মীরাকে খুশি করতে মুখে একটা লবঙ্গ ফেলে বললো, 'শোনো, বলছিলাম ক-দিন যখন না বেরিয়ে রেস্ট নিচ্ছ, এই ফাঁকে একটু ডাক্তার দেখাও। তোমার চেহারার লাবণ্য অনেক ক'মে গেছে আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি।'

'ডাক্তার দেখালেই কি লাবণ্য বাড়বে?' মীরা হাত বাড়িয়ে মালতীর হাত থেকে মিঠেপানের খিলিটা তুলে মুখে পুরলো।

'না না, অম্বল হয় বলছো মাঝে-মাঝে।' হীরেন ব্যস্ত হ'য়ে বললো।

'ও কিছু না, এম্নি সেরে যাবে।' ব'লে মীরা চুনের বোঁটাটা জানলা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেললো।

না কি তবে সব অসুখ ওর মনের? হীরেন বিষণ্ণ ব্যাকুল চোখে স্ত্রীর এই অসুখ বুঝতে চেষ্টা করলো।

কিন্তু মীরা কি সেই কারণে গম্ভীর? যে-কারণে গম্ভীর তার সঙ্গে টাকাপয়সার, ওর ঘোরাঘুরির, স্বাস্থ্যের, দাদার এমন কি অমরেশের পর্যন্ত সম্পর্ক নেই। আবার কারণটা যে একেবারে কায়াহীন ও অদৃশ্য তা-ও নয়।

দূরে কা'দের ব্যাল্‌কনি থেকে একটা গোলাপ নীল আকাশের রৌদ্রে

গলা বাড়িয়ে দিয়ে মিটিমিটি হাসছিলো। মীরার খেতে ব'সে এক-সময় গম্ভীর হ'য়ে যাওয়ার কারণটা ঐ আকাশচারিণী হাস্যমুখী গোলাপের মতো। পার্থিব বস্তুর সঙ্গে এর যোগাযোগ মীরা খুব বেশি রাখতে চায় না।

পাছে না হীরেনের নানারকম প্রশ্নের খোঁচা লেগে মীরার এই গোলাপটারও আবার পাপড়ি খসতে শুরু করে, তাই, যেন একটু ভয় পেয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি হেসে বললো, 'আচ্ছা, না-হয় ডাক্তার একজন দেখানো যাবে—তুমি যখন এত ক'রে বলছো।' জানলার শার্সিগুলো বন্ধ ক'রে দিয়ে মীরা ঘরময় ঘুমোঘুমো সুন্দর অন্ধকার ডেকে নিয়ে এলো। 'তুমি কি রাগ গায়ে দেবে?'

'না।' হীরেন মাথা নাড়লো।

'আমি দেবো, কেমন শীত-শীত করছে।'

স্যুটকেস খুলে মীরা ভাঁজ-করা রাগ বা'র করে। তাদের বিয়েতে পাওয়া সেই ব্রাউন রঙের রাগটা। শাড়ি খুলে ফেলেছিলো আগেই। পরনে জংলি শায়া। পানের রসে অধরোষ্ঠ রাঙা। স্যুটকেস খোলার ঝাঁকুনিতে খোঁপাটা মুখ থুবড়ে পড়েছে এসে ঘাড়ে, গালে। হীরেন কতক্ষণ নিশ্বাস ফেলতে পারলো না।

মীরা ডাকলো, 'এসো।'

সেই ডাক মৃত্যুর মতো সুন্দর, হীরেন খাটের কাছে যেতে-যেতে ভাবলো, এমন শান্ত ঠাণ্ডা শরীর জুড়োনো ডাক আর-কোনোদিন সে মীরার কাছ থেকে পায় নি।

'কি, বলো।' বালিশে মাথা রাখতে-রাখতে মীরা হীরেনের গলা জড়িয়ে ধরলো। 'কাল দুপুরে আমায় তুমি খামোকা সন্দেহ করছিলে।'

'না না—' আবেগে দুঃখে নরম হ'য়ে গিয়ে ক্ষমা চাওয়ার মতোন

গলার স্বর করলো হীরেন। 'আমি কি জানি না, অমরেশের কাছ থেকে আর যে-ই আনুক, তুমি রোজ-রোজ টাকা ধার আনবে না।'

মীরার কাজল-পরা চোখে ঘুমের বান ডেকেছিলো। বাহুবন্ধনে ওর মাথাটা বুকের কাছে ধ'রে হীরেন কান পেতে কথা শুনলো।

'তবু তুমি যখন চাইছো না ইচ্ছে করেই আর গেলাম না ওর কাছে, যাই নি আজ।'

'আমি জানি তুমি যাবে না।' হীরেন পরিতৃপ্তির গাঢ় নিশ্বাস ফেললো। 'আনলেই তো ঋণ করা হয়, তার প্রতিদানে তুমি কিছু দিতে পারছো না ওকে।' হীরেন কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে অনুভব করলো মীরা ঘুমিয়ে পড়েছে, আর ঘুমের সেই অতল সমুদ্র হীরেনকে আস্তে-আস্তে কখন তলিয়ে নিয়ে গেল তা সে টের পেলে না।

দশ মিনিট পর মীরা চোখ মেললো। হীরেন গাঢ় নিদ্রাভিভূত।

মীরার কাজল-পরা চোখ আয়নার মতো চকচক করছে। আস্তে, খুব আস্তে হীরেনের গায়ে একটু না ধাক্কা লাগে এমনভাবে হাত পা ওর বাহু বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে আনলো। খাট থেকে নেমে ও মেঝেয় দাঁড়ালো। তারপর আয়নার কাছে স'রে গিয়ে হাতের তেলো দিয়ে চেপে খোঁপাটাকে ঠিক করলো। আলনা থেকে টেনে নামালো ওর ধান-রঙ শাড়ি। আটপৌরের মধ্যে এটাই মীরার সবচেয়ে পছন্দ। রৌদ্রঘন দুপুরে সবুজ না পরলে মানাবে কেন।

শাড়ির আঁচলটা মীরা আবার খ'সে না যায় এমনভাবে পিন দিয়ে খোঁপায় এঁটে দিলো, কিন্তু এমনভাবে দিলো যে এক দিকটা সবুজ নিশান হ'য়ে ঝুলতে লাগলো। বাকি অর্ধেকটা খোঁপাকে মনে হচ্ছিলো সবুজ পাতার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা একটা মৌচাক।

স্নো পাউডার মাখলো না মীরা। ভিজে গামছা দিয়ে মুখখানা শুধু মুছলো। তারপর রান্নাঘরে ঢুকে ঢাকনা দেওয়া সাজানো থালাটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলো।

অপরাধ? কোনো অপরাধ মীরা করছে না। যেন অমরেশকে সে বোঝালো। হ্যাঁ, হীরেনকে সেবায় সান্নিধ্যে স্নেহে যত্নে এমন পরিতুষ্ট ক'রে দিয়েছে সে যে এখন থেকে হীরেন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। এই ভরদুপুরে। চেক লিখে দেওয়ার শর্ত—অমরেশের টাকার সদ্ব্যবহার মীরা পুরোপুরি করছে। বিশ্বাস না হয় অমরেশ একবার এসে এ-বাড়িতে উঁকি দিয়ে দেখুক। হীরেন ঘুমিয়ে আছে, সে জানে না। কাজটার জন্যে, মৃগাঙ্কর ঘরে ভাতের থালা নিয়ে যাওয়া, মীরা ভাবলো, অমরেশের কাছেই যা-একটু অপরাধ করা হ'লো, তাই মনে-মনে সে অমরেশের সঙ্গে এতগুলো কথা বললো।

তারপর আর বললো না। পার্টিশনের ওপারে গিয়ে ও সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হ'য়ে গেল এপারের জগৎ।

তেরো

পায়ের লঘু শব্দে মৃগাঙ্ক চোখ তুললো। অস্নাত অভুক্ত চেহারা।

ভাতের থালাটা একটা টিপয়ের ওপর রাখলো মীরা।

'আঁকছেন নাকি ?'

'না, ভাবছিলাম।' হাত দিয়ে কপালের চুল পিছনে ঠেলে দিয়ে মৃগাঙ্ক হাসলো, আপাদমস্তক মীরাকে দেখলো একবার, তারপর ভাত দেখলো। 'ইস্, কত কি রান্না করেছেন!' একটু থেমে পরে মীরার চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করলো, 'মিস্টার চক্রবর্তী খেয়েছেন ?'

'খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে তবেই এসেছি। আসতে পারলাম।' একটু গম্ভীরভাবে মীরা বললো। 'আর দেরি করবেন না, উঠুন, চট্ ক'রে সেরে ফেলুন।' যেন মৃগাঙ্কর অতিরিক্ত মন্থরভাব দেখে মীরা না-ব'লে পারলো না, আর বলার সেই মুহূর্তে করুণ বিষণ্ণ একটা ছায়া ওর চোখে ভেসে উঠলো, মৃগাঙ্কর চোখে তা এড়ালো না।

তথাপি ব্যস্ততার বিন্দুমাত্র চিহ্ন ছিলো না মৃগাঙ্কর লালচে চোখে। 'একটা সিগারেট খাবো। আপনি বসুন।'

'না, এখন আর সিগারেট না, এখন ভাত।' মীরা এমনভাবে অনুনয় করলো যে মৃগাঙ্ক সিগারেটের জন্যে আর হাত বাড়াতে সাহস পেলে না। কিন্তু সেজন্যে যে সে রুষ্ট হ'লো তাও না, বরং বিহ্বল আবিষ্ট চোখ মেলে মীরাকে দেখলো। 'অরণ্যচারিণী ডায়নার মতো সুন্দর লাগছে আপনাকে, মীরা।'

'আপনি আঁকুন, আমি বলছি এঁকে যান। আপনার এই অভাব দুঃখ থাকবে না।' সান্ত্বনার শিশিরবিন্দু ঝরছিলো মীরার চোখ থেকে, ঠোঁট থেকে।

যেন তার উত্তরে মৃগাঙ্ক কি বলতো। বলা হ'লো না। বাতাসের ঝাপটায় হঠাৎ একদিকের জানালার একটা কাচ এমন ঝনঝন শব্দ ক'রে উঠলো যে দু-জনেই চমকে উঠলো। মীরার চেয়ে বেশি চমকে ওঠে মৃগাঙ্ক। অল্প হেসে মীরা প্রশ্ন করলো, 'আপনি ভয় পেয়েছেন ?'

'তাই।' ঈষৎ হেসে ঘাড় নেড়ে মৃগাঙ্ক স্বীকার না ক'রে পারলো না। 'আজকাল একটুতে কেমন ভয় পাই, ভীরু হ'য়ে গেছি কেন বলুন তো ?'

যেন উত্তর তৈরি ছিলো। স্থির শান্ত গলায় মীরা বললো, 'শিল্পী যখন মরতে বসে তখন এই হয়। রক্তমাংসের মানুষের ভয় ভাবনাগুলো তাকে বেশি কাবু ক'রে ফেলে।'

'কেন এমন হয় ?' মৃগাঙ্ক মুখে প্রশ্ন করলো না, সেই জিজ্ঞাসা চোখে নিয়ে নারীকে দেখলো।

মীরা বললো, 'অনন্ত রূপময় ব্রহ্মাণ্ড। আপনি শুধু একটি রূপের ধ্যান নিয়ে শিল্পী হ'তে চেয়েছিলেন, তাই এমন করুণভাবে ব্যর্থ হলেন। এখনো যে টিঁকে আছেন, ম'রে যান নি দেখে অবাক হচ্ছি। না-স্নান না-খাওয়া হ'য়ে একটা ঘরে আটক থেকে যক্ষ্মাতে ভুগছেন না এটাও আশ্চর্য! তাই বলছিলাম, পুরুষ হিসেবেও আপনি দুর্বল, শিল্পী অনেক বড়ো। নিন্ উঠুন, এ-সব কথা পরে হবে, এখন খেয়ে নিন্।'

'বুঝতে পেরেছি।' মৃগাঙ্ক লজ্জায় এবার অধোবদন হ'লো। 'ভোমরাকে নিয়ে আমায় এখনো ঠাট্টা করছেন ?'

'কেন করবো না, প্রত্যেক নারীই হিংসা করবে আপনাকে আপনার এই অবস্থা দেখলে। সহস্র রক্তচক্ষু যার, তার শুধু একটি জায়গায় দৃষ্টি রেখে পুড়ে ম'রে যেতে দেখা কোনো মেয়েই সহ্য করতে পারে না।' ব'লে মীরা হঠাৎ চুপ ক'রে রইলো।

মৃগাঙ্ক বললো, 'আপনার মতো মমতাময়ী যে এটা সহ্য করতে পারে না

আমি বিশ্বাস করি। আর কাউকে জানি না, মীরা, আর-কোনো মেয়ের সঙ্গে বিশেষ তেমন মিশি নি।'

মীরা চুপ ছিলো।

মৃগাঙ্কর চোখ ছলছল করতে লাগলো। সিগারেট খাবার জন্যে তৃষ্ণায় তার বুকের ছাতা ফেটে যাচ্ছিলো, কিন্তু তবু সে আর-একটা সিগারেট ধরায় না শুধু মীরাকে দেখে।

'আসুন, খাই।' মৃগাঙ্ক সতৃষ্ণ চোখে যত্নে সাজানো ভাতের থালা, কৌটোয় একটুখানি গরম ঘি, পটল ভাজা, ডালনা, আলু-কই-এর ঝোল, চাটনি ও দই দেখলো।

'আপনার নিশ্চয় ভালো ক'রে খাওয়া হয় নি।' মৃগাঙ্ক অবাক চোখে মীরাকে দেখলো। 'এতগুলো আমার জন্যে নিয়ে এলেন!'

'না না, আমি খেয়েছি, বিশ্বাস করুন।' মীরা অতিমাত্রায় ব্যস্ত হ'য়ে বললো। 'আপনার জন্যে আলাদা ক'রে এ-সব রান্না হয়েছে।'

মৃগাঙ্ক মীরার চোখের ভিতর তাকায়।

'কখন রাঁধলেন? মিস্টার চক্রবর্তী নিশ্চয় আজ হেঁসেলের দরজা ছেড়ে কোথাও যান নি।' মৃগাঙ্ক প্রশ্ন করবে কি, যেন মীরা সেই উত্তরের জন্যে তৈরি হচ্ছিলো মনে-মনে। কিন্তু মৃগাঙ্ক সেদিকে আর এক-চুল অগ্রসর হয় না, মাথার চুলের মধ্যে অস্থির আঙুল চালিয়ে দমকা হাওয়া যেমন হা-হা ক'রে ওঠে তেমনি গলার এক উত্তাল অদ্ভুত স্বর বা'র ক'রে বললো, 'আমি ভুলে গেছি সেই ছবি, মন থেকে মুছে ফেলেছি সেই মডেল, মীরা, বিশ্বাস করুন। আর অপরাধ নেবেন না। নতুন রূপ নতুন মডেল পেয়ে গেছি যখন, আবার আমি বাঁচবো, বেঁচে উঠেছি।'

পরিতৃপ্তির গাঢ় নিশ্বাস ফেললো মীরা। কপালে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম

জমছিলো আঁচল দিয়ে তা মুছে ফেললো। মৃগাঙ্কর চোখের আশ্চর্য রঙ দেখে মীরা প্রশ্ন করার লোভ সংবরণ করতে পারলো না, যদিও ঠোঁট চেপে হাসছিলো ও। 'কি রূপ, কেমন মডেল?'

'এ-ভাবে এই মডেল—' বলদৃপ্ত কঠিন বাহু বাড়িয়ে মীরাকে আকর্ষণ ক'রে মৃগাঙ্ক খাটের ওপর তার পাশে বসায়। 'নিন্, আপনিও আমার সঙ্গে হাত চালান। আপনি কিছু খান নি আমি বেশ বুঝতে পারছি।' ব'লে মীরার হাত ও নিজের হাত যুক্ত ক'রে সে ভাতের থালায় ঠেকালো।

হাসলো না মীরা কি অতিরিক্ত রকম গম্ভীর হ'য়ে রইলো না, পরিচ্ছন্ন ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'দাঁড়ান, হাতটা ধুয়ে নি।'

কুঁজো থেকে কাচের গ্লাসে জল গড়িয়ে নিয়ে মীরা সোজা হ'য়ে দাঁড়াবে এমন সময় পাশের ঘর থেকে বিশ্রীরকম একটা শব্দ তার কানে ভেসে এলো। চমকে উঠলো ও। মৃগাঙ্ক টের পেলে না।

'এক সেকেণ্ড, আপনি খান আমি আসছি।' ব'লে রুদ্ধশ্বাসে মীরা মৃগাঙ্কর ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে ছুটে গেল।

মালতী বাইরে গিয়েছিলো। এইমাত্র ফিরেছে। কাঁপছে ও। শব্দটা মালতীর কান্নার, ওর চাপা আর্তনাদের—ঘরে ঢুকে মীরা টের পেলে।

রক্তের নদীতে হীরেন ঢ'লে পড়েছে। দুই কান পর্যন্ত বিস্তৃত হাঁ-করা ক্ষত গলায়।

অত্যন্ত স্থির ও সংযত থাকতে চেষ্টা করলো মীরা। রক্তের নদী ও হীরেনের রেজার ছাড়া ঘরের মেঝেয় আর-কিছু প'ড়ে আছে কি না অপলক চোখে খুঁজতে গিয়ে এবার সে আর-একটা জিনিস দেখতে পেলে। বাংলা খবরকাগজ একটা গড়াগড়ি যাচ্ছে। লাল দাগ দেওয়া একটা অংশ। ছোঁ মেরে মীরা কাগজটা মেঝে থেকে তুললো।

রক্তের ছিটে এখানেও লেগেছে। তা হ'লেও দাগ দেওয়া অংশটা পড়তে মীরার অসুবিধা হ'লো না। কাল রাতের সেই ঘটনা। বাসে এক ভবঘুরে পিক্‌পকেটকে এক মহিলার নিজের স্বামী ব'লে পুলিশের হাত থেকে বাঁচানোর গল্প। আসলে তাঁরা একবাড়িতে দুটো পাশাপাশি ফ্ল্যাটের ভাড়াটে মাত্র। রাস্তার নাম ও বাড়ির নম্বর পর্যন্ত তুলে দিতে কাগজের রিপোর্টার ভুল করেন নি। একজন পুলিশের লোক সাক্ষী আছেন।

খবরটা এ-ভাবে রঙচঙ মেখে কাগজে কি ক'রে আত্মপ্রকাশ করলো সেকথা না ভেবে মীরা অবাক হ'লো এই ভেবে, কাগজটা এখানে আনলো কে। হীরেন বাজার থেকে ফেরার সময় কোনো কাগজ তো কিনে আনে নি।

সব পরিষ্কার ক'রে দিলো মালতী। চোখ মুছে ধরা-গলায় বললো, 'আমি যখন বাড়ি থেকে বেরোই বিপদ উকিলকে দেখলাম রাস্তায় আমাদের ফটকের সামনে আলোর থামের নিচে দাঁড়িয়ে। হাতে একটা কাগজ।'

রাত্রের রেস্টুরেন্টের ঘটনাও মীরার এই সঙ্গে চট্ ক'রে মনে পড়লো। কিন্তু মাথা গরম করলো না সে।

খবর দেওয়া মাত্র লোকজন আসবে, পুলিশ আসবে এবং সকলের আগে ছুটে আসবে মৃগাঙ্ক। এবং মৃগাঙ্ক আসছে কি না শুনতে মীরা মুহূর্তকাল কান খাড়া ক'রে রাখলো, তারপর ত্রস্ত কম্পিত গলায় মালতীকে বললো, 'রান্নাঘরে গিয়ে তুই আগে এই কাগজটাকে পুড়িয়ে ফেল।' মালতী কাগজটা নিয়ে ছুটে রান্নাঘরে চ'লে গেল। মীরা আস্তে ব্যাগ খুলে অমরেশের চেকটা বা'র করলো।

দেখে মৃগাঙ্ক কিছু বললো না। নিঃশব্দে হীরেনের মৃতদেহ দেখতে লাগলো। চোখ মোছা শেষ ক'রে মৃগাঙ্কর হাত থেকে চেকটা নিয়ে

সেটা [illegible] করতে-করতে মীরা আস্তে বললো, 'বরং আমার চেয়ে কলে ওর সঙ্গেই অমরেশের বন্ধুত্ব ছিলো বেশি, বাল্যবন্ধু। অপরাধ হয়েছে কাল দুপুরে ওকে না-ব'লে অমরেশের কাছ থেকে চেক আনলাম কেন। অথচ অমরেশ সবটা টাকাই ওর চিকিৎসার জন্য দিয়েছে। বললাম। কিন্তু তবু কাল থেকে আমার সঙ্গে আর ভালো ক'রে কথা বলে নি।'

'যাকগে, এটা আপনি চেপে যান।' শান্ত গম্ভীর গলায় মৃগাঙ্ক বললো। 'অনেকদিন থেকেই তো মিস্টার চক্রবর্তী পেটের ঘায়ে ভুগছিলেন। হাসপাতালের রিপোর্ট ডাক্তারের প্রেসক্রুপশন-টেসক্রুপশন যা আছে সব বা'র ক'রে রাখুন। দৈহিক অসুস্থতা মিস্টার চক্রবর্তীর জীবনকে দুর্বিষহ ক'রে তুলেছিলো কথাটার ওপর জোর দিতে হবে, অন্তত পুলিশের কাছে।'

'তাই দেবো, তাই আমাকে বলতে হবে।' আর-একটা কান্নার ধমক চাপতে গিয়ে মীরা ঢোক গিললো। 'বিনা দোষে আমায় এত বড়ো শাস্তি দিয়ে যাওয়ার ওর কোনো অধিকার নেই, ছিলো না—এর সাক্ষী আপনি মৃগাঙ্কবাবু, আপনি ছাড়া আমার নিকটতম প্রতিবেশী আর কেউ নেই। চোখের ওপর দেখেছেন কী না করেছি শেষ পর্যন্ত ওর জন্যে।'

মৃগাঙ্ক কিছু বললো না।

মীরা মেডিকেল রিপোর্টগুলো খোঁজাখুঁজি করতে তৈরি হচ্ছিলো।